মিলন-মন্দির

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

তিন টাকা

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৪

একবিংশ সংস্করণ

মিলন-মন্দির

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"বাবা, একটা কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি"—এই বলিয়া মাতা পুত্রের নিকট উপবেশন করিলেন

সে গৃহে আর কেহ ছিল না। তখন রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত। পিত্তল পিলসুজে মৃন্ময়-প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং একটা ক্ষুদ্র ঘটিকা টীক্‌টীক্ করিয়া শব্দ করিতেছিল।

যতীশচন্দ্র মাতার মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি ?"

পুত্র যে প্রকার স্বরে কথা কহিলেন, মাতা তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। তথাপি তিনি নিরস্ত হইলেন না। বলিলেন, "তোমাদের নিতান্ত নাবালক রাখিয়া কর্ত্তা স্বর্গারোহণ করেন। সেই হইতে কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে—কত লোকের কত তোষামোদ করিয়া কত দিন পেটে কিছু না দিয়া, কত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া যে তোমাদিগকে বড় করিয়াছি—তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু নগরে উঠিতে মুগুরের বাড়ী পড়িল ;—নবীন আমাকে ফাঁকি দিল। তোমরা চারি রত্তি আছ—ভগবান্ তোমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন—তোমাদের কাছে অনুরোধ, আমি যে কয়দিন পৃথিবীতে থাকি, তোমরা পৃথক হইও না। আমি পাতাই কুড়াইয়াছি, আগুন পোহাইনি !"

যতীশচন্দ্র বলিলেন, "কে পৃথক হইতে চাহিতেছে? তবে তোমার আর সব ছেলেরা বারমাস বসিয়া খাইবে, আর তাই লইয়া যদি কোন একটা কথা হয়, অমনি বধূমাতারা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিবেন—সেটা ত ভাল নয়।"

মাতা করুণ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, এখন তুমিই সকলের বড়। তুমি স্থির না হইলে, কে স্থির হইবে? বুঝিতেছি, একা রোজগার করিয়া কত করিবে। খরচ বেশী—কিন্তু ক্ষিতীশকে চাষ-বাসের কাজ করিতে বলিয়াছ, সে, তাই আরম্ভ করিয়াছে…যদি সুবিধা হয়, সাহায্য পাইবে। দানীশকে লেখাপড়া শিখাইতেছ—সে প্রাণপণে তাই করিতেছে। তবে পাঁচকড়ি—সে সকলের ছোট—তুমি তাহাকে আহ্লাদে করিয়া লেখাপড়া শিখিতে দাও নাই—কখনও কোন কাজকর্ম্ম করিতে দাও নাই—কাজেই সে এমন হইয়াছে। এতদিন যদি সহিয়া আসিয়াছ, আরও কিছুদিন সও, শীঘ্রই উহারা তোমার হাতধরা হইয়া উঠিবে।"

যতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন, "আমি বাপু বাড়ীও থাকি না, তোমাদের গোলোযোগের মধ্যেও নাই। তবে বাড়ী আসিলে নানারকম শুনিতে পাই, কাজেই মনে বড় অশান্তি জন্মায়।"

মা। তা আমি বুঝি—কিন্তু তুমি জানিও, আমি যখন আছি, তখন কাহারও প্রতি অন্যায়-অবিচার হ'তে পারবে না। সকল ভার আমার উপর দিয়ে, তোমরা অর্থ ও বিদ্যা-অর্জ্জনের চেষ্টা কর। এ সব সংসারের খুঁটি-নাটিতে তোমরা মাথা দেবে কেন?

যতীশ। সেজবৌমা নাকি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রেছেন?

মা। হ্যাঁ, তা তিনি যাতে শান্ত হন, আমি সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কচ্ছি। তোমাকে এ সকলের কোন বিষয়েই নজর দিতে হবে না।

যতীশ। শুনিলে যে রাগ হয়।

মা। মেয়ে মানুষের সব কথা আবার সত্যিও নয়; তা শুনে রাগ করাও উচিত নয়।

যতীশ। তা কি আর আমি জানি না। আমরা মানুষ চরাইয়া খাই।

মা। তা বাবা, যাতে মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে—যাতে পাঁচজনে মানুষ ব'লে গণ্য মান্য করে, তাহাই করিও। তুমি বুদ্ধিমান—তুমি আমার বল বুদ্ধি-ভরসা।

যতীশ। না না,—আমি কি আর সহজে ও-সব কথা কানে করি। যাক্, আমি কা'ল ভোরেই বাড়ী হ'তে যাব—খোকার যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। শুনিয়াছি নাকি, কাজ লইয়া থাকাতে খোকার খোয়ার হয়।

মা। সেও কি একটা কথা? আমি থাকৃতে তা'র খোযার! না বাবা, সে কথা তুমি কানেও তুলো না। একে ত' মেজ বৌমা সংসারের কাজেতে বড় একটা যান না; তার উপর খোকা সকলের যত্নের ধন—বিশেষতঃ পাঁচকড়ির গলার হার। সে বুক হইতে একদণ্ডও নামায় না।

এই সময় শ্বেতাঙ্গিনী-দেবী গৃহমধ্যে আগমন করিয়া সুখ-সুপ্ত খোকা ওরফে শ্রীমান্ শচীশচন্দ্রকে খট্টার উপরে শায়িত করিয়া দিয়া চলিযা গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুপ্তোত্থিত বালক শচীশচন্দ্র বায়না লইল, "ছোট কাকার কাছে যাব।"

স্বামী-স্ত্রীতে কত বুঝাইলেন—কত ভুলাইলেন—কত খেল্‌না—খাবার দেখাইলেন, কিন্তু বালক বুঝিল না। শেষে রোদন আরম্ভ করিয়া দিল।

যতীশচন্দ্র বলিলেন, "এমন ছেলেও ত দেখি নাই! মধ্যে মধ্যে কি এইরূপ করে?"

বিরক্তিস্বরে শ্বেতাঙ্গিনী বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে কি, রোজ রাত্রেই একবার যাওয়া চাই-ই। এক একদিন তার কাছেই পড়িয়া থাকে।"

যতীশ। এখন উপায় কি?

শ্বেতাঙ্গিনী। ডাকিয়া ছেলে দাও।

যতীশ। পাঁচকড়ি বুঝি চণ্ডীমণ্ডপে শোয়?

শ্বেতাঙ্গিনী। হ্যাঁ।

যতীশচন্দ্র তখন দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন, এবং বহির্ব্বাটীতে যাইয়া পাঁচকড়িকে ডাক দিলেন। পাঁচকড়ি তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, দাদার ডাক শুনিয়া উঠিয়া বসিল; তার পর খোকার কান্নার কথা শুনিয়া চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে গমন করিল।

ছোট কাকাকে দেখিয়া শচীশচন্দ্রের কান্নার ধারে হাসি ফুটিল। ছুটিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, স্কন্ধের উপর মাথা গুঁজিল। পাঁচকড়ি তাহাকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে গেল।

যতীশচন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাঁচকড়ি খোকাকে অত্যন্ত ভালবাসে।"

শ্বেতাঙ্গিনী। হ্যাঁ, তা বাসে।

যতীশ। এখন পাঁচকড়ির একটা বিবাহ না দিলে নয়। বয়স প্রায় আঠারো উনিশ হ'ল। শ্বেতাঙ্গিনী ব্যঙ্গ-স্বরে বলিলেন, "দাও।" তোমার টাকা আছে—ভাইয়ের বিবাহ দেবে, তা আর আমি কি বলব?"

যতীশ। টাকা কি আর আছে—

শ্বেতাঙ্গিনী। তবে কর্জ্জ করিও।

যতীশ। অগত্যা তা'ই করতে হ'বে। বোধ হয় টাকা শো চারেকের গহনা হ'লেই হবে। আর যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই কোন রকমে কার্য্য নির্ব্বাহ করা যাইবে। যা' না করলে নয়, তা' ক'রতেই হবে।

শ্বেতাঙ্গিনী গম্ভীরমুখে বলিলেন, "না কম্‌লে ত সবই চলে না। কন্তু ঐ ছেলেটুকু হ'যেছে, ওর উপায় কিছু ভাবচো কি ?"

যতীশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "উহাঁর উপায় ? উহার উপায় আট পয়সার দুধ, আর দুই পয়সার সন্দেশ।"

শ্বেতাঙ্গিনী। ওগো তা সব জানি। এই যেটের কোলে তিন বৎসরে পড়িয়াছে—এখন উহাতেই হয়, কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ না করিলে, শেষে ফল বিষম দাঁড়ায়। তা' ভালই বল—আর মন্দই বল, উহার জন্য এখন হইতে কিছু কিছু সংস্থান করিতেই হইবে। মরা বাঁচা মানুষের হাত নয়—যদি হঠাৎ আমাদের কোন ভালমন্দ ঘটে—খোকা কি আমার শেষে ভিক্ষা করিয়া খাইবে ?

যতীশ। ভিক্ষা করিয়া খাইবে কেন—আমি যদি না বাঁচি—ওর কাকারা সকল ভার লইবে, উহাকে মানুষ করিবে।

মুখ ঘুরাইয়া শ্বেতাঙ্গিনা বলিল, "তা নেবে গো নেবে। কাকারা যত প্রতিপালন করে, তাহা জানিতে কাহারও বাকি নাই। তোমার পায়ে পড়ি—আমি কখনও তোমার নিকট গহনা চাহি নাই—ভাল কাপড় চাহি নাই। কিন্তু এখন—আমার নিজের জন্য নহে—তোমার নিজের স্নেহের পুত্রের জন্য বলি যে, এখন হইতে তোমাকে তাহার জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা সংস্থান করিতেই হইবে আমার মাথায় হাত দিয়া দিব্বি কর, আমার এই অনুরোধটি রাখ্‌বে।"

যতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন—তার পর প্রতিশ্রুত হইলেন, যাহা মাসিক আয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক খোকার জন্য সংস্থান করিব —আর অর্দ্ধেক সংসারে দিব।

শ্বেতাঙ্গিনী বলিলেন, "আর একটি অনুরোধ।"

যতীশচন্দ্র। কি ?

শ্বেতাঙ্গিনী। ঋণ করিতে পারিবে না। "ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু—" খোকার আমার শত্রু হইও না।

যতীশচন্দ্র। না, কথনই ঋণ করিব না।

শ্বেতাঙ্গিনীর অধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ীর নিকটেই রেলওয়ে ষ্টেশন। বেলা আটটার সময় যতীশচন্দ্র আহারাদি সমাপ্ত করিয়া কার্য্যস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে এক কলসী গুড়, দুইটা কাঁটাল ও ব্যাগ যাইবে।

পাঁচকড়ির উপরে মুটিয়া ডাকিবার ভার ছিল, পাঁচকড়ি বলিয়াও আসিয়াছিল, কিন্তু গাড়ীর সময় হইয়া আসিল, তথাপি মুটিয়া আসিয়া পৌঁছিলনা—বোধ হয়, কোথাও অধিক লাভের প্রত্যাশায় গমন করিয়াছিল।

যতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ীর ত আর সময় নাই—কৈ রে, মুটে কোথায় ?"

পাঁচকড়ি বলিল, "তা কি জানি। আমি ত বার বার করিয়া বলিয়া আসিয়াছি। বোধ হয় আসিবে এখন।"

যতীশচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন "আর আসিবে কখন ? গাড়ী বোধ হয় ষ্টেশনে আসিল। ঐ যে শব্দ হইতেছে।"

পাঁচকড়ি। না, ওখানা মালগাড়ী।

শ্বেতাঙ্গিনী মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "যখন পরের কাজ করতে যেতেই হবে তখন নিজে গিয়ে একটা মুটে ডেকে আনিলেই হইত। সকল কাজেই পরের উপর নির্ভর করে থাকা।"

যতীশচন্দ্র গাড়ী পাইবেন না ভাবিয়া অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিরক্তস্বরে বলিলেন, "তা কি জানি যে, অত বড় ছেলের দ্বারা একটা মুটে ডাকা হবে না। এখন আমি কি করি ; মহা মুস্কিল

দেখছি! আর কিছু না, জিনিসগুলা লওয়া হইল না। ম্যানেজার গুড়ের কথা বলেছেন; দিতে পারলে একটু সন্তুষ্ট থাকতেন।"

এই সময়ে তৃতীয় ভ্রাতা ক্ষিতীশচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কে, পাঁচকড়ি মুটে ডেকে দিবে। কেন, আমাকে বললেই ত হত?"

পাঁচকড়ির বড় দুঃখ হইল। সে কোন্ কাজে অবহেলা করিয়াছে? মুটে যদি আসিল না, তবে সে কি করিবে। মুটে ত আর তাহাদের বেতন-ভোগী ভৃত্য নহে! দুঃখের সহিত যথোচিত অপ্রতিভও হইল। ক্ষুব্ধ সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, "চলুন, গুড় আমি পঁহুছিয়ে দিয়ে আসছি।"

যতীশচন্দ্র ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "শুধু কি গুড়, তাই তুমি লইয়া যাইবে?"

পাঁচকড়ি। সেজদাদা, আপনিও চলুন। আমি গুড় ও একটা কাঁটাল লইতেছি। আপনি একটা কাঁটাল লউন, মেজদাদা ব্যাগটা হাতে করিয়া লউন।

যতীশচন্দ্র বলিলেন, "অগত্যা তাহাই হউক। গাড়ী আসিয়া পড়িল।"

পাঁচকড়ি গুড়ের কলসী বাম স্কন্ধে লইয়া কাঁটালের বোঁটা দক্ষিণ হস্তে করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছে—এমন সময়ে শচীশচন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "আমি যাব।"

তাহার ঠাকুর-মাতা আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইলেন; কিন্তু সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

তখন পাঁচকড়ি হস্তের কাঁটাল মাটিতে নামাইয়া শচীশচন্দ্রকে দক্ষিণ ক্রোড়ে লইয়া, এবং মেজদাদাকে বলিল, "কাঁটালটা থাক, আপনি গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে আমি দৌড়িয়া আসিয়া কাঁটাল লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিব।"

ক্ষিতীশচন্দ্র একটু হাসিয়া সে কাঁটালটাও লইলেন। তার পর তিন ভ্রাতায় ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঁচকড়ি যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক্। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, একখানি মালগাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইল। যতীশচন্দ্র যে গাড়ীতে যাইবেন, সে গাড়ী আসিতে তখনও আধঘণ্টা বিলম্ব।

তাঁহারা ষ্টেশনে দ্রব্যগুলি রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একটা কুলি আসিয়া পাঁচকড়িকে সেলাম করিয়া বলিল, "বাবু! মাল বুঝি সব আসিয়াছে? আমি ঘাটে গিয়াছিলাম, গাড়ীর এখনও অনেক সময় আছে—এইবার আপনাদের বাড়ী যাইতেছিলাম।"

পাঁচকড়ি সে কথার কোন উত্তর করিল না। কথা কহিবার সামর্থ্য তখন তাহার ছিল না। অর্দ্ধমণ গুড় স্কন্ধে করিয়া ও খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া ততখানি পথ আসিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল—চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। শচীশচন্দ্র তখনও তাহার ক্রোড়দেশে অবস্থান করিতেছিলেন।

মুটে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

যতীশচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ও দুঃখিত হইলেন। ভ্রাতৃস্নেহ পূর্ণ প্রতাপে উচ্ছ্বসিত হই·· তাঁহার হৃদয় আপ্লুত করিল। বলিলেন, "সময় না বুঝিতে পারিয়া, আমিই এতটা গোল পাকাইয়াছি। পাঁচকড়ি ঠিক্ কথাই বলিয়াছিল।"

ক্ষিতীশ, দাদার পক্ষ সমর্থন করিলেন। বলিলেন, "রেলগাড়ীর ব্যাপার; ব্যস্ত হইবারই কথা!"

যতীশচন্দ্র সে কথা পুনরালোচনা না করিয়া পাঁচকড়িকে বলিলেন, "এখন তোমার বয়স হইয়া উঠিয়াছে, সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিবে। তাহা কর না কেন?"

পাঁচকড়ি কপালের ঘাম হস্ত দ্বারা মুছিয়া বলিল, "সেজদাদা যাহা বলেন, তাহা ত করি।"

যতীশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন।

যতীশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্রকে বলিলেন, "যাক্, যাহা পারে তাহাই করুক্। আর দিন কতক পরে উহাকে একটা যাহা হয়, ব্যবসায়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিব। এখন উহাকে বিশেষ কিছু বলিও না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন, "কে কি বলে? তবে গ্রামে যখন সংক্রামক রোগ আরম্ভ হয়, তখন চাষাপাড়ায় গিয়া সেই সকল রোগী ঘাঁটকান আর সাধু-মহান্ত খুঁজে খুঁজে তাদের পাছে পাছে ঘোরা, গৃহস্থের ছেলের এ সকল ভাল নয়। আবার না কি প্রাণায়াম শিক্ষা হ'চ্ছে—শ্বাস-প্রশ্বাস টেনে টেনে শেষে একটা কঠিন রোগ জন্মে যাবে!—তাই সেগুলা নিষেধ করি।"

এই সময়ে ষ্টেশনে যাত্রীর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। যতীশচন্দ্র ব্যাগ হস্তে করিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র ও পাঁচকড়ি দ্রব্যগুলি তুলিয়া দিল।

যতীশচন্দ্র গাড়ীর দরজা দিয়া মুখ বাহির করিয়া শচীর মুখচুম্বন করিতে গেলেন, শচী তাহার ছোট কাকার গলা জড়াইয়া ধরিল।

এই সময় ঘণ্টা ধ্বনি হইল। গাড়ীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল। গাড়ী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যশোহর জেলায় শোনপুর এক পল্লী। এই পল্লীতে রায়বংশ পুরাতন এবং সম্ভ্রান্ত। যে কারণে বাঙ্গলার অধিকাংশ পুরাতন বংশ নির্ধন ও দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, এই রায়বংশের অবস্থাও সেই কারণে দুঃস্থ ও হীন হইয়া পড়িয়াছে। সে কারণ মোকদ্দমা। কয়েকখণ্ড ভূমি লইয়া

জমিদারের সহিত হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা করিতে করিতে যদুনাথ রায় একেবারে নিঃস্ব ও ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়েন। অবশেষে নাখেরাজ প্রভৃতি যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, দেনার দায়ে তাহা বিক্রয় হইয়া গেল। তখন একটা গাঁতি জমার আয় ও কয়েক বিঘা চাষের জমির ফসল আদায় করিয়া, যদুনাথ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সুখ আর দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু, যে এক দিন রাজ-রাজেশ্বর ছিল, সে সহসা পথের ভিখারী হইলে, বড় কষ্টে পড়ে।

পূর্ব্বে যদুনাথের যে আয় ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। অতিথি অভ্যাগতের সেবা হইত। দাসদাসীতে বাড়ী পূর্ণ ছিল। কিন্তু মোকদ্দমায় সে সকলই কোথায় চলিয়া গিয়াছে! এখন নিজে হাঁটিয়া প্রজার বাড়ীতে খাজনা আদায় করিতে হয়, ধান খন্দ আদায় করিয়া আনিতে হয়—তাহাও নিতান্ত অপ্রচুর। সাধারণ গৃহস্থের মত সংসার চালানও তদ্দ্বারা সুকঠিন। এই সকল কারণে ও ভীষণ মনঃকষ্টে যদুনাথের শরীর ভাঙিয়া পড়িল।

তিনি রোগ-শয্যায় প্রায় বৎসরাবধি পড়িয়া থাকিলেন। চিকিৎসার ব্যয় বাড়িয়া গেল; পথ্যের খরচও বৃদ্ধি হইল; তখন আবার ঋণগ্রহণ করিতে হইল। ঋণও ক্রমে ক্রমে অনেক হইল। অথচ ব্যাধি আরোগ্য হইল না—যদুনাথ পাঁচটী নাবালক পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

যদুনাথের গৃহিণী নাবালক পুত্র কয়টি লইয়া অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হইলেন। কিন্তু সুদগ্রাহী উত্তমর্ণেরা তাঁহাদিগের অবস্থা বুঝিল না, অনটনের দংশনজ্বালা অনুভব করিল না—নাবালকগণের মুখের পানে চাহিল না—ভদ্রকুলবধূর হাহাকার মানিল না। তাহারা সুদে আসলে হিসাব করিয়া আদালতে নালিস করিল এবং ডিক্রিজারি করিয়া গাঁতিজমা ও আবাদের জমি কয় বিঘা বিক্রয় করিয়া লইল। বিধবা, গ্রামের ভদ্রাভদ্র সকলকেই জানাইলেন। তাহারা কি খাইয়া জীবন

রক্ষা করিবেন বলিয়া, দুয়ারে দুয়ারে কাঁদিয়া বেড়াইলেন—কিন্তু স্বার্থপর বিশ্বে বক্তৃতায় বাহাদুরী অনেকেই লইতে পারে—প্রকৃত দুঃখী আর্ত্তের নয়নজল মুছাইতে কেহই অগ্রসর হয় না! এক্ষেত্রেও কেহই এই আর্ত্ত বিপন্ন পরিবারের অশ্রুজল মোচনে অগ্রসর হইলেন না।

নবীন বড় ছেলে। রায়গ্রামের মাধব ঘোষের কন্যা জয়ন্তীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ অল্প বয়সেই হইয়াছিল। নবীনের শ্বশুর সংবাদ পাইয়া আসিলেন—অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারও আর্থিক অবস্থা ততদূর উন্নত নহে। তথাপি তিনি যতদুর পারিলেন করিলেন। মহাজনকে ধরিয়া যোতের জমি কয় বিঘা যে মূল্যে ডাকিয়া লইয়াছিল, সেই মূল্য এবং লাভের হিসাবে আরও কিছু দিয়া পুনরায় কবালা করিয়া লইলেন। আর ঐ জমিগুলির আবাদ করিবার খরচের জন্য এবং বর্ত্তমান সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নগদ টাকাও কিছু রাখিয়া গেলেন। অতঃপর মাসে মাসেও কিছু কিছু সাহায্য করিতেন।

নবীনের বয়স তখন পঞ্চদশের উপর নহে। যতীশ, ক্ষিতীশ, দানীশ তখন আরও ছোট। পাঁচকড়ি মোটে তিন মাসের শিশু।

নবীনই মাঠে গিয়া জমির উৎকর্ষসাধন জন্য যত্ন করিত—নবীনই মজুর ডাকিয়া ধান্যাদির বপনকার্য্য সমাধা করিত। নবীনই নিড়ান কাড়ানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিত—নবীনই ধান্যাদি পাকিলে কাটাই মাড়াই করাইয়া গৃহে আনাইত। যতীশ ক্রমে ক্রমে তাহার সাহায্য করিতে লাগিল। ক্ষিতীশ আর দানীশ তখন বালক—তাহারা খেলিয়া বেড়াইত। কদাচিৎ ভ্রাতৃ তাড়নায় মাঠে গিয়া হয়ত মজুরগণের 'জল-খাবার' যোগাইতে আসিত। আশৈশবের পিতৃহীন পাঁচকড়িও তখন ভ্রাতৃস্নেহের পবিত্র হিল্লোলে ক্রোড়ে ক্রোড়ে ফিরিত।

কয়েক বৎসর এইরূপেই কাটিয়া গেল। কিন্তু ক্রমে ভাগ্যলিপি অন্য পথে চালিত হইল। সেবারকার দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে বাটীর অধিকাংশ

লোকই শয্যাশায়ী হইয়াছিল। নবীনও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইল। অনেকে সেই বঙ্গ-পল্লীধ্বংসকারী কালোপম ব্যাধির হস্ত হইতে অনেক কষ্টে নিস্তার পাইল—অনেকে তাহার কালোদরে জীর্ণ হইয়া গেল। নবীন সকলকে কাঁদাইয়া—নিঃসহায় পরিবারবর্গকে অকূলে ভাসাইয়া মরণ-পথের পথিক হইল।

দিনকতক সে পরিবারে বড়ই হাহাকার উঠিল। তার পর, দিনে দিনে সকলেই একটু সাম্‌লাইয়া লইল। কিন্তু তাহাদের অভাব আরও বাড়িয়া উঠিল। নবীন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া যাহা অর্জ্জন করিত, তাহার পথ রুদ্ধ হইল—অধিকন্তু নবীনের শ্বশুর মাসিক যাহা সাহায্য করিতেন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার বালিকা কন্যা জয়ন্তী তখন শ্বশুরবাড়ী ছিল—তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যতীশচন্দ্র অগত্যা সমস্ত ভার গ্রহণ করিল। কিন্তু অর্থাভাবে সে কেবল শারীরিক পরিশ্রমে সকল দিক্ সঙ্কুলান করিতে পারিল না।

তখন নিরাশ হইয়া যতীশচন্দ্র মায়ের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। যতীশচন্দ্রের মাতা স্ত্রীলোক হইয়া যত দূর পারিতেন, পুত্রদিগকে সৎপরামর্শ দানে সাহায্য করিতেন।

মাতা-পুত্রে পরামর্শ করিলেন। শেষে যতীশচন্দ্র বিদায় লইয়া অর্থান্বেষণে বাহির হইলেন। মাতা, ক্ষিতীশকে লইয়া সংসারের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

দানীশের বয়স তখন প্রায় বার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। গ্রামের ভজহরি দত্ত কলিকাতার এক মার্চ্চেণ্ট অফিসের মুচ্ছুদ্দী। পূজার সময় তিনি বাড়ী আসিলে, যতীশের মাতা তাঁহার নিকটে গিয়া অনুনয় বিনয়

করিয়া বলিলেন যে, দানীশকে তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, তোমার ভাত কত কুকুর বিড়ালে খাইতেছে—যাহাতে উহার একটু পড়া-শুনা হয় তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। ভজহরি সেই বাঁরই দানীশকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেলেন এবং একটি স্কুলের অধিকারীকে ধরিয়া বিনা-বেতনে পড়িবার সুবিধা করিয়া দিলেন। ক্ষিতীশ তখন বাড়ীর কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিল। পাঁচকড়ি, গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কোন দিন যাইত—কোন দিন পাখীর ছানা পাড়িয়া ডাংগুলি খেলিয়া কাটাইয়া দিত।

যতীশচন্দ্র এক জমিদারের বাড়ীতে গিয়া অনেক দিন শিক্ষানবীশের কার্য্য করিলেন। তার পরে ছয় টাকা বেতনে মুহুরীর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া যতীশচন্দ্র বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন। সে পাঁচ টাকা আবাদে ব্যয় করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র চাষকার্য্য করিতে লাগিল।

যতীশচন্দ্র ক্রমশঃ একটি ভাল চাকুরী প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মাসিক আয় প্রায় পঞ্চাশ টাকা হইয়া উঠিল। ক্রমে নিজে বিবাহ করিলেন—তার পর ক্ষিতীশের বিবাহ দিলেন। দানীশের বিবাহে তাঁহার বড় ভাবিতে হয় নাই—দানাশ তখন এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তার্ণ হইয়া মেডিকেল-কলেজে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। শম্ভুনগরের কৃষ্ণহরি মিত্রের বিধবা স্ত্রী, সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বহু যৌতুকের সহিত কন্যা শান্তিকে দানীশের সহিত বিবাহ দিলেন।

যতীশচন্দ্রের সংসার এখন আর নিতান্ত দরিদ্রের সংসার নহে। পল্লীগ্রামে—ক্ষেতের ধান, বাগানের লাউ-কুমড়া, শশা, পুই-পালঙ্গ-ডেঙ্গ প্রভৃতি তরকারি, পুকুরের মাছ—আর পঞ্চাশ টাকা; ইহা দ্বারা রায়-পরিবারের একপ্রকারের দিন গুজরাণ চলিতে লাগিল। এতদিনে নবীনের স্ত্রী জয়ন্তী আসিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইল। তাহার পিতা প্রথমে পাঠাইতে অস্বাকৃত হইয়াছিলেন—কিন্তু জয়ন্তী পিতার কথা শুনে নাই। সে বলিল,

মানুষ জন্ম বৃথাই কাটিল, শাশুড়ী যতদিন জীবিত আছেন—তাঁহার সেবাটাই বা না করি কেন? জয়ন্তী আসিয়া সংসারের কাজ কর্ম্মের ভার নিজ-স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিল।

ক্ষিতীশ, চাষ-আবাদের কার্য্যই দেখিত; কিন্তু কয় বৎসর পর পর অজন্মাতে বড়ই লোক্সান পড়িয়াছিল বলিয়া, জমিগুলি ভাগে বিলি করিয়া দিয়াছে। কয়েক বৎসরের সুজন্মাতে যে একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছিল, তাহার হ্রাস হইয়া উঠিল; সম্প্রতি সংসারে আবার কিছু অনাটন আসিয়া দাঁড়াইল।

কাপড় যখন ছিন্ন হয়, তখন তাহার এক দিক সংস্কার করিতে গেলে অপর দিক বিগলিত হইয়া পড়ে। অর্থানটন-কষ্ট কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইতে না হইতে—পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাগম করিতে না করিতে, সংসারে কলহ-অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

মাসিক পঞ্চাশৎ-মুদ্রা উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর স্ত্রী শ্বেতাঙ্গিনী ভাবিতেন, তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী রমণী বুঝি রমণীকুলে দুর্লভ!

সেজ-বউ ক্ষিতীশের স্ত্রী—তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। তিনি ভাবিতেন, তাঁহাদের দুটো পেট—কতই লাগে! কেন অন্যের অধীন হইবেন। তবে তাঁহার স্বামী নিতান্ত নির্ব্বোধ—তিনি যে এত মাঠের খাটুনী খাটেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন, এত কাজ করিয়া বেড়ান—কৈ, তাঁহার স্ত্রীর তদুপযুক্ত সম্মান কোথায়? কৈ বাড়ীশুদ্ধ লোক সেজ-বউয়ের আজ্ঞাকারী হয় না? তবে পৃথক্ হইতে দোষ কি? পৃথক্ হইয়া এত কাজ করিলে, সেজ-বউয়ের গায়ে যে অলঙ্কার ধরিত না!

দানীশের স্ত্রী তখন সংসারের তত খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। সে যৌবন-হিল্লোলে হিল্লোলিতা ষোড়শী, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা। বড়-বউ তাহাকে শিক্ষানবিশী করাইতেন।

পাঁচকড়ির বিবাহও হয় নাই—সে বড় কিছুর মধ্যেও থাকিত

না। যেখানে রোগ শোক, ব্যথা জ্বালা, যেখানে আর্ত্তের করুণ-ক্রন্দন যেখানে মৃত্যুর হাহাকার—জাতিধর্ম্ম না দেখিয়া, আত্মপর বিবেচনা না করিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় সেই স্থানেই তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইত। গ্রামে সাধু, মহান্ত আসিলে দুই একবার সেখানে ঘোরা, তাহার আর একটা কার্য্য ছিল। আর নিশিশেষে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিত। এই সমস্ত কার্য্যের অবকাশকালে শ্রীমান্ শচীশচন্দ্রকে লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিত; যেখানে ফলটি মিলিত, ফুলটি পাইত, মিষ্টান্ন ক্রয় করিত, শচীশের সেবায় লাগাইয়া প্রীতিলাভ করিত।

তাহার এই সকল কার্য্যে সে মহা সন্তুষ্ট থাকিত; কিন্তু বুঝিতে পারিত না যে, বাড়ীর অনেকেই তাহাকে অপ্রীতির চক্ষুতে দেখিয়া থাকে।

যিনি গৃহিণী—যাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূগণ সংসারে ক্রমে ক্রমে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া তুলিতেছিল, তিনি সে সকল জানিতে পারিয়াও যথোপযুক্তভাবে তাহার প্রতিকার-সাধনে সক্ষম হইতেছিলেন না। ইহার দুইটি কারণ ছিল। এক, তিনি নিজে কিছু দাম্ভিকা—দ্বিতীয়, সংসারের খুঁটিনাটিতে তত সুনিপুণা নহেন।

দাম্ভিকা বলিয়া কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কেন না, যেরূপ কাল দিন, যদি কেহ কিছু তাঁহাকে বলে, তিনি অভিমানে মরিয়া যাইবেন।

সংসারের খুঁটিনাটি বুঝিতেন না বলিয়া, কে কি করিতেছে, কাহার মতিগতি কোন্ দিকে যাইতেছে—কে কাহাকে কি কুশিক্ষা দিতেছে, তাহা তিনি ধরিতে পারিতেন না। কাজেই যথোচিত শাসনও করিতে পারিতেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আশ্বিন মাস। পূজার আর দিন নাই। শারদীয় শোভায় শারদার আহ্বান লিপি লিখিত হইয়াছে।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময় দানীশচন্দ্র বাড়ী আসিলেন। মধ্যাহ্নে যতীশচন্দ্র বাড়ী আসিয়াছিলেন।

দানীশ মেডিকেল কলেজের শেষ-পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং মজঃফরপুরের সরকারী চিকিৎসালয়ে মাসিক দেড়শত মুদ্রা বেতনের চাকরীর সনন্দ লইয়া আসিয়াছেন। পূজান্তে সেখানে যাইয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিবেন।

আসিবার সময়, বিদেশবাসে যাহা কিছু প্রয়োজন, দানীশচন্দ্র সে সকল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন—বিদেশে অবসরকালে চিত্ত-বিনোদনের জন্য এক বন্ধুর নিকট হইতে একটা হারমোনিয়মও চাহিয়া আনিয়াছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়—গ্রামের পূজাবাড়ীতে বোধনের বাজনা বাজিতেছিল।

দানীশচন্দ্রের দ্রব্যগুলি তখনও গৃহে উঠে নাই, দাবায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কিন্তু প্রায় সমস্তগুলিই বস্ত্রাবৃত। দানীশ হাত পা ধুইতেছিলেন। মাতাঠাকুরাণী সেখানে অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে যতীশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। দানীশ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শচীকে কোলে করিয়া পাঁচকড়ি আসিয়া ন-দাদাকে প্রণাম করিল। দানীশ শচীকে কোলে লইলেন এবং একটা গাঁট্‌রী খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে শচীর জামা কাপড় জুতা ও খেলনা বাহির করিয়া দিলেন; বালক সেগুলি হস্তগত করিয়াই ছোট কাকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন পাঁচকড়ি তাহাকে সেই নব পরিচ্ছদগুলি পরাইয়া দিতে লাগিল।

যতীশচন্দ্র দানীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর শরীর ভাল ছিল,ত?"

দানীশ। হাঁ—ভালই আছে আমার চাকুরী হইতেছে।

যতীশ। কোথায় ?

দানীশ। মজঃফরপুরে।

যতীশ। অনেক দূর।

দানীশ। আমি ইচ্ছা করিয়াই সেখানে যাইতেছি।

যতীশ। কেন ?

দানীশ। সেখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল।

ক্ষিতীশ। পশ্চিমদেশ—ম্যালেরিয়ায় আমাদের দেশের মত সে দেশ এখনও জীর্ণ করে নাই।

পাঁচকড়ি, শচীর পায় জুতা পরাইতে পরাইতে পুলকপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে সেখানে যাইবেন ?"

দানীশ। পূজার পরেই—কেন ?

পাঁচকড়ি। আমিও যাব।

ক্ষিতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "কেন, সেখানে সন্ন্যাসী মোহান্ত অনেক আছে না কি ?"

পাঁচকড়ি লজ্জিত হইল। যতীশচন্দ্র বলিলেন, "কথা মন্দ নয়, চাকুরী স্থায়ী হইলে পাঁচকড়িকে সেখানে লইয়া যাইও!"

ক্ষিতীশ। সেখানে গিয়া কি করিবে ?

যতীশ। দানীশের ডাক্তারখানায় কিছুদিন থাকিয়া যদি একটু আধটু শিখিতে পারে—তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ে থাকিয়া দু'পয়সা রোজগার করিবে।

ক্ষিতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যত কাজ আছে, তার মধ্যে চিকিৎসা-কাজ বড় কঠিন।"

যতীশ। তা জানি—কিন্তু কত গোবেচারি কিছু না পড়িয়া শুনিয়া কখনও কোন ডাক্তারের সহিত একটী কথাও না কহিয়া চিকিৎসা করিতেছে ;—রোগীও সারে—দু'পয়সা রোজগারও করে।

সে সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা কহিল না। . ততক্ষণে শচীর জুতা পরান সমাপ্ত হইয়াছিল। পাঁচকড়ির দৃষ্টি তখন বস্ত্রাবৃত হারমোনিয়মের উপর পতিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল,—ওটা কি ন-দাদা? হারমোনিয়ম নাকি?"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ হারমোনিয়ম; ডাক্তারী করিতে যাবে, তাই রোগীকে শুনাইবে বলিয়া সঙ্গে লইয়াছে।"

দানীশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওটা হারমোনিয়মই বটে!"

পাঁচকড়ি ততক্ষণ গিয়া তাহার আবরণ উন্মুক্ত করিতেছিল। আবরণ খুলিয়া বাক্স বাহির করিল; তারপর চাবি খুলিয়া হারমোনিয়মটি বাহির করিয়া, দীপালোকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল, "বাহবা, এ ত খুব ভাল হারমোনিয়ম দেখিতেছি!"

শচী বলিল, "ছোটকাকা—হারমোনি বাজা!"

পাঁচকড়ি শচীকে ক্রোড়ে করিয়া হারমোনিয়মকে দক্ষিণ-কক্ষে গ্রহণ করিল এবং আর বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া, বহির্ব্বাটী-অভিমুখে চলিয়া গেল।

বাক্সেয়াপ্তির ঘোর আশঙ্কায় দানীশচন্দ্র বলিলেন, "ওটা পরের জিনিস—চাহিয়া আনিয়াছি। এখনি আবার আনিস্।"

পাঁচকড়ি তখন প্রাঙ্গণ প্রান্তে। ন-দাদার কথার উত্তরে বলিয়া গেল, "এখনি আন্‌চি।"

মাতা সেখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ষষ্ঠির কোলে শেয়ানা হ'ল, তবু তেমন বোধ-সোধ হ'ল না,—ওকে নিয়েই আমার যা কিছু ভাবনা।"

যতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে বাস্তবিকই ভালবাসিতেন। পিতৃহীন একটু-খানি শিশুকে হৃদয়ের স্নেহ-করুণা দিয়া মানুষ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "ও সকলের ছোট, তাই একটু আদুরে, বড় হ'লে একটু বোধ-সোধ হ'লেই সারিয়া যাইবে। দানীশের সঙ্গেই উহাকে দিব। তবে দানীশ দুই একবার ঘুরিয়া আসুক।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, মজঃফরপুর কি বাঙ্গলা মুল্লুকে নয় ?"

যতীশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না।"

মাতা। ও মা,—তবে কোন্ দেশে ? বিলেতে না কি ? সে দেশে গেলে জাত যাবে না ত ?

যতীশ। না মা,—মজঃফরপুর আমাদেরই দেশে, পশ্চিমে। তত বেশী দূরও নয়, টাকা পাঁচেক গাড়ীভাড়া—দু'দিনেই পঁহুছান যায়।

মাতা। মাইনে কত হইল ?

দানীশচন্দ্র। আপাততঃ দেড়-শো টাকা। তবে শীঘ্রই বাড়িবে।

মাতা। মাসে দেড়শো টাকা ?

দানীশ। হ্যাঁ।

মাতা। তুই ছেলে-মানুষ—অত টাকা তোকে দেবে ?

দানীশ হাসিল—কিন্তু সে কথার কোন উত্তর করিল না। যতীশ বলিলেন, "লেখাপড়া শিখিয়াছে, টাকা দিবে না কেন মা ?

মাতা। আমার কপালে সকলে বেঁচে বত্তে থেকে রোজগারপত্র কর, —মিলে মিশে থাক ; আমি তাই দেখে যাই। কা'ল সত্যনারায়ণের সিরণি দিতে হবে। ঠাকুর আমাদের সকল দিক্ বজায় রাখুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শারদীয় শুক্লা-ষষ্ঠীর শশধর তখন অস্তমিত ; পূজা-বাড়ীর উৎসব-কোলাহল নিস্তব্ধ ; কচিৎ কোন সহকার শাখাগ্রে বসিয়া পাপিয়া 'বউ কথা কও' বলিয়া সাধা-গলায় সেই পুরাতন কথার আবৃত্তি করিয়া চিরসংস্কার-সঞ্চিত অভিমানিনীর দুর্জ্জয় মানের পরিহার চেষ্টা করিতে-ছিল ; এবং দানীশের অসংস্কৃত শয়ন-কক্ষ হইতে হারমোনিয়মে বেহাগের স্বর উত্থিত হইতেছিল।

কক্ষমধ্যে কাচমণ্ডিত আধারে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল এবং দূরাগত সমীরে শেফালীকাগন্ধ অনুভূত হইতেছিল।

দানীশচন্দ্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া হারমোনিয়ম বেলো করিয়া বেহাগ-রাগিণীতে "সে কেন আমার পানে চুরি ক'রে চায়।" গানের স্বরলিপি বাজাইতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে অনিন্দ্যসুন্দরী ন-বউ একখানি শুভ্র চাদরে আপাদ-মস্তক আচ্ছাদন করিয়া সান্ধ্যফুল্ল গোলাপ-কলিকার ন্যায় শায়িত ছিল।

দানীশচন্দ্র বাজাইয়া বাজাইয়া যখন স্ত্রীর নিকট একটীও বাহবা বা প্রণয়ের হা-হুতাশ-সূচক কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না, তখন বাজনা বন্ধ করিয়া দিয়া, ন-বউয়ের মুখের কাপড় ধরিয়া টান দিলেন। ন-বউ ওরফে শান্তি তখন মৃদু হাসিয়া উঠিয়া বসিল।

শান্তি উঠিয়া বসিলে, দানীশচন্দ্র তাহার খোঁপা ধরিয়া টান দিলেন। খোঁপা খুলিয়া গেল—কুসুমরাশি ঝরিয়া পড়িল। ভুজঙ্গিণীর ন্যায় বেণী পৃষ্ঠে লম্বিত হইল। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এত দৌরাত্ম্য কেন ?

দানীশচন্দ্রও হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আমার বাজনা শুনিবে না কেন ?"

শান্তি, প্রেমাবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "শুনিতেছিলাম না ত কি কানে তুলা দিয়া ছিলাম ?"

ক্ষুণ্ণস্বরে দানীশ বলিল, "তুমি যে গান বোঝ না।"

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই ত শুনি না !"

দানীশ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ত পূজার পরেই পশ্চিমে যাব, তুমি কি করিবে ?"

শান্তি দীর্ঘায়ত নয়ন-যুগলের স্থিরদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া বলিল, "পূজার পরেই যাবে ?"

দানীশ। হাঁ।

শান্তি। অন্যান্যবারে পূজার সময় বাড়ী আসিয়া ত দিনকতক থাক্‌তে।

দানীশ। অন্যান্যবার যতদিন কলেজ বন্ধ থাকিত, ততদিন থাকিতাম, এবার চাকুরী করিতে যাইব! তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

শান্তি। আপত্তি কি? তুমি যদি লইয়া যাও, তবে আমি যাইব না কেন?

দানীশচন্দ্র তত সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার আশা ছিল, এই বিদেশ-গমনের কথা লইয়া বিরহাশঙ্কার মহানাটকের অভিনয় হইবে—কত দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইবে, কত হৃদয়ের গুরুভার বর্ণনা—কত কাতর-কাহিনীর প্রসঙ্গ উঠিবে—তারপরে প্রবাস যাইবার জন্য পায়ে পড়াপড়ি হইবে—সঙ্গে না লইতে চাহিলে, উদ্বন্ধনে বা বিষম বিষে আত্মহত্যার কথা উঠিবে। কিন্তু সে সকলের কিছুই হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সপ্তমীর প্রভাতে প্রভাতী-বাদ্যকোলাহলে পল্লী জাগরিত হইল। পাড়ার বালকবালিকাগণ নবপরিচ্ছদ-পরিহিত হইয়া দলে দলে পূজার বাড়ী ঠাকুর দেখিতে ছুটিল।

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে যতীশচন্দ্র শ্বেতাঙ্গিনীকে বলিলেন, "আমি যাহা আনিয়াছি সমস্তই তোমার কাছে দিয়াছি—আমার হাতে এক পয়সাও নাই।"

শ্বেতাঙ্গিনী। তোমার দরকার কি?

যতীশ। দরকার আছে বৈ কি। কাপড় চোপড় সব কেনা হয় নাই।

শ্বেতাঙ্গিনী। কাপড় ত একরাশ আসিয়াছে!

যতীশ। নিস্তারের আসে নাই—ভিখুর আসে নাই। নবার মাকে বছর বছর একখানা কাপড় দেওয়া হয়, এবারেও দিতে হবে—তা' আনা হয় নাই।

শ্বেতাঙ্গিনী। তা আমি কি করিব? আমার হাতে যা দিয়াছ, তাহা হইতে একটী পয়সাও আর পাইবে না। সে আমার খোকার তহবিলে জমা হইয়া গিয়াছে।

যতীশ। তা বলিলে চলিবে না। তিন শো টাকা আছে—দু'শো তুমি রাখ,—একশো আমায় দাও।

শ্বেতাঙ্গিনী। এক পয়সাও না।

যতীশ। তবে কি দিয়া সকল দিক্ সামলাইব? দোকানের উঠ্‌নার দেনা, কলুর তেলের দাম, চৌকিদারের ট্যাক্স, জমিদারের খাজনা—তা ছাড়া পূজার দিন—অপরাপর কত খরচ-পত্র আছে। সবই যে ঐ টাকা হইতেই মিটাইতে হইবে।

শ্বেতাঙ্গিনী। তবে সব টাকা আমায় দিলে কেন?

যতীশ। সেটা এমন গুরুতর অপরাধ হয় নাই।

শ্বেতাঙ্গিনী। আমাকে জ্বালাতন করিও না—আমি এক পয়সাও দিব না—দিব না—দিব না।

যতীশ। খরচ-পত্র—

শ্বেতাঙ্গিনী। কিসের খরচ-পত্র? ক্ষেতের ধান হইয়াছে, তাই বিক্রয় কর।

যতীশ। সম্বৎসর সংসার চলিবে কিসে

শ্বেতাঙ্গিনী। আমন ধান হবে।

যতীশ। আমন আউসে যাহা হয়, তাহাতেও বৎসর কুলায় না।

শ্বেতাঙ্গিনী। তুমি বোঝ ছাই—সকলের খরচ, তুমি একা চালাইবে কেন? ধান বেচ—সংসার চলুক। এই ত তোমার ন-ভাইয়ের দেড়শো টাকা মাইনের চাকুরী হ'ল, তখন না হয় চা'ল কিনিও।

যতীশচন্দ্র কিছু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কি বলিতে যাইতে-ছিলেন—কিন্তু মেজ-বউ অবিচলিতভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্য সময়ে আরও একবার সবিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিয়া যতীশচন্দ্র বুঝিলেন, শ্রীমতীর হস্তগত অর্থের কপর্দ্দক মাত্রও প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

কলু আসিয়া দাদাঠাকুরের শারীরিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যোগানের তৈল দান করিল। তৎপরে কর্ত্রীর নিকট প্রাপ্যমূল্য প্রার্থনা করিল।

মাতা, মধ্যম-পুত্রকে বলিলেন, "ভূষোর তেলের দাম হিসাব করিয়া মিটাইয়া দে!"

যতীশচন্দ্র, ভূষো ওরফে ভূষণ গরাইয়ের সহিত হিসাব করিলেন। এগার টাকা নয় আনা আড়াই পয়সা তাহার পাওনা।

"কাল টাকা পাইবে" বলিয়া যতীশচন্দ্র তাহাকে বিদায় করিলেন। সে বিদায় হইতে না হইতেই ঘোষাণী দুগ্ধের হিসাব লইয়া উপস্থিত হইল—তাহার পাওনা বাইশ টাকা আট আনা। তাহাকেও কল্য টাকা দিবার আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুদী আসিল। মুদীর অনেক টাকা বাকি,—প্রায় একশত। তার পরে মেছুনী আসিল, ময়রা আসিল, ধোপাবউ আসিল,—যতীশচন্দ্র সেদিনকার মত সকলকেই বিদায় দিলেন।

বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু পূজার সময়; এ সময়ে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া না দিলে, কোন প্রকারেই চলিবে না। অথচ যাহা আনিয়াছিলেন তাহা সমস্তই শ্বেতাঙ্গিনীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন—তাহার এক পাই পয়সাও পাইবার আশা বা সম্ভাবনা নাই। তবে এখন উপায় কি? ক্রমে অনেকখানি বেলা হইল, যতীশচন্দ্র নিজ কক্ষে অতি ম্লানমুখে বসিয়া অর্থ চিন্তা করিতেছিলেন। এক একবার শ্বেতাঙ্গিনীর উপরে অত্যন্ত রাগ হইতেছিল—আবার পরক্ষণেই কি এক অবক্তব্য—অজানিত মোহ-মদিরার নেশা আসিয়া সে রাগ উড়াইয়া দিতেছিল।

এই সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র কি এক কার্য্যোপলক্ষে মেজদাদার নিকট আগমন করিলেন। মেজদাদার মুখ নিতান্ত মলিন ও বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছে ?"

যতীশচন্দ্র মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না—কোন অসুখ করে নাই।"

ক্ষিতীশ। তবে অমন করিয়া বসিয়া আছেন কেন ?

যতীশ। বড় ভাবনায় পড়িয়াছি—এবার একটী পয়সাও আনিতে পারি নাই। অথচ সকলের টাকা না মিটাইলে নয়। কা'ল দিব বলিয়া সকলকে বিদায় দিয়াছি ; কিন্তু দিব যে কোথা হইতে তাহার উপায় নাই।

ক্ষিতীশ। ভাবনার কথাই বটে—উপায় কি ?

যতীশ। টাকা কা'ল চাই-ই। পূজার সময়, এখন কিছু কোথাও ধার পাওয়া যাইবে না ?

ক্ষিতীশ। না—তা' আর কোথায় পাওয়া যাইবে ?

যতীশ। ধান আছে কতটী ?

ক্ষিতীশ। বিক্রয় করিবেন ?

যতীশ। অগত্যা! অন্য উপায় ত নাই।

ক্ষিতীশ। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত খোরাকীর ধান রাখিয়া একশত টাকার হইতে পারে।

যতীশ। আমন ধান আছে ?

ক্ষিতীশ। যদি কার্ত্তিকমাসে জল হয়, তবে চারি পাঁচ মাসের খোরাকী ধান্য হইতে পারিবে।

যতীশ। যাহা অদৃষ্টে থাকে, পরে তাহাই হইবে। আপাততঃ কাল সকালেই ধানের খরিদদার মিলিবে ?

ক্ষিতীশ। তা মিলিবে। বলেন যদি আজই বিকালে বিক্রয় করিয়া দিতে পারি।

যতীশ। তবে তাই ; কাল তাহাদের প্রাপ্য টাকা দিতেই হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

অষ্টমীর দিন চৌধুরীবাড়ী পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য মেয়েদের ডাক হইয়াছে ; মেজ-বউ, ন-বউ কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইয়াছে—সেজ-বউ যাইবে না।

না যাইবার হেতুবাদ কেহই আবিষ্কার করিতে সক্ষম নহেন। শাশুড়ী গিয়া কত সাধিলেন, কত অনুনয় বিনয় করিলেন—সধবা স্ত্রীলোকের অষ্টমীর মহাপ্রসাদ না খাইলে গুরুতর প্রত্যবায় আছে বুঝাইয়া দিলেন ; কিন্তু সেজ-বউ কিছুতেই যাইবে না।

তখন বড়-বউ চেষ্টা করিলেন। তিনিও ব্যর্থচেষ্টায় বেদনাগ্রস্ত হইয়া ফিরিলেন। অবশেষে বাড়ীর ঝি নিস্তার আসিল। সে অপারগ হইল কিন্তু মূল কারণ আবিষ্কার করিল—বলিল, "ভাল গহনা, ভাল কাপড় না থাকায় তিনি যেতে চাচ্ছেন না।"

বড়-বউ বলিলেন, "ওমা, সে আবার কি কথা! যাদের ভাল কাপড়, ভাল গহনা নাই, তারা কি নিমন্ত্রণে যায় না! হা বোন্—সময় কিছু চিরদিন এমন থাকিবে না। আর গহনাপত্র যে সকল গেরস্তেরই ঘরে থাকে তাও নয়। বচ্ছরকার দিন অমন করিতে নাই।"

পুচ্ছমর্দ্দিতা ভুজঙ্গীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া সেজ-বউ নিস্তারকে বলিল, "তোকে কে সে কথা বললে লা? দিন দিন তোর বড় বাড় হ'য়ে উঠেছে দেখছি।"

নিস্তার সেস্থলে আর কথা কহা যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনায় সংযতবাক্ হইল। মেজ-বউ বলিলেন, "তবে কি জন্য যাইতে চাহিতেছ না?"

সেজ-বউ। আমার ইচ্ছা।

মেজ-বউ। তোমার ইচ্ছা? গৃহস্থের ঘরের বউ—এমন আপন ইচ্ছায় চলিলে হইবে কেন?

সেজ-বউ। না হয় যাহা করিলে ভাল হয়, তাহাই হ'ক্।

এই সময় শচীকে লইয়া চারি ভাই নিমন্ত্রণ খাইয়া বাটী আসিলেন।

যতীশচন্দ্র নিস্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব উঠানে দাঁড়াইয়া কেন? যাও।"

নিস্তার। সেজ-বউ ঠাকৃরুণ আসছেন না ব'লে কেউ যেতে পাচ্চেন না।

যতীশ। কেন, তিনি যাবেন না কেন?

নিস্তার। কি জানি বাবু, আমরা গরীব মানুষ, আমরা ওর কি বুঝব?

বড়-বউ বলিলেন, "এখনকার কালের বউ-ঝি, ওদের অন্ত পাওয়াই ভার।"

ক্ষিতীশচন্দ্র ততক্ষণ গৃহমধ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে সেজ-বউ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

যতীশচন্দ্র বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

শচীশচন্দ্র তখন পাঁচকড়ির ক্রোড়ে। বড়-বউ বলিলেন, বাবা, কেমন ঠাকুর দেখলে?"

শচী তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুন্দ-দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া চক্ষু টানিল। সকলে হাসিয়া উঠিল!

বড়-বউ ডাকিয়া বলিলেন, "সেজ-ঠাকুরপো, সেজ-বউকে পাঠিযে দাও; বেলা গেল।"

তদুত্তরে বিরক্তিস্বরে ক্ষিতীশ বলিল,—"না, সে যাবে না।"

বড়-বউ। ও মা! অষ্টমীর দিন সধবা-বউ—মহাপ্রসাদ পাবে না?

ক্ষিতীশ। সধবা, বিধবা হইলেই আমি বাঁচি, উহারও সোয়াস্তি হয়।

বড়-বউ "ষা'ট ষা'ট" করিয়া উঠিলেন। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন।

তখন অগত্যা নিস্তারকে সঙ্গে লইয়া মেজ-বউ ও ন-বউ চৌধুরীবাড়ী চলিয়া গেল। বড়-বউ গৃহান্তরে গিয়া সাংসারিক কার্য্যে মনঃসংযোগ

করিলেন। পাঁচকড়ি শচীকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে গেল। সেখানে দানীশ যতীশ ও পাঁচকড়ি শচীকে লইয়া গল্প করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন, "যাই বল, তুমি নিতান্ত অবুঝ!"

সেজ-বউ। যাহার কপাল মন্দ, সে কিছুই বোঝে না। আমি কি করি?

ক্ষিতীশ। নিমন্ত্রণে সবাই গেল, তুমি গেলে না?

সেজ-বউ। আমি কি নিস্তারেরও অধম?

ক্ষিতীশ। সে কি ও কথা কেন?

সেজ-বউ। নিস্তারের এসেছে সুন্দর রেলপেড়ে শাড়ী, আর আমার একখানা রাঙাপেড়ে ছাই

ক্ষিতীশ। এই কথা? তার বিলাতী তোমার দেশী।

সেজ-বউ। আর মেজ-বউ ন-বউয়ের এক পাড়ের কাপড়—যেমন পাড়, তেমনি খোল।

ক্ষিতীশ। দাদা ঐ কাজটা ভুল ক'রেছেন। সেজ-বউ ন-বউয়ের এক জোড়া, আর মেজ-বউয়ের পৃথক একখানা আনিলেই ভাল করিতেন। যাক্, সে পাড়ের জন্যে আর কি হইল! কাপড় সব সমান।

সেজ-বউ। তা যেন হ'ল—আমার হাতে তিনটা ভাঙা চুড়ি, একবার কেহ চাহিয়াও দেখিল না। কিন্তু ন-বউর অমন চুড়ি ছিল, আবার একস্যুট চুড়ি আসিল।

ক্ষিতীশ। সে ত মেজ-দাদা আনেন নি, বড়-বউ দিয়াছেন।

সেজ-বউ। যেই দিক্—কেন দেয় তা জান?

ক্ষিতীশ। না।

সেজ-বউ। তার স্বামী গুণবান্—দেড়শো টাকা মাইনে হ'য়েছে তাই!

ক্ষিতীশ। সে ত আমাদেরই ভাল।

সেজ-বউ। তোমার যেমন বুদ্ধি! কিসে ভাল?

ক্ষিতীশ। মাসে মাসে অনেক টাকা আমাদের সংসারে দেবে—আমাদের অভাবের দায় দূর হবে।

সেজ-বউ। হ্যাঁ দেবে! দায়ে পড়িয়া যাহা দেবে, তাহার মত মুখ-নাড়া না দিয়া ছাড়িবে না। তোমার খাটুনি কি চিরদিনই বৃথা যাবে?

ক্ষিতীশ। কেন? এবার ধান মন্দ হইয়াছে কি? সেদিন মোটা-মুটি একটা হিসাব ধরিয়া দেখিয়াছিলাম, সমস্ত খরচপত্র বাদে প্রায় এক শত টাকা লাভ হইয়াছে।

সেজ-বউ। কিন্তু তাহাতে তোমার কি? এই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়াও কি কাহারও নিকট একটু সুখ্যাতি পাইয়াছ? আর ঐ যে তোমার রক্ত জল-করা ধানগুলা বিক্রয় হইয়া গেল, তুমি কি তাহা হইতে একটি পয়সা পাইলে? সবাই স্বাধীন—বিদেশের পয়সা কত আসিল, কত খরচ হইল, কত বাক্সে উঠিল, কেহ বুঝিল না, কেহ খুঁজিল না; আর তোমার একটি পয়সার প্রয়োজন হইলে পাইবার উপায় নাই! তারপর লোকের মুখনাড়া খাইতে খাইতে প্রাণ গেল। ভিখু আর তুমি—নিস্তার আর আমি, এ বাড়ীতে কোন প্রভেদ নাই।

একটু গম্ভীর অথচ নম্রস্বরে ক্ষিতীশ বলিলেন, "সব বুঝি, কিন্তু সংসারে সর্ব্বদাই অস্বচ্ছল অবস্থা। দুই এক পয়সা সংস্থান করিব, তাহার উপায় কৈ? ভগবানের ইচ্ছায় একটু সুবিধা হইলেই সে চেষ্টা করিব।"

সেজ-বউ মুখখানা অত্যন্ত কালো করিয়া বলিল, "মাঠ-খাটার কখনও স্বচ্ছল অবস্থা হয় না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এখনও ত রাত্রি প্রভাত হয় নি, তুমি উঠিলে কেন"—দীর্ঘায়ত উদাস করুণ নয়নযুগল স্বামীর মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া ন-বউ এই কথা বলিলে দানীশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি উঠিয়াছ কেন ?"

ন-বউ ভারি কাজে ব্যস্ত। কি কাজ করিতেছিল, তাহার বড় একটা স্থির ছিল না। প্রভাতের গাড়ীতে দানীশচন্দ্র পশ্চিমে যাত্রা করিবেন। সন্ধ্যারাত্রেই তাঁহার ব্যাগ ব্যাগেজ বাঁধা এবং সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল। তথাপি কিন্তু এ যাবৎ ন-বউয়ের কাজের অবধি ছিল না। কত রাত্রি থা'কতে সে যে উঠিয়াছে, তাহা দানীশ জানে না। স্বামীর জুতো জোড়াটা, কোট-কাপড়গুলা কতবার ঝাড়িয়াছে, কতবার ফুঁ দিয়াছে এবং কতবার সরাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিঃশব্দে সমস্ত গৃহে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সমস্ত কার্য্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

স্বামীর কথার উত্তরে ন-বউ বলিল, "আমি উঠিয়াছি তাহাতে কি হইল, আমি ত আর বিদেশে যাচ্ছি না যে বিনিদ্রায় পথে কষ্ট হবে !"

দানীশ ততক্ষণ উঠিয়া বসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ঘুমের ব্যাঘাত হইবে না, বরং বাড়াবাড়িই হইবে। বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় গাড়ীর মধ্যে নিদ্রাই অবলম্বন।"

ন-বউয়ের বুকের মধ্যে কেমন একটা আকুল উচ্ছ্বাস তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। চক্ষুতে জল আসিল। তাড়াতাড়ি রুদ্ধশ্বাসে সে বাহিরে যাইয়া আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া আসিল।

তপ্ত নিশ্বাসের সহিত একটী বিরহ-কবিতার আশা দানীশচন্দ্রের হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল,—হায়, তাঁহার স্ত্রী যে সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা।

দানীশচন্দ্র ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "ভোর হইয়া গিয়াছে। গাড়ী আসিতে আর এক ঘণ্টা বিলম্ব !"

মোটে একঘণ্টা! শান্তির সমস্ত হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল।

দানীশ উঠিয়া বাহিরে গেলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কিছু জলযোগ করিতে বসিলেন।

তখন দিবালোক বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে।

গাড়ীর আর বিলম্ব নাই জানিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র দুজন কুলী সঙ্গে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া ডাকিলেন, "দানীশ, গাড়ীর বিলম্ব নাই, তুমি কি প্রস্তুত হইয়াছ?"

ভোজননিরত দানীশচন্দ্র গৃহমধ্য হইতে বলিলেন, "এই আমার খাওয়া হইল, আর সব প্রস্তুতই আছে। কুলী আসিয়াছে কি?"

ক্ষিতীশ। দু'জন কুলী আসিয়াছে।

শান্তি কি আনিতে যাইতেছিল, একটী ব্যাগেজে পা বাঁধিয়া হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইল। দানীশ বলিল, "তুমি বড় ব্যস্ত-বাগীশ!"

শান্তির চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। সে মনে মনে বলিল, "আমি ব্যস্ত-বাগীশ, না তুমি ব্যস্ত-বাগীশ! তোমাকে এত তাড়াতাড়ি কে যাইতে বলিয়াছিল। তুমি আগে কত আশা দিতে, ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে আসিয়া চিকিৎসা-কার্য্য করিবে! এখন বিদেশে যাও কেন?" কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিল না—কেন বলিবে? লজ্জা করে না বুঝি?

আহার সমাপ্ত করিয়া দানীশচন্দ্র নিজের জিনিসগুলি গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। ক্ষিতীশচন্দ্র তাহা কুলিদিগের মাথায় তুলিয়া দিলেন। দানীশচন্দ্র ততক্ষণ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল। তার পরে শান্তির ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের কোমল অঙ্গুলীর টিপ দিয়া বলিল, "তবে যাই?"

বর্ষার গোলাপের মত জলভরা ডাগর চক্ষু দুইটী স্বামীর মুখের উপর

সংস্থাপন করিয়া, ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া, ধরা-গলায় ভরা আওয়াজে শান্তি বলিল, "কবে আসিবে ?"

ও ছি ছি! এই কথার কি এই উত্তর? কৈ সে ব্যথিত বিদীর্ণ আসন্ন বিরহের মর্ম্মোচ্ছ্বাসিত কবিতা কোথায়? কোথায় সে দরশ-পরশ আশাহীনার কল্পিত কাহিনীর মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ!

দানীশ অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন, "যখন অবসর পাইব।"

কিন্তু হায়! তথাপি তো শান্তি গাহিল না—"আমি নিশিদিন রব তোমার আশায়; তুমি অবসর মত আসিও!"

যখন নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে দানীশ গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রাঙ্গণে দানীশের মাতা, বড়-বউ, যতীশচন্দ্র এবং আরও অনেকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দানীশ পূজনীয়গণের পদধূলি মস্তকে লইল। সকলেই ছলছল-নেত্রে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দানীশ বাটী হইতে বহির্গত হইল। ক্ষিতীশ তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত গমন করিল।

শান্তি গৃহতলে বসিয়া পড়িল, তাহার বোধ হইতেছিল, কেহ যেন একান্ত জোর করিয়া তাহার দেহমধ্য হইতে প্রাণটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

সকলে আপন আপন কাজে চলিয়া গেল, বড়-বউ শান্তির কাছে গেল। দেখিল, শান্তির সদাপ্রফুল্ল চক্ষু দুইটী স্ফীত, রক্তাভ ও জলপূর্ণ হইয়াছে।

বড়-বউ তাহার মুখখানি ধরিয়া ঈষদুন্নত করিয়া বলিলেন, "ও কি লা, মানুষ কি বিদেশে যায় না? আর কবেই বা দানীশ তোর আঁচল ধরিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত। ও ত চিরকালই বিদেশে।"

বায়ু-সঙ্ঘাতে গোলাপের সঞ্চিত জল ঝরিয়া পড়িল। শান্তি অতি কষ্টে চক্ষুর জল এতক্ষণ চক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না, ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে জল আঁচলে মুছিয়া বলিল, "এ যে অনেক দূর!"

"ও মা! গাড়ীর পথ আবার দূরাদূর, আয় আমরা কাজ করিগে"—বলিয়া বড়-বউ তাহাকে টানিয়া লইয়া রন্ধনগৃহে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দানীশচন্দ্র মজঃফরপুরে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বয়সে নবীন হইলেও শিষ্টস্বভাবে কার্য্যকুশলতায় অল্পদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন।

ছয় মাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই দানীশের যশঃ ও খ্যাতি যথেষ্ট হইয়াছিল; অনেক বন্ধুবান্ধবও জুটিয়াছিল।

শ্রাবণ মাস। সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। তখন মধ্যাহ্নকাল। এমন বর্ষণার্দ্র নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে নিঃসঙ্গ মানুষের প্রাণ সঙ্গলাভের আশায় ব্যগ্র হইয়া পড়ে। দানীশ তখন তাঁহার বাসগৃহে একা। তাঁহার প্রাণ বড় উদাস-বিহ্বল, প্রাণে তখন কত কথা জাগিতেছিল। সুদূর পল্লীর নিস্তব্ধ গৃহ—সুদূর পল্লীর নিস্তব্ধ কক্ষ-মধ্যস্থ সেই নীরব-প্রেমের নীরব-কাহিনী। বিদায়কালের সেই জলভরা চক্ষু—সেই বায়ুতাড়িত ফুল্ল-কোকনদ সদৃশ কম্পিত রক্তাধর! মনে হইতেছিল, বুঝি এমন দিনে সেখানে থাকিলে প্রাণ এমন উদাস হইত না।

পরক্ষণেই মনে হইল—তাহা হইলে কি হইত! সে কিছুই জানে না। জানে কেবল গৃহকার্য্য করিতে—পরিচারিকায় যাহা করে, সে তাহাই করিতে জানে। কাব্যকলা বা সঙ্গীতবিদ্যার ধারও ধারে না। তবে তেমন মিলনে এ উদাসভাব দূর হইত কিসে?

চিন্তাক্লিষ্ট দানীশ হারমোনিয়মটী টানিয়া লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একখানা চিঠি লইয়া একটা লোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল।"

দানীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রলোক না কি ?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে না, কাহারও বাড়ীর চাকর হইতে পারে।"

"চিঠি নিয়ে আয়"—এই কথা বলিয়া ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিয়া দানীশ-চন্দ্র হারমোনিয়মটীকে বাক্সের মধ্যে পূরিয়া রাখিলেন। তিনি বুঝিলেন, তখনই কোন রোগীর বাড়ী গমন করিতে হইবে।

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া দানীশের হাতে পত্র প্রদান করিল। পত্র-খানির বাহ্যাবরণ অতি সুন্দর। একখানি মোটা মসৃণ লেফাফার উপরে দানীশের নামে ইংরাজীতে শিরোনামা লেখা।

দানীশ পত্রাবরণ উন্মুক্ত করিলেন, তীব্র মধুর বিলাতী এসেন্সের গন্ধে কাগজখানি পূর্ণ। উপরে মটোছাপা—নিম্নে মুক্তাসদৃশ বঙ্গাক্ষরে পত্র-খানি লিখিত হইয়াছে।

"প্রিয় ডাক্তারবাবু!

আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা! কিন্তু বিপদকালে লজ্জা থাকে না। আমার বড় বিপদ্। সাত দিন হইল, কলিকাতা হইতে আমার মা আমার কাছে আসিয়াছেন। তাঁহার বড় জ্বর। অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। এ সময়ে আপনার সাহায্য না পাইলে, এ বিপদ হইতে উদ্ধারের আশা নাই। বেহারা ও পাল্কী পাঠাইলাম, দয়া করিয়া অধীনীর আবাসে পদার্পণ করিয়া চির বাধিত করিবেন।

আপনারই—

যূথিকা দাস বি-এ

মিশনারি বালিকা-বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

এবং

"স্ত্রীশিক্ষা" মাসিকপত্রিকার সম্পাদিকা।

দানীশচন্দ্র পঠিত পত্র পুনরপি পাঠ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, যে স্ত্রীলোক এমন ভাবপূর্ণ ভাষায় পত্র লেখে, তাহার হৃদয় না জানি কি গভীর প্রেমের আধার।

তিনি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাল্কীতে গিয়া আরোহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নগরোপান্তে একটি নবগঠিত সুন্দর ক্ষুদ্র অট্টালিকায় যূথিকার বাস। অট্টালিকার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র সুবিন্যস্ত কুসুমোদ্যান। উদ্যানমধ্যে জলের কৃত্রিম ক্ষুদ্র ফোয়ারা, কৃত্রিম ক্ষুদ্র পাহাড়। ক্ষুদ্র উদ্যান-বীথিকা দিয়াই বাটী-প্রবেশের পথ। পথটী লালবর্ণের ইষ্টকচূর্ণ-রচিত, দুই ধারে অরকোরিয়া, বিগ্নোলিয়ার সারি।

পাল্কী লইয়া সে পথে গমন করা যায় না, কাজেই বাহকগণ গেটের সম্মুখে পাল্কী থামাইল। দানীশচন্দ্র পাল্কী হইতে বাহির হইয়া, টুপী মাথায় দিয়া উদ্যানপথে চলিলেন। একজন বেহারা আগে আগে ছুটিয়া পথ দেখাইয়া চলিল।

অট্টালিকায় উঠিতেই খোলাদালান,—দালানের দুই পার্শ্বে দুইটী কক্ষ। কক্ষদ্বারে সুরঞ্জিত বস্ত্রের পরদা ঝুলিতেছে। তাহারই পশ্চিমদিকের কক্ষ-পর্দ্দা টানিয়া ধরিয়া বেহারা বলিল, “ডাক্তার সাহেব এসেছেন।”

ধীর-মন্থর গজেন্দ্রগমনে এক বিচিত্র-বেশা রূপসী যুবতী পর্দ্দার বাহির হইলেন।

যুবতী অনিন্দ্য, অপূর্ব্ব, অত্যুৎকৃষ্ট সুন্দরী; এ রূপ যে দেখিত, সেই মজিত। সে রূপ দেখিয়া দানীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন।

প্রথমে যূথিকাই কথা কহিল। বাঁশরীর কোমল গান্ধারের ন্যায় সে স্বর সুমিষ্ট। যূথিকা বলিল, “আপনার করুণা অসীম। এই বর্ষণাচ্ছন্ন

দিবসে আপনি যে দয়া করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট চির-ঋণী হইলাম ! মা বাড়ীর মধ্যে আছেন, চলুন।”

দানীশ হঠাৎ সে কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

যূথিকার আদেশে ভৃত্য সম্মুখের দরজা খুলিয়া ফেলিল। বাড়ীর মধ্য উন্মুক্ত হইল। সেই গৃহে একটা শয্যার উপর এক বৃদ্ধা পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—ত্রিসীমানায় কেহ নাই।

ডাক্তার, রোগিণীকে ডাক দিলেন। রোগিণী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিল, “বড় পিপাসা, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল চাহিয়া পাই নাই, একটু জল দিবে কি ? নিকটে কেহ নাই—কেহ থাকে না !”

ডাক্তার, যূথিকার মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর বলিলেন, “রোগীর কাছে সর্ব্বদা একজনের থাকা আবশ্যক।”

যূথিকা। কি করি মহাশয়, এখানে তেমন লোক মিলে না। আমার ঐ লোকটি বেহারা, আর একটি ‘কুক্’ ! কাজ অনেক—বেহারাই মধ্যে মধ্যে দেখে শোনে। আমি কিন্তু স্পর্শ করিতে ভয় পাই। মা আমার কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। কলিকাতায় বসন্ত, প্লেগ বারমাস বর্ত্তমান। নিতান্ত না হইলে বঙ্গের ম্যালেরিয়ার ভয়ও আছে—তাই আমি সাহস করিয়া মায়ের ঘরে বড় আসি না—স্পর্শও করি না। সাবধানের বিনাশ নাই, কি বলেন ডাক্তারবাবু ? আপনার মত কি ?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, “আপনি যে মত প্রকাশ করিলেন, জ্ঞানী মাত্রেরই ঐ মত। এই কারণে রোগীর শুশ্রূষার জন্য নার্শের প্রয়োজন।”

যূথিকার মাতা যন্ত্রণার স্বরে বলিলেন, “কৈ, জল কোথায় ?”

বেহারা একটু জল তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিল। ডাক্তারবাবু তখন রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, “কি দেখিলেন ?”

ডাক্তার। ভয়ের কারণ এমন কিছু নাই, ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস্।

যূথিকা। কতদিনে আরোগ্যের সম্ভাবনা।

ডাক্তার। আট দশ দিন। তবে শুশ্রূষার বন্দোবস্ত একটু ভালরূপ করিতে হইবে।

যূথিকা। আমি লোক কোথায় পাইব ডাক্তারবাবু? আপনার কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে।

ডাক্তার। আপনার ভয় নাই, আমিই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

যূথিকা। কিন্তু আপনি 'নার্শ' কোথায় পাইবেন?

ডাক্তার। সরকারী ডাক্তারখানায় কয়জন আছে, তাহাদিগকে কিছু কিছু দিলে, আসিয়া সমস্ত কাজ করিয়া দিয়া যাইবে। সে ব্যবস্থা করিয়া দিব। আমার অনুরোধে তাহারা বোধ হয় বিনা অর্থে-ই আসিতে পারে।

যূথিকা। আপনি আদর্শ-মানব।

ডাক্তার বলিলেন, "ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিই, বেহারা ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে যাক্।"

যূথিকা। ঔষধের মূল্য কত?

ডাক্তার। লাগিবে না। আমি সরকারী ডাক্তারখানায় লিখে দিচ্ছি।

যূথিকা। তবে আসুন, আমার কক্ষে যাই। সেখানে লিখিবার জিনিস সমস্তই আছে।

তখন যূথিকার সঙ্গে দানীশচন্দ্র সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন, ভৃত্য দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কক্ষাভ্যন্তর অতি সুচারুভাবে সজ্জিত। কক্ষতলে গালিচা পাতা, গালিচার উপরে একখানি মরক্কো-লেদারমণ্ডিত টেবিল। টেবিলের চারিপার্শ্বে চক্রাকারে বস্ত্র-মণ্ডিত বিবিধ ভঙ্গিমাযুক্ত কয়েকখানি চেয়ার। দেওয়ালের ধারে ধারে গ্লাসযুক্ত অনেকগুলি আলমায়রা—সকলগুলিই পূর্ণগর্ভ। গর্ভমধ্যে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পুস্তকের রাশি; দেওয়ালগাত্রে স্বর্ণবর্ণ ফ্রেমে আঁটা অনেকগুলি ছবি, ব্রাকেট, কৃত্রিম ফুলের গুচ্ছ, লতার বিতান, আর মধ্যস্থলে সেথ্‌টমাসের গোলাকার একটি ঘড়ি। টেবিলের পার্শ্বে একখানি বেঞ্চের উপর বাদ্যযন্ত্র সাজান—হারমোনিয়ম, পিয়ানো, বীণা। টেবিলের উপরে পুস্তক, পত্রিকা, দোয়াত, কলম এবং কাচের কত কারুকার্য্য-খচিত বিবিধ দ্রব্যসম্ভার। গৃহখানি সর্ব্বদাই এসেন্স গন্ধে সুবাসিত।

যূথিকা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোমল করপল্লব দ্বারা একখানি অতি মনোহর চেয়ার ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, "আপনি বসুন। বিশ্রাম করুন। অনেক কষ্ট দিলাম, ক্ষমা করবেন।"

দানীশ বিনীতস্বরে বলিলেন, "আপনি বসুন।"

তখন উভয়ে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। যূথিকা একখানি কাগজ সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এখনই লিখবেন?"

"হাঁ, এখনই লিখব"—এই কথা বলিয়াই দানীশ তখন একটা প্রেস্ক্রপ্‌শন্ লিখিয়া যথোপযুক্ত উপদেশসহ ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিলেন। ভৃত্য তাহা লইয়া প্রস্থান করিল।

দানীশ বলিলেন, "আপনার মাসিকপত্রের গ্রাহকসংখ্যা কত?"

যূথিকা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "অতি কম। একশতের অধিক নয়। তার মধ্যে দাম দিয়ে কেহই পড়ে না। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,

বাঙ্গালীর উন্নতি-আশা এখনও সুদূরপরাহত। আপনারও কি মনে তাহাই ধারণা হয় না? যে দেশে শিক্ষিতা রমণী-সম্পাদিত মাসিকপত্র প্রতি গৃহস্থের গৃহিণীর কক্ষে শোভা পায় না, সে দেশ যে এখনও ঘোর তিমিরাবৃত এবং সে জাতির উন্নতি-আশা যে সুদূর ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

দানীশ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এই ঠিক সত্য কথা।"

যূথিকা। আপনি কি কখনও আমার কাগজ পাঠ করেন নাই?

দানীশ। না, সে সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই।

যূথিকা। এখানে একখানিও কাগজ নাই যে আপনাকে দেখাইব। তবে বর্ত্তমান মাস হইতে একখানি করিয়া কাগজ আপনাকে পাঠাইব। এই দেখুন, এ মাসের কাগজের দ্বিতীয় ফর্ম্মার 'প্রুফসিট্'। লেখা অতি চমৎকার। একটু 'ম্যাটার' কম পড়িয়া গিয়াছিল—তাই তাড়াতাড়ি একটা কবিতা লিখিতেছিলাম। ভাগ্যে আপনি আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছিল; নচেৎ আপনি আসিলেও আমি উঠিতে পারিতাম না। আপনি বোধ হয়, তাহা হইলে আমার সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিতেন—কেন না, আপনি সুশিক্ষিত, কবির সম্মান বুঝেন। কবির ধ্যান ভাঙানো যে একটা ঘোর অপরাধ, তাহাও আপনি স্বীকার করিবেন। এই দেখুন না, কবিতাটী প'ড়ে দেখুন।

দানীশ। আমি নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি।

যূথিকা একখানি কাগজ টানিয়া দানীশের সম্মুখে ধরিলেন। দানীশ তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং অতি যত্নে পাঠ করিতে লাগিলেন।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কবিতাটি কেমন হইয়াছে? আপনি ভাবুক, আপনি প্রেমিক—তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি।"

দানীশ। এমন কবিতা যে বাঙলা ভাষায় হইতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না! বলিতে কি, কবিতার ভাব আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া

প্রাণের মধ্যে একটী ক্ষীণ মিলন-আশা জাগাইয়া তুলিয়াছে—এমন আকুল বাসনা বুঝি বায়রণ, বর্ণস্ও জাগাইতে পারে না।।

যূথিকা। আমার কবিতা লেখা সার্থক হইল। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি—আমি হীনা, দীনা রমণী। আপনার জন্য কি করিতে পারি? যদি অনুমতি করেন, যন্ত্রযোগে দুই একটি গান গাহিয়া আপনার কোমল চিত্ত অনুরঞ্জনের চেষ্টা করিতে পারি?

দানীশ। যদি দয়া হয় নিজ বাক্য পালন করুন।

যূথিকা হারমোনিয়ম বাহির করিয়া বেলো করিতে লাগিল। তার পরে হারমোনিয়মের সুরের সহিত নিজ মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিল—

ওগো খুঁজেছি প্রণয়ে সারা বিশ্বমাঝে
পাইনি কোথাও সাড়াটি তার।
খুঁজেছি বিষাদে বিরাগ-ভরে
খুঁজেছি প্রণয় নয়ন-জলে
খুঁজেছি হরষ মথিত-হৃদয়ে
দেখিনি কোথায় বসিত তার।
প্রভাত-সমীরে সাঁঝের গগনে
তারার হাসিতে চাঁদের বয়ানে
হৃদয়ে বাহিরে নিখিল ভুবনে
দেখিনি কেমন মুরতি তার।

অনেকক্ষণ পরে গান থামিল। কোমলকরধৃত সুবাস-ম্রক্ষিত চারু-রুমালে অনিন্দ্য-সুন্দর মুখমণ্ডল মুছিয়া রুমালখানি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া যূথিকা বলিল, "আপনাকে কি বিরক্ত করিতেছি?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দানীশ বলিলেন, "জীবনে এ আনন্দ এই প্রথম; ভরসা করি ইহাই শেষ হইবে না।"

যূথিকা বলিল, "সে কি, দয়া করিয়া মধ্যে মধ্যে আপনি কি অধীনীর আবাসে আগমন করিবেন? না আসিলে আমি বড়ই কষ্ট পাইব।"

দানীশ বলিলেন, "যদি বাধা না থাকে, প্রত্যহ একবার করিয়া আসিব।"

যূথিকা। বাধা! সে কি কথা বলিলেন? প্রকৃত বন্ধুত্বের মিলনে কোন বাধা তিষ্ঠিতে পারে না। হাঁ, আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আপনার ভিজিট কি দিতে হইবে?

দানীশ। ভিজিট! আপনি ভিজিট দিবেন? আমাকে আপনার বন্ধুমধ্যে গণ্য করিলেই আমি কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

যূথিকা মৃদু হাসিয়া এবার পিয়ানোর সঙ্গে আবার একটী গান গাহিল। গান সমাপ্ত হইলে দানীশ শত ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিদায় চাহিলেন।

যূথিকাও উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আবার কখন আসিবেন? জানিতে পারিলে, সেই সময় পাল্কী পাঠাইব। ডাক্তারবাবু, মাকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি—সে বিপদ হইতে আপনি একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা।"

দানীশ। পাল্কী পাঠাইবেন না—আমি আমার গাড়ীতেই আসিব—কল্য সকালে আবার আসিব।

যূথিকা। 'নার্শ' সম্বন্ধে যে হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন।

দানীশ বিদায় লইলেন। দালান উত্তীর্ণ হইয়া সোপানে নামিয়া একবার ফিরিয়া চাহিলেন—দেখিলেন, দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী আয়তলোচনের উদাস দৃষ্টিতে তখনও তাঁহার পানে চাহিয়া আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনেক দিন হইল যূথিকার মাতা আরোগ্য হইয়াছে। নিত্য যাতায়াতে দানীশ সমস্ত প্রাণখানি যূথিকার চরণে অর্পণ করিয়া বসিয়াছেন।

যূথিকার নিকট যতক্ষণ না যাইতে পারেন, ততক্ষণ দানীশের শান্তি নাই।

একদিন সকালে উঠিয়া চা-পানান্তে একখানি খবরের কাগজ লইয়া দানীশচন্দ্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় ভৃত্য তিনখানি পত্র আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

একখানা সরকারী পত্র। সেখানা পাঠ করিয়া অপরখানা খুলিলেন। সেখানা যূথিকা লিখিয়াছে। যূথিকা লিখিয়াছে—"পত্রপাঠ মাত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বিশেষ প্রয়োজন জানিবেন, বিকালে আসিলে আমার সহিত দেখা নাও হইতে পারে ; আমি মজঃফরপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রওনা হইব।" আর একখানা সেই সুদূর পল্লী হইতে তাঁহার স্ত্রী শান্তি লিখিয়াছে। সেখানা পাঠ করিলেন। সে বড় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা। তিনটা শব্দ কাটিয়া একটা লেখা। বর্ণাশুদ্ধি তাহার পদে পদে, পত্রখানির কর্ত্তিতাংশ বাদ দিয়া অবিকল মুদ্রিত হইল—

"শ্রীচরণকমলেষু !

তুমি আর চিঠি লেখ না কেন ? আমি পর পর তিন চারিখানি পত্র লিখিলাম, একখানিরও উত্তর পাইলাম না। আমাকে কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ ? আমাকে ভুলিতে পার, কিন্তু তোমার মাতাঠাকুরাণীকে ভুলিবে কেন ? তোমার দাদারা—তোমার ছোটভাই, তাহাদেরই বা ভুলিবে কেন ? শচীকে না দেখিয়া আছ কেমন করিয়া ? তোমার অনেক

টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে গুষ্টিশুদ্ধ না খাইয়া মারা যাইতেছি। তুমি সব টাকা খরচ করিতেছ কেন? যারা চাকরী করে তারা কি বাড়ী আসে না? মতির দাদা, হরির কাকা, শশীর বর, সবাই চাকরি করে—সবাই ত বাড়ী আসে। দিন যায়—আমি ভাবি কা'ল পত্র পাব। পিয়ন আসে, ভাবি পত্র আনিয়াছে, কাণ পাতিয়া থাকি আর পত্র দিয়া চলিয়া যায়—তার উপর যে কত রাগ হয়, তা বলিব কি প্রকারে? আমার মাথা খাও—মরা-মুখ দেখ, পত্রখানির উত্তর দিও।

এবার আশ্বিন মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় মোটে ধান হয় নি! মেজঠাকুরের কাজেও সুবিধা নেই—সংসারে বড় কষ্ট হ'চ্ছে।

শচী ভাল আছে। ছোটঠাকুরপোর একটা বিয়ে না দিলে ভাল দেখাচ্চে না—কিন্তু টাকা কোথায়? যাদের দুটো পেটের ভাতের কষ্ট, তারা বিয়ে দেয় কেমন ক'রে? সেজ-বউ বড় ঝগড়া করে—মা ভাল আছেন! কবে বাড়ী আসিবে?

সেবিকা—
শ্রীশান্তি"

পত্রখানি পাঠ করিয়া দানীশের প্রাণে কেমন যেন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার ন্যায় একটা অন্ধকার ছাইয়া পড়িল। বুঝি সেই সহাস শান্তমূর্ত্তি—সেই সুদূর পল্লীগ্রামে—নিস্তব্ধ নিবাস। মাতৃ-স্নেহ, ভ্রাতৃ-স্নেহ, ভ্রাতৃবধূদিগের ভালবাসা;—আর সর্ব্বোপরি শচীর কচিমুখ। মনে হইল—তাহারা সকলে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, আর আমি তাহাদিগকে একটি পয়সাও না পাঠাইয়া বিলাস-ব্যসনে সব নষ্ট করিতেছি। তহবিলে প্রায় দুইশত টাকা মজুদ ছিল—মনে করিলেন, সেই দিনই টাকাগুলা সব বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন।

তারপরে যূথিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তখনই গমনোদ্যত

হইলেন। ভৃত্য দ্বিচক্র যান বাহির করিয়া দিল—তিনি যথাবিধি কোট-পেণ্টুলান পরিধান করতঃ যাত্রা করিলেন।

যূথিকা তখন সজ্জিত হইয়া আপন কক্ষে বসিয়া বীণ বাজাইতেছিল। দানীশ কক্ষে প্রবেশ করিলে, বীণ নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনার আগমনে একজন পুরাতন বঙ্গীয় কবির কবিতার্দ্ধ মনে পড়িয়া গেল। কবিতাটির যথার্থ উপলব্ধি করিলাম!—'শত শত বিহঙ্গম ডাকে ঋতুবরে, কোকিল ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে'।"

দানীশ আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ডাকিলে কি না আসিয়া থাকিতে পারি!"

যূথিকা। কেন ডাক্তারবাবু, আমি আপনার কে? আমি দীনা হীনা রমণী ভিন্ন নহি। আমার আহ্বানে আপনি কেন আসেন? আমার এমন কি গুণ আছে, যাহাতে আপনার ন্যায় যশগৌরব-বিমণ্ডিত ব্যক্তি আহ্বানমাত্র উপস্থিত হয়েন?

দানীশ। কি জন্য আসি যূথিকা, আমি নিজেই জানি না; কিন্তু যে জন্য এক গ্রহ অন্য গ্রহের দিকে ধাবিত হয়, যে জন্য অণুর দিকে অণু আকৃষ্ট হয়, বুঝি সেই জন্যই আমি এখানে ছুটিয়া আসি।

যূথিকা। বুঝিলাম—আপনি বলেন, আমরা উভয়ে সমান গুণবিশিষ্ট এবং সমান ধর্ম্মী। কিন্তু তাহা নহে ডাক্তারবাবু! আকাশের চাঁদে আর মর্ত্ত্যের খদ্যোতিকায় যে প্রভেদ, আপনাতে আমাতে বোধ হয় সেইরূপ প্রভেদ। জানি না কোন গুণে আপনি আমায় দয়া করেন—ভালবাসেন! কিন্তু ডাক্তারবাবু! আমার ভয় হয়, পাছে কোনও অশুভ মুহূর্ত্তে আপনি আমায় ভুলিয়া যান। আপনার পায়ে ধরি, বিস্মৃত হইবেন না—নারী-বধ করিবেন না।

যূথিকা নয়নে রুমাল অর্পণ করিল। দানীশ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! যূথিকা, তুমি রোদন করিতেছ? আমি কি তোমায় ভুলিতে পারিব?"

যূথিকা চক্ষুর রুমাল টেবিলে রাখিয়া বলিল, "কিন্তু আমি সে জন্য কাঁদি নাই।"

দানীশ। তবে কিসের জন্য যূথিকা? আমি কি সে কথা শুনিতে পাইব না?

যূথিকা। কেন পাইবে না? তোমার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই। আমি আজ রাত্রে কলিকাতায় যাইব। সেখানে প্রায় দশ দিন অতিবাহিত হইবে—এ দশ দিন তোমাকে দেখিতে পাইব না।

দানীশ। আমিই বা এই দশ দিন তোমাকে না দেখিয়া কি প্রকারে থাকিব?

যূথিকা। কি করিব ডাক্তারবাবু! যে ঘটনার গতিরোধ করিবার সাধ্য নাই, তাহার চক্রতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে হইবে।

দানীশ। আজই যাইবে?

যূথিকা। হাঁ আজই—কিন্তু আমি অনুরোধ করি, তুমি আমার গমনের অন্ততঃ একঘণ্টা পূর্ব্বে একবার আসিয়া দেখা দিবে।

দানীশ। নিশ্চয়ই আসিব।

যূথিকা। আর একটি সামান্য কথা—হঠাৎ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে; তাই এ কথা তোমাকে বলিতে হইল! যদি তোমার কাছে টাকা থাকে, তবে আমাকে পাঁচশত টাকা ঋণদান করিতে হইবে, আমি আসিয়াই পরিশোধ করিব।

দানীশ। পাঁচশত—আজই চাই?

যূথিকা। হাঁ—দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই; কেন না—দিবাভাগেই আমি সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া ফেলিব। রাত্রি দশটার গাড়ীতে যাইব—সন্ধ্যার পর অবশ্য তুমি অধীনীর গৃহে পদার্পণ করিবে—তখন কিন্তু ঐ সকল বাজে-কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারিব না।

দানীশের তহবিলে দুইশত মুদ্রার অধিক ছিল না, কিন্তু যূথিকার

প্রার্থনা ব্যর্থ করিতে তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তিনি স্বীকার করিলেন বেলা পাঁচটার মধ্যে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

যূথিকা তাহার জন্য শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। দানীশ তখন আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ডাক্তারখানায় যাইবার সময় হইয়াছে—বিশেষতঃ তিনশত টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। বিদেশে ঋণগ্রহণের চেষ্টা তাঁহার এই প্রথম। দানীশ চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া দানীশ বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার পান্নালালকে ডাকিয়া নিভৃতে লইয়া বলিলেন, "দেখুন মহাশয়, হঠাৎ আমার পাঁচশত টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই টাকা চাই। আমার নিকটে মোটে দুইশত টাকা আছে। অবশিষ্ট তিনশত টাকা কোথায় ধার পাওয়া যায়, বলিতে পারেন?"

বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত বড়বাজারের মহাজন ভিকাজির আলাপ পরিচয় আছে না?"

দানীশ। হাঁ আছে। আমি তাঁহার বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য তিনচারি বার গিয়াছি।

বৃদ্ধ। সুদ লইয়া তিনি সাধারণকে টাকা ধার দিয়া থাকেন। বোধ হয়, আপনাকেও দিতে পারেন।

দানীশ। আপনি এখনি একবার সেখানে যান।

বৃদ্ধ আদেশ প্রতিপালন করিল। দানীশচন্দ্র তখন রোগী দেখিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ আসিয়া নিষ্ফল বারতা প্রদান না করে।

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিল। দানীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ঠিক করিয়া আসিতে পারিয়াছেন?"

বৃদ্ধ। তিনি দিতে স্বীকৃত আছেন, তবে দুইটি অসুবিধা আছে।

দানীশ। কি কি?

বৃদ্ধ। প্রথম সুদ কিছু বেশী।

দানীশ। কত।

বৃদ্ধ। ভিকাজি বলিলেন, শতকরা মাসিক তিন টাকা সুদেই আমি টাকা কর্জ্জ দিই। তবে ডাক্তারবাবু যখন লইবেন, তখন দুই টাকা সুদে দিতে পারি।

দানীশ। আর একটা।

বৃদ্ধ। আপনি তাঁহার কার্য্যালয়ে গিয়া হ্যাণ্ড্‌নোট লিখিয়া দিয়া টাকা আনিবেন।

দানীশ। আমার যখন টাকা না লইলেই চলিবে না, তখন ঐরূপেই লইতে হইবে। কখন যাইতে বলিলেন ?

বৃদ্ধ। আপনার যখন সুবিধা। এ বেলা বারটা পর্য্যন্ত কার্য্যালয় খোলা থাকে। বৈকালে তিনটার পর আবার খোলা হয়, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

দানীশ। দশটার মধ্যেই আমাদের কাজ সারা হইবে, আপনি ও আমি তখনই যাইব।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া বৃদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে চলিয়া গেল। দানীশও কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বেলা দশটা বাজিল। একখানা অশ্বযান আনাইয়া তাহাতে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডারকে তুলিয়া, দানীশচন্দ্র বড়বাজারে ভিকাজির কার্য্যালয়ে গমন করিলেন।

ভিকাজি, ডাক্তারবাবুর যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল। তারপর হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইয়া তিনশত টাকা প্রদান করিল। টাকা লইয়া দানীশচন্দ্র বাসায় ফিরিলেন।

আহারাদি-অন্তে দানীশচন্দ্র পাঁচশত মুদ্রার নোট পকেটে পূরিলেন। একবার তাঁর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। অতটা টাকা কাহাকে কিসের জন্য

দিতে যাইতেছেন! দেশে যে তাঁহার মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূগণ, ভ্রাতৃগণ অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, হয় ত কচি-ছেলে শশী দুধটুকু পাইতেছে না—কোথায় তাহাদিগকে টাকা পাঠাইবেন, তাহা না হইয়া এ কি করিতে যাইতেছেন? এ কোন্ অপরিচিতা কল্পিত-সম্বন্ধিনীকে এত টাকা দিতে যাইতেছেন? যূথিকাকে টাকা দেওয়া কিসের জন্য? সে কে? তাহার সহিত সম্বন্ধ কি? সেই নীরব মধ্যাহ্নে, জনশূন্য গৃহে দানীশের মনে ঐ তত্ত্বের উদয় হইল। এমন হয়—ইহা দেবতার অনুকূল আশীর্ব্বাদ। কিন্তু এ আশীর্ব্বাদ বিজয়-লাভে সক্ষম হয় অতি অল্পস্থলে। আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে দানবের নিষ্ঠুর ছলনা জাগিয়া বসে। তাহাতে সকল ভাসিয়া যায়। দানবের ছলনারই জয় হয়।

দানীশের তাহাই হইল। দানীশ, টাকা পকেটে পূরিয়া লইয়া দ্বিচক্র-যানারোহণে যূথিকা-ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"তুমি আসিয়াছ—আমি তোমারই কথা ভাবিতেছিলাম।" মর্ম্মভেদী বিলোল কটাক্ষে দানীশের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, যূথিকা এই কথা বলিল।

দানীশ সে কটাক্ষ-বিষ বাণাঘাত সহ্য করিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি যখন আসিতে বলিয়াছ—তখন না আসিয়া থাকিতে পারি কি?"

যূথিকা। ডাক্তারবাবু, তুমি আমায় ভালবাস?

দানীশ। ভালবাসা কি করিয়া জানাইতে হয়, আমি তাহা জানি না। যদি জানিতাম, তবে বলিতে পারিতাম—যূথিকা, আমি তোমায় কত ভালবাসি।

যূথিকা। হায়, আমি হতভাগিনী তোমার ভালবাসার প্রতিদান কিছুই দিই নাই। ডাক্তারবাবু আমায় কি তুমি অবিশ্বাসিনী মনে কর?

দানীশ। কেন যূথিকা, সে কথা কেন?

যূথিকা। প্রেমের যেখানে প্রতিদান নাই, সেইখানেই অবিশ্বাস, এ কথা মহাপ্রেমিক স্বয়ং সেক্সপিয়ার বলিয়া গিয়াছেন।

দানীশ। না, না, যূথিকা, আমি আমার নীরব-প্রেমের প্রতিদান তোমার নয়নকোণেই পাইয়া থাকি।

যূথিকা। বুঝিলাম ডাক্তারবাবু, তুমি যথার্থ প্রেমিক। তোমার মত প্রেমিক রতন বুঝি জগতে দুর্লভ!

দানীশ। যূথিকা—টাকা নাও। দশটাকা করিয়া পাঁচশত টাকার নোটের কয়টি তাড়া, যূথিকার সম্মুখে টেবিলের উপর রক্ষা করিলেন।

ঈষৎ লোলুপদৃষ্টিতে নোটগুলির উপরে বার-কয়েক চাহিয়া দেখিয়া যূথিকা বলিল, "পাঁচশত?"

দানীশ। পাঁচশতের কথাই বলিয়া দিয়াছিলে, তাহাই আনিয়াছি।

রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সেখানে অতিবাহিত করিয়া দানীশচন্দ্র বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

বাসায় আসিয়া একখানা খবরের কাগজ পাঠ করিতে গেলেন, ভাল লাগিল না। একখানা উপন্যাস পাঠ করিবার চেষ্টা করিলেন, মনঃসংযোগ হইল না। তখন শান্তির চিঠিখানার উত্তর লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন,

"তোমার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু কাজে তিলমাত্র অবসর নাই—পত্র লিখিবার সময় কোথায়? আমাকে টাকা পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছ, কিন্তু এত অল্প আয়ে একজন আমার মত ভদ্রলোকের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়াই সুকঠিন, ইহা হইতে তোমাদিগকে পাঠাইব কি? বাড়ী যাইবার জন্য লিখিয়াছ এবং যাহারা চাকরী করে অথচ বাড়ী যায়, তাহাদের তুলনা দেখাইয়াছ। তুমি জান না যে, আমার চাকরীর দায়িত্ব কত অধিক। কত লোকের জীবন মরণের ভার হস্তে লইয়া আছি। সময় পাইলে যাইবার চেষ্টা করিব।"

পত্রখানি সেই দিনই ডাকবাক্সে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে সে পত্র শাস্তির হস্তগত হইল। শান্তি পত্র পাঠ করিয়া সুখী হইতে পারিল না। সে তখনই কাগজ ভাঁজিয়া পত্র লিখিতে বসিয়া গেল। মনে কত কথা আছে, লিখিবার সময় তাহা বাহির হয় না। যাহা লিখিতে যায়, তাহাতেই ভুল হইয়া পড়ে। অনেক কষ্টে—বিপুল চেষ্টায়—প্রাণান্তিক পরিশ্রমে একখানা বৃহদাকারের কাগজ পূর্ণ করিয়া পত্র লিখিল। সে লিখিল—

"শ্রীচরণকমলেষু!

তোমার পত্র পাইলাম, ইহাতে আমার মস্ত লাভ! পত্র না পাইলে যে কতখানা মনে ওঠে তাহা লিখিয়া কি জানাইব। মনে করিয়া মাসে মাসে একখানা পত্র দিও। লিখিয়াছ—আমাদিগকে তুমি কিছুই দিতে পারিবে না, দেড়শো টাকায় তোমার মত ভদ্রলোকের বাসা খরচই চলে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে ভদ্রলোকের নিজের মাসে দেড়শো টাকা লাগে, তার বাড়ী শুদ্ধু্র কত টাকা প্রয়োজন? ভদ্রলোকের বাড়ীর লোকে কিছুই খাবে না, আর সে মাসে মাসে দেড়শো টাকা খাবে, এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? আমাদের জন্য যদি মাসে পঁচিশটে টাকা দাও, আমরা খুব সুখী হ'তে পারি। চাকরীতে যদি ছুটী না পাওয়া যায়, আর বাড়ীতে কিছু টাকা না দেওয়া যায়—তবে সে চাকরী আবার করে কে? চারুর পিসে হাতুড়ে ডাক্তার—সে বাড়ী থাকিয়া যেমন তেমন করিয়া মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে। আর তুমি কলেজের ডাক্তার তোমার কি ত্রিশটে টাকাও হবে না? যার বাড়ীর লোক ভাত অভাবে শুকিয়ে মরে তার চাকরী করা কিসের জন্য? রাগ করিও না—আমরা

বড় কষ্ট পাইতেছি বলিয়া, এত কথা লিখিলাম। বাড়ী আসিও—তোমার মা তোমার নাম করিতে কাঁদিয়া আটখানা হন! ইতি—

সেবিকা

শ্রীশান্তি”

পত্র লিখিয়া খামে আঁটিয়া শান্তি উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তথায় সেজ-বউ প্রবেশ করিল। মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, “কি লা, এই পত্র পেলি, আবার এখনই তাহার উত্তর লিখ্‌লি যে? ন-ঠাকুরপো বুঝি কোন গহনা গড়াইতে দিবে বলিয়া মাপ চাহিয়াছে—তাই তাড়াতাড়ি পাঠালি?”

শান্তি হাসিল। কিন্তু পূর্ব্বের সে হাসি আর নাই। কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার মত তাহা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। হাসিয়া শান্তি বলিল, “হ্যাঁ, একটা নূতন গহনা গড়াইতে দিয়াছেন, তাহারই মাপ পাঠাইলাম।”

সেজ-বউ। কি গহনা লা?

শান্তি। হেম কাচিতা।

সেজ-বউ। সে বুঝি নূতন গহনা?

শান্তি। দেখনি—মাঠে তাই দিয়া ধান কলাই-সরিষার গাছ কাটে।

তপ্ত-তৈলে জলের ছিটা দিবা মাত্র তাহা যেমন জ্বলিয়া উঠে, সেজ-বউ তেমনই জ্বলিয়া উঠিল। রক্তচক্ষু করিয়া বলিল, “তবে লা আবাগী—এত দেমাক্ তোর! আমাকে এত হেনস্তা! ওলো, ছাই প’ড়ে যাবে তোর তেজে লো, ছাই প’ড়ে যাবে।”

শান্তি বড় অপ্রতিভ হইল। সে বুঝিতে পারিল না, সহসা তাহার মুখ দিয়া কি কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে! কান্তের নাম করায় যে এত দোষ হয়, তাহা সে জানিলে কখনই বলিত না। কিন্তু সে তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না যে, তাহার কথিত বাক্যে সেজ-বউ এমন করিয়া

রাগ করিল কেন? উদাস করুণ-নয়নে সেজ-বউএর মুখের দিকে চাহিয়া অতীব নম্রস্বরে বলিল, "সেজ-দিদি, আমি কি বলিলাম যে, তুমি আমার উপর রাগ করিলে?"

সেজ-বউ আরও উচ্চস্বরে বলিল, "ওলো, না হয় তোর বর বিদ্বান্, না হয় রোজগেরে—আমার বর না মূর্খ, বোকা মাঠ-খাটা—কিন্তু আমরা কি কারু খাই, ছুঁই? তুই কাস্তে ধানকাটা, সরিষে-কলাইমাড়া বলিয়া আমার স্বামীকে আর আমাকে ঠাট্টা ক'র্‌বি কেন লা?"

ন-বউ ছুটিয়া গিয়া সেজ-বউয়ের পায়ে জড়াইয়া ধরিল। কাতরে বলিল, "সেজ-দিদি, আমি তা বলিনি। সেজ-ঠাকুর আমার গুরুলোক, আমি কি তাঁকে ঠাট্টা করিতে পারি? তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ক্ষমা কর।"

"অত তেজ ভাল নয় লো—তেজে আগুন লাগ্‌বে।" যথাসাধ্য উচ্চ-কণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে সেজ-বউ ন-বউয়ের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তাহার উচ্চকণ্ঠের চীৎকার-ধ্বনি আর পদতাড়নশব্দে বাড়ীর অনেকেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। ক্ষিতীশও কোথা হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড়-বউ সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেজ-বউ কি হ'য়েছে?"

সেজ-বউ। আমার আবার কি হবে। আমি হাটের হাড়িনী, মাঠের কাটকুড়ানী; যে পায়, সে আমাকে দু'পায়ে থেঁৎলায়—পোড়ারমুখো যম আমাকে দেখিতে পায় না—এত লোক মরে, আমার মরণ নেই।

বড়-বউ। হ'য়েছে কি বল্ না ভাই—তুই এক মুহূর্ত্তে একেবারে "কুরুক্ষেত্র" বাধিয়ে তুলিস্।

সেজ-বউ। আমার কপালের দোষ—আমি ঝগড়াটে, আমার স্বামী চাষা মাঠ-খাটা, ধানকাটা সরষে-কলাই মাড়া, কাজেই আমার সব তাতেই দোষ!

বড়-বউ। সে কথা কে বল্‌লে?

সেজ-বউ। বলিতে পারে যার স্বামী মাসে দেড়শো টাকা রোজগার করে। যার অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না।

বড়-বউ। কি ব'লেছে ?

সেজ-বউ। ওগো কিছু বলেনি গো, কিছু বলেনি। সব দোষ আমার।

বড়-বউ। তবে অমন ক'রে ম'র্‌ছিস্ কেন ?

ক্ষিতীশ। কি হ'যেছে—ব'ল্‌তে বুঝি মুখে আট্‌কে গেল !

সেজ-বউ। হবে আবার কি, ন-লক্ষ্মীকে আমি কেবল জিজ্ঞাসা ক'রেছি, ন-ঠাকুরপোকে এত তাড়াতাড়ি কি লিখ্‌লি ? তারই উত্তরে ঠেকারী চোকখাগী কি না বলিল—সোণার কাস্তে আন্‌তে লিখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হবে ? মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল—মাঠে ধান কাট্‌তে হবে, সরিষা কলাই কাট্‌তে হবে। আমি কি বুঝি না—কথাগুলি কাকে বলা হ'ল ?—আমার স্বামী মাঠে যায়, ধান কাটায়—ওগো আমার ইচ্ছা করে, গলায় দড়ি দিযে মরি।

ক্ষিতীশচন্দ্র অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিলেন, "এতদূর স্পর্দ্ধা ! ছোট মুখে বড় কথা ! আমি মাঠ-খাটি, তাই আমার জন্য সোণার কাস্তে পাঠাতে লিখ্‌লেন ! কথাগুলি শুনলে মড়ারও রাগ হয়। এই মাঠ-খাটার জন্যেই পেটে দিনান্তে একমুঠা 'ঘাসের বীজ' পড়ছে ! এখনও ত রোজগারের এক পয়সাও বাড়ী আসেনি।"

সেজ-বউ রোদন আরম্ভ করিলেন। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি মাঠের ধান যে, সকলে দেখিবে। কাহার নামে কবে কোথা দিয়া টাকা আসিয়া বাক্সে ওঠে, কে তার সংবাদ রাখে। ওগো, আমার মরণ হ'লেই সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। যম, তুমি আমায় ডেকে নাও। আর সহ্য করিতে পারি না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র, বড়-বউকে বলিলেন, "শোন বড়-বউ, তুমি ন-ঠাক্‌রণকে

বুঝিয়ে ব'ল, যদি মাঠ-খাটার উপরে তাঁহার এত অশ্রদ্ধা হইয়া থাকে, যেন তাঁহার চাকুরীর ভাত আমাকে না দেন—কিন্তু সাবধান! এরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া বলিলে ভাল হইবে না। আমি কারুর বাবার গোলাম নই।"

বড়-বউ। সেজ-ঠাকুরপো তুমি ক্ষেপ্‌লে না কি? ন-বউ কি তেমনি মানুষ? তোমাকে সে ঐরূপ ব'লিবে—ইহাই তুমি বিশ্বাস করিতেছ?

ক্ষিতীশ। তবে কি যত দোষ ঐ একটা মানুষের? তোমাদের এই একচোখোমির দোষেই সংসারটা যাইতে বসিয়াছে।

বড়-বউ। আমরা একচোখো নই। সেজ-বউ বড় কুন্দুলে—তিলকে তাল করিয়া তোলে।

ক্ষিতীশ। তবে সকলে মিলিয়া উহাকে কাটিয়া ফেল।

সেজ-বউ সপ্তমে উঠিলেন। চীৎকার ও ক্রন্দনের সহিত অদৃষ্টনিন্দা ভগবানের অকরুণা, বাড়ীর সকলেরই অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বিষয়ক শব্দবিন্যাসে সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন, "এখন এস, ঘরে এস; আমার আর সহ্য হয় না। আসুন এবার মেজদাদা বাড়ীতে—যে হয় একটা শেষ করিয়া যান। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।

উচ্চ স্বর নিম্নে নামাইয়া ক্রন্দন ও গর্জ্জন করিতে করিতে সেজ-বউ নিজ কক্ষে গমন করিলেন, ক্ষিতীশচন্দ্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

গৃহমধ্যে গিয়া সেজ-বউ গর্ব্বিতকণ্ঠে অথচ অভিমানের ক্রম-নিম্ন স্বরে কহিলেন, "আজ নিজের কাণে শুন্‌লে! তুমি সকল তাতেই আমার দোষ দাও।"

ক্ষিতীশ। নাও, সবই ভাল। আমি বিষম সঙ্কটেই পড়িয়াছি! একে এই সংসারের দারুণ অনটন—তার উপর তোমাদের শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। কি যে করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

সেজ-বউ। কেন, অত কথা কে সহিবে? আমাকে বলিবে তোমাকে বলিবে—কেন উহার বাপের কি কিছু ধারি, না ওর স্বামীর রোজগার খাই?

এদিকে উঠানে তখন এই কলহের সমালোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বড়-বউ শাশুড়ীকে বলিল, "হ্যাঁ মা, তুমি সেজ-ঠাকুরপোকে একটী কথাও বলিলে না?"

শাশুড়ী। কি বলিব মা—বলিবার আর আমার কিছুই নাই। ভগবান এখন আমাকে পাদপদ্মে স্থান দিলেই রক্ষা পাই। দেখে শুনে, আমার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে।

বড়-বউ। আগাগোড়া না জেনে, না শুনে কি ঐ বউএর কথা শুনে ভাদ্রবউকে অমন কটুকাটব্য বলিতে আছে! হ্যাঁ গো, সে কি সেই রকমের বউ যে, বিনা কারণে বাঘ ঘাঁটাইবে।

মেজ-বউ মুখ টিপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বিনা বাতাসে গাং নড়ে না, একটু কিছু হ'য়েছেই।"

বড়-বউ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "যখন তোর সঙ্গে বাধে, তখন বুঝি গাং নড়ানের জন্য বাতাস ডাকিয়া আনিস্? বাতাস চাই না—ওর গাং আপনি নড়িয়া থাকে।"

যাহাকে লইয়া এই ব্যাপারের উদ্ভব, সে কিন্তু গৃহকোণে বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সেজ-বউ তাহাকে গালি দিয়াছে; ঝগড়া করিয়াছে, তাহার জন্য সে কাঁদে নাই। তাহার ভাসুর যে তাহাকে দোষী ভাবিয়াছেন, তাহার উপর রাগ করিয়াছেন—এ দুঃখ রাখিবার স্থান আর নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তখন শীতকাল। যতীশচন্দ্র লাটের কিস্তির খাজনা আদায় ও সদরে দাখিল করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে অনেকগুলি টাকা আনিয়াছেন।

সন্ধ্যার পরে স্বামী-স্ত্রীতে গৃহমধ্যে কথা হইতেছিল বালক শচীশচন্দ্র উভয়ের মাঝখানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল।

মেজ-বউ বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল ছিল ত?

যতীশ। হাঁ।

মেজ-বউ। টাকা আদায় হ'ল কেমন?

যতীশ। মন্দ হয় নাই, তবে এ বছর ধান ভাল হয় নাই বলিয়া একটু যা গোলযোগ হইয়াছে।

মেজ-বউ। কত টাকা আনিয়াছ?

যতীশ। বছর বছর এ সময় যাহা আসে, তাহাই আসিয়াছে।

মেজ-বউ। কত টাকা আনিয়াছ?—বলই না কেন?

যতীশ। ছয় শত।

মেজ-বউ। খোকার জন্য কত টাকা রাখিবে?

যতীশ। তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর—তোমার বুদ্ধি মন্দ নয়। তোমার পরামর্শমত কাজ করিয়া, এই অল্পদিনের মধ্যেই দেড় হাজার টাকা জমিয়া গিয়াছে।

মেজ-বউ। পঞ্চাশ টাকা খরচের জন্য দাও—বাকী টাকা শচীর থাক্।

যতীশ। পঞ্চাশ টাকায় কি হইবে? ধান হয়নি—কিনিতে হইবে। দেনাপত্রও অনেক হইয়াছে। আবার টাকা পাইতে সেই চৈত্রমাস। দুই শত টাকা সংসার খরচের জন্য দিয়া বাকী তুমি শচীর জন্য রাখ।

মেজ-বউ। দু'—শো—ও টাকা! তাহা কিছুতেই হইবে না।

তোমাদের সংসারের এই দশা—ভগবান্ না করুন, যদি ভালমন্দ কিছু ঘটে, তা হইলে শচী ও আমি কোথায় দাঁড়াইব বল দেখি ?

যতীশ। তা' বুঝি, কিন্তু এদিকে সংসারও ত আবার চলা চাই।

মেজ-বউ। চলুক বা নাই চলুক। গুষ্টিশুদ্ধর ভাবনা ভাবিতে গেলে আর চলে না। কৈ, তোমার ন-ভাই কত দিয়েছে ? তার ত মাহিনা মাসে দেড়শো টাকা!

যতীশ। আমার বোধ হয় তাহার চরিত্র ভাল নাই। তিন চারিখানা চিঠি লিখিয়াছি—দুই একখানার উত্তর দিয়াছে মাত্র। কথাগুলা ভাসা ভাসা—পড়িলেই মনে হয়, তাহার মাথা ভাল নাই। কত আশা করিয়াছিলাম, তাহার অনেক টাকা বেতন হইল—সংসারের কত উন্নতি হইবে, কিন্তু হায়! সবই বৃথা!

মেজ-বউ। সকলে ত তোমার মত বোকা নয়! সে দেবে কেন ? টাকা জমা করিতেছে—বউয়ের গহনা গড়াইতেছে।

যতীশ। (হাসিয়া) দেখ না বউ-মার গায়ে অষ্ট-অলঙ্কার ধরিতেছে না।

মেজ-বউ। এখন গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ওরা আমাদের মত নয়—ভারি চাপা। গহনা গড়াইয়া রাখিতেছে। ন-বউকে সেখানে লইয়া গিয়া দিবে।

যতীশ। ভুল। আমার বিশ্বাস, দানীশ কু-সঙ্গে মিশিয়া অর্থগুলা নষ্ট করিতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমস্ত মাঘ মাস বাড়ী থাকিয়া ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যতীশচন্দ্র কর্ম্মস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিলেন; যেদিন তিনি বাড়ী হইতে যাইবেন, তাহার পূর্ব্বদিবস যখন মাতা ও ক্ষিতীশকে ডাকিয়া সাংসারিক কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, সেই সময়ে ক্ষিতীশ বলিল, "লাঙল রাখিয়া আর কাজ নাই; আজ দুটো বৎসর গাধার খাটুনি খাটিলাম, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অনাবৃষ্টির জন্য সমস্তই লোকসান হইল।"

যতীশ। যদি লোকসান বিবেচনা কর, লাঙল তুলিযা দিয়া জমিগুলা ফসলী বন্দোবস্ত করিয়া দাও।

মা। ভিখু অনেকদিনকার পুরাণো চাকর, তাহাকে কি জবাব দিবে?

ক্ষিতীশ। লাঙল উঠিলে ভিখুকে আর রাখিয়া কি হইবে? একটা লোকের খোরাক-পোযাক ও মাহিনা দেওয়া, এখন আমাদের পক্ষে দুর্ঘট।

যতীশ। তুমি তবে এখন কি করিবে?

ক্ষিতীশ। বিদেশে যাইয়া চাক্‌রীর চেষ্টা দেখিব। আমার শাশুড়ী ওদের লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, আপাততঃ সেখানেই যাক্।

যতীশ। কেন? তুমি যদি বিদেশে যাও, সেজ-বউমা বাপের বাড়ী কেন যাইবেন?

ক্ষিতীশ। বাড়ীর কাহারও সহিত যখন বনিবনাও হয় না, সে অবস্থায় এখানে থাকিবে কি প্রকারে?

যতীশ। সে কাহার দোষে ঘটে?

ক্ষিতীশ। যাহার দোষেই ঘটুক, ফল কথা আমাদের এখানে তিষ্ঠিবার আর উপায় নাই।

যতীশ। তুমি বাড়ী হইতে কবে যাইবে স্থির করিতেছ?

ক্ষিতীশ। এই মাসের তেরই তারিখে শাশুড়ী গাড়ী পাঠাইবেন, ওদের চোদ্দই পাঠাইয়া দিয়া, আমি মাসের শেষাশেষি যাইব।

যতীশ। শোন ভাই, আমার বিবেচনায় সেজ-বউমাকে এখন বাপের বাড়ী পাঠান যুক্তিসঙ্গত নহে।

ক্ষিতীশ। কিন্তু কি করিব, এখানে যখন কাহারও সহিত সদ্ভাব নাই, তখন এখানে রাখিয়া যাই কি প্রকারে?

যতীশ। মা যতদিন আছেন, ততদিন বিশেষ চিন্তার কারণ দেখি না।

ক্ষিতীশ। মাও সে পক্ষে বড় মনঃসংযোগ করেন না।

যতীশচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্টা মাতার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "কি করিব বাবা! আমি আর এ বৃদ্ধ-বয়সে ঐ সকল কিচিমিচি লইয়া থাকিতে পারি না। সেজ-বউমা কথা শুনিবার মানুষ নন।"

ক্ষিতীশ। তুমি ত মা, তাহার সবই দোষ দেখ। যদি তুমি তাহাকে যত্ন করিতে, একটু ভালবাসা দেখাইতে, তাহা হইলে কি এতটা হইতে পারিত?

মাতা। বাবা, আর আর সকলকে যেমন যত্ন করি, ভালবাসি, সেজ-বউমাকে তেমনই যত্ন করি, তেমনই ভালবাসি। আর যে কি করিতে হয়, তাহা জানিনা। আমার কাছে সকলেই সমান।

ক্ষিতীশ। না মা, আমি প্রতি কার্য্যেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তুমি সকলকে সমান চক্ষে দেখ না।

মাতা। বাবা, আগে পাঁচটা সন্তান হোক্, তখন জানিতে পারিবে, সকলেই সমান—সব আঙুলেই সমান ব্যথা। কেন বাবা, আমাকে অনর্থক দোষী কর?

ক্ষিতীশ। না মা, তোমাকে দোষী করি নাই, দোষ আমার অদৃষ্টের। জীবনে শান্তি কাহাকে বলে, যাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না। এখন অন্য পন্থা ধরিয়া দেখি যদি শান্তি পাই।

মাতা। ভগবান্ সকলকেই হাত-পা দিয়েছেন; নিজের ভাল পাগলেও বুঝে, যাহাতে সোয়াস্তি পাও, তা করিয়া দেখিবে বৈকি!

কর্ত্রী বুঝি কথাটা যে ভাবে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেভাবে বলা হইল না। যে প্রকারে বলিলেন, তাহাতে ক্ষিতীশচন্দ্র বুঝিয়া লইলেন, মাতা তাহাকে বিদায় দিলেন। তাহার মনে মনে বড় অভিমান হইল। যতীশচন্দ্র ভাবিলেন, এ সময়ে এমন কথা বলাটা মার ভাল হয় নাই।

মাতা কিন্তু ইহাতে কিছুই মন্দ ভাবেন নাই। সেরূপ বিবেচনা করিলে, হয় ত কথাটা অন্যভাবে বুঝাইয়া দিতেও পারিতেন। যতীশচন্দ্রও মাতার কথার প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি প্রতিবাদ করিলে, বোধ হয় ক্ষিতীশচন্দ্রের প্রাণে যে 'কালবৈশাখীর মেঘ' অনেকদিন হইতে ঘনাইয়া আসিতেছিল, সহসা তাহাতে এমন ঘোরতর ঝটিকার উদ্ভব হইত না। ক্ষিতীশচন্দ্রও সে কথার আর উত্থাপন করিলেন না। উত্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন বুঝিলেন না। তিনি স্থির বুঝিলেন, মাতাপুত্রে পরামর্শ করিয়াই আমাকে বিদায় দিলেন। ক্ষিতীশ যদি সে কথার পুনরুত্থাপন করিত বা কলহ বাধাইত, তবে বাচনিক বিবাদে আসল কথার মীমাংসা হইয়া যাইত; তাহা হইল না। ক্ষিতীশ অভিমানে আত্মহারা হইয়া উঠিয়া গেল।

তৎপরদিবস যথাসময়ে যতীশচন্দ্র কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্ষিতীশের শ্বশুরবাড়ী হইতে গাড়ী আসিলে, সেজ-বউ বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। তাহার তিন দিন পরে, অদৃষ্টান্বেষণে ক্ষিতীশচন্দ্র বাড়ী হইতে অনির্দ্দিষ্ট বিদেশে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাস যায়, তথাপি যতীশচন্দ্র বাড়ী আসিতে পারিলেন না—বা একটী পয়সা খরচ পাঠাইতে পারিলেন না।

যতীশচন্দ্র জমিদারের নায়েব—তাঁহারও আয় ভাদ্রমাস, পৌষমাস ও চৈত্রমাস। পৌষমাসে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা শচীর মাতার হস্তে প্রদান করিয়া আসিয়াছেন; চৈত্র-কিস্তিতে তিনি একটী পয়সাও পান নাই। না পাইবার কারণ তাঁহার মহলমধ্যে একটা বাঁয়োড় শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় তাহার জমি লইয়া জমিদারের সঙ্গে প্রজাগণের মনোমালিন্য ঘটে। প্রজাগণ বলে, যাহার মধ্য যে থাকের বন্দোবস্ত আছে, সে জলগর্ভস্থ শুষ্ক জমি প্রাপ্ত হইবে। জমিদার বলেন, সে থাক আমরা মানিব না। ঐ সকল জমি নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। সেই বাঁয়োড়ের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের কিছু জমি ছিল—তিনি শিক্ষিত এবং জেলায় ওকালতী করিতেন। তিনিই অপর প্রজাদিগকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, আইন-কানুন শুনাইয়া দিলেন—তারপরে দল বাঁধিয়া একদিন বহুসংখ্যক লাঙ্গল লইয়া গিয়া জমি বুনিয়া আসিলেন। সেই সূত্রে জমিদার-প্রজায় দাঙ্গা হাঙ্গামা, মামলা মোকর্দ্দমা হইল, তাহাতে জমিদারপক্ষ হারিয়া গেলেন।

অবোধ মেষশাবকগণ নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে জাগাইয়া তুলিয়া যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, কৃষক-প্রজাগণ জমিদারের সঙ্গে বিরোধ ঘটাইয়া তদ্রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু উকীলবাবু তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই; ইহা ইংরাজের রাজত্ব—মগের মুল্লুক নয়।" প্রজাগণ তাঁহার আশায় আশান্বিত হইল, কিন্তু জমিদারের লোকেরা নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। উকীলবাবু শান্তি-বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারই

পরামর্শে প্রজাগণ খাজনা বন্ধ করিয়া দিল। জমিদার-প্রজায় তুমুল বিবাদ চলিতে লাগিল। কাজেই যতীশচন্দ্রের অর্থপ্রাপ্তি ঘটিল না, অধিকন্তু মামলা মোকর্দ্দমা লইয়া তাঁহাকে এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল যে, এক দিনের জন্যও তিনি বাড়ী যাইতে পারিলেন না।

সেবার ধান হয় নাই, ক্ষিতীশ বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, যতীশচন্দ্র একটী পয়সা পাঠাইতে পারেন নাই, কাজেই সংসার একেবারে অচলপ্রায় হইয়া উঠিল। আর দিন কাটে না।।

মাতা যতীশচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে লোক পত্রের উত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিল। পাঁচকড়ি পত্র পড়িয়া মাতাকে শুনাইল।

যতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "একটি পয়সা পাঠাইবার সাধ্যও আমার নাই। কর্জ্জ করিয়া সংসার চালাইবেন। যদি ভগবান্ দিন দেন, দেনা পরিশোধ করিব।"

মাতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। মেয়ে-মানুষকে কি কেহ টাকা ধার দেয়? বিশেষতঃ একটি আধটি টাকা নহে; যতীশচন্দ্র অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সাহায্য বন্ধ রাখিবেন! এদিকে এখন সংসারের খরচ অনেক হ্রাস হইলেও, মাসিক চল্লিশ পঞ্চাশটী টাকার কমে কিছুতেই চলে না।

নিস্তার উঠান দিয়া যাইতেছিল, কর্ত্রী বলিলেন, "মেজ-বউমাকে ডাক ত।"

নিস্তার ডাকিয়া আনিল। কর্ত্রী পাঁচকড়িকে পঠিত পত্র পুনরপি পাঠ করিতে বলিলেন। পাঁচকড়ি পড়িয়া শুনাইল। মেজ-বউ বলিল, "তা' আমি কি করিব বল? যা ভাল বিবেচনা হয় কর। দেখ মা, এই সময় যদি ন-ঠাকুরপো কিছু কিছু দিতেন, তবে কি আমাদের এমন হয় গা? একা মানুষ, আর কত করিবে বল? বিশেষতঃ একটা উপস্থিত বিপদে পড়িয়াই এমনটি হইল। নতুবা শরীরের রক্ত জল করিয়া সেই মানুষই ত সব করিয়া আসিতেছিল।"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্রী কহিলেন, "হ্যাঁ মা, আমি কি আর তা জানি না। দানীশ আমার যা' করিল, তা' ভালই করিল। বড় আশা করিয়াছিলাম, দানীশ আমার মানুষ হ'ল—সকল দুঃখ দূর হবে। আমার অদৃষ্টগুণে সে আশা নিষ্ফল হইল। এখন উপায় কি, বল দেখি মা?"

মেজ। আমি তা কি বলিব? আমি কি আর তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরি?

কর্ত্রী। তুমি বৈ আর গতি নাই মা—সকলে কি না খাইয়া শুকাইয়া মরিব?

মেজ। সে কি মা, তোমার ছেলে কি কখন আমাকে দু'শো পাঁচশো দিয়াছেন যে, তাই দেবো?

কর্ত্রী। টাকা কোথায় পাবে মা—তাই দেবে। যা রোজগার করে, সংসারেই আঁটে না।

মেজ। তবে আমি কি করিব বল?

কর্ত্রী। ন-বউর দু'গাছি বালা ছিল, তা' সেদিন বাঁধা দিয়া চল্লিশ টাকা আনিয়া এই এক মাস চালাইয়াছি।

মেজ। এখন কি বলিতে চাও?

কর্ত্রী। তুমি একখানা গহনা দাও।

মেজ। আমার গহনা? গহনা ত ভারি। দু'গাছি বালা আর হার ছড়াটা—তা আমি প্রাণ থাকিতেও দিতে পারিব না।

কর্ত্রী। ন-বউমা ছেলেমানুষ; তিনি এ সংসারের কষ্ট দেখে, না চাইতেই দিলেন।

মেজ। সে দেবে না কেন—তার ভরসা আছে। তার স্বামীর মাসে দেড়শো টাকা আয়।

কর্ত্রী। ও আমার পোড়াকপাল। সে আয়ে তার কি মা? দানীশ কি কখনও তাহাকে একটী রূপার আঁকড়া দিয়াছে?

মেজ। না দিক্, ভবিষ্যতে পাবার আশা তো আছে। ক্রমেই ন-ঠাকুরপোর উন্নতি হবে—ক্রমেই মাইনে বাড়্‌বে, ক্রমেই ন-বউ সুখী হবে।

পাঁচকড়ি হাসিতে হাসিতে মেজ-বউকে বলিল, "অত কথা আমি বুঝি না। যদি দিতে হয়, ফেলে দাও। আর না দাও, ঘরের মধ্যে গিয়া কৃত্তিবাস-ঠাকুরের রামায়ণ আওড়াওগে।"

মেজ-বউ ভীষণ চটিয়া গেল, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তীব্র কণ্ঠস্বরে বলিল, "কি! আমাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। আমাকে এমনি করিয়া অপমান করা। আর এ বাড়ীতে থাকিব না—শচীকে কোলে করিয়া এখনি বাপের বাড়ী চলিয়া যাইব। যাই হোক্ এখনও ত ছোঁড়া আছে, সে আমাকে একমুঠা ভাত দিতে পারিবে। ওমা আমি কি সংসারের কোন কাজ করি না, কেবল রামায়ণ পড়িয়া দিন কাটাই।"

"ছোঁড়া" অর্থে তাঁহার একটি পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র রামসেবক, যাহার স্বামীর আয়ের উপরে সংসারস্থ জীব সকলে জীবনধারণ করে, তাঁহার এত ক্রোধ—এত অভিমান!—বাসুকী টলিয়া উঠিল। কর্ত্রী, ভীতকম্পিত করুণকণ্ঠে কহিলেন, "মা, ও পাগল তোমার কোলের ছেলে, ওর কথায় কি অত রাগ করিতে আছে?"

পাঁচকড়ির চিত্তে কিন্তু তখনও কোন গোলযোগ নাই। সে পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "রামায়ণ না পড় মহাভারত পড়গে।"

অপেক্ষাকৃত অধিকতর তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে মেজ-বউ বলিলেন, "আমাকে ঠাট্টা! আমি কি তোর ঠাট্টার যোগ্য রে পেঁচো?"

পাঁচকড়ি হাসিতে হাসিতে বলিল, "পেঁচো পোয়াতির যম! সাবধান! অত করিয়া বলিও না।"

রক্তমুখী হইয়া মেজ-বউ বলিলেন, "আমার শচীকে গালাগালি? পেঁচো পাবে বলিয়া অভিশাপ করিতেছ? তা করিবে না! বসিয়া বসিয়া

যার খাবে—আবার তারই ছেলেটার মাথা খাবে না ত কি করবে! তোমাদের ইচ্ছা, শচী মরিয়া যাক্—আর যা কিছু তোমরা নাও।"

পাঁচকড়ির সদা-প্রফুল্ল মুখ মসী-মলিন হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি শচীকে গালি দিলাম? বউ, তুমি আমাকে এমন কথা কেন বলিলে?"

মেজ। ওগো, দশে ধর্ম্মে সব শুনেছে, আর কাজ নাই। আর মায়া জানাইতে হইবে না। এখনও তবু কেহ একবেলার ভাতও দাও নাই, ইহাতেই এত বলিতেছ; যদি কখনও দাও, তবে বুঝি আর আমার মাথা রাখিবে না।

কর্ত্রী। মেজ-বউমা! ও ত এমন কিছু বলে নাই, বিনা কারণে কেন অত করিয়া বলিতেছ?

মেজ। বুঝিয়াছি গো—কয় মাস টাকা পাঠাইতে পারে নাই, তাই শচী আর আমি তোমাদের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছি! না হয়, আর আমি তোমাদের সঙ্গে একত্রে থাকিব না—যেরূপেই হউক আমি একবেলা খাইয়া দিন কাটাইতে পারিব।

কর্ত্রী। বউমা, তবে কি পাঁচকড়িকে পৃথক্ করিয়া দিবে?

মেজ। আমি কাহাকে পৃথক করিয়া দিব?—আমি তোমাদের গলগ্রহ হইয়াছি, আমিই পৃথক হইব।

দশম পরিচ্ছেদ

মেজ বউ সেখানে আর দাঁড়াইলেন না।

পাঁচকড়ি অশ্রুসিক্ত-নয়নের করুণ উদাস-দৃষ্টি মাতার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া বলিল, "কে জানে, আজ সকালে কার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিলাম। সাধে কি আমি বলি যে, সংসারে এ সকল

উৎপাতের চেয়ে, নির্জ্জন স্থান ভাল—জনহীন স্থানে গিয়া প্রাণায়াম ও মাতৃ-চরণ চিন্তা করিলে শান্তি পাওয়া যায়।”

নিস্তারিণী সেখানে দাঁড়াইয়া মেজবউএর নিরর্থক ঝগড়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেছিল এবং পাঁচকড়ির বিনা কারণে লাঞ্ছনায় ব্যথিত হইতেছিল। এতক্ষণে পাঁচকড়ির অন্য উপায় আছে জানিতে পারিয়া সমবেদনার স্বরে বলিলেন, “তা ছোটবাবু, যদি প্রাণায়াম করিয়া দু’টাকা উপার্জ্জন করিতে পার, তবে তা কর না কেন? পরের রোজগার খাইতে হইলে মুখ নাড়া সহিতে হয়। সকলেই ত আর এক রকম চাকরী করে না! প্রাণায়াম করিতে কোন্ দেশে যাইতে হয়?”

“যমের বাড়ী!” এই কথা বলিয়া পাঁচকড়ি উঠিয়া গেল। মাতা একটি প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

পাঁচকড়ি যখন প্রাঙ্গণ দিয়া চলিযা যাইতেছিল, সেই সময় “আমি কাকার কাছে যাব” বলিয়া শচী ছুটিয়া আসিল। পাঁচকড়ি, এই দুঃখের সময় সকল দুঃখ নিবারণ শচীকে বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রোড়ে তুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা হইল না। শ্যেন-পক্ষিনীর ন্যায় আসিয়া, শচীর মাতা শচীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া গেলেন, “আমি যাব” বলিয়া শচী তাঁহার ক্রোড়ের উপর কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন সেই কচি গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিয়া মেজ-বউ বলিলেন, “আর আদরে কাজ নাই। যদি মর্‌বি, আমার কোলেই মর্। যারা তোদের মরণ কামনা না করিয়া জল খায় না—তাদের কাছে আর যেতে হবে না!”

শচীকে লইয়া তিনি কক্ষমধ্যে চলিয়া গেলেন। কাকার কক্ষবিচ্যুত শচীশচন্দ্র, চপেটাঘাতে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল—রোদন চীৎকারে গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। পাঁচকড়ি তাহার পুনরাগমনের আশায় তখনও সেই স্থানে স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু মেজ-বউ যখন পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য ঝনাৎ করিয়া গৃহ-দরজা বন্ধ করিয়া

দিলেন, তখন পাঁচকড়ি ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া মাতার নিকট ফিরিয়া গেল।

ন-বউ দূর হইতে সমস্ত শুনিতেছিল। যখন মেজ-বউ, পাঁচকড়ি ও নিস্তার সকলেই সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং শাশুড়ী আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া নীরবে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন, তখন সে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "দুঃখ করিয়া কি করিবে মা, চল ও ঘরে যাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্রী কহিলেন, "দুঃখ করিব কাহার উপর মা! অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই। তবে ঐ হতভাগা ছোঁড়াটার মুখের দিকে চাহিলে বুক ফাটিয়া যায়। ওর কি গতি হইবে মা!"

মাতার চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে জল ঝরিতে লাগিল। ন-বউ তাড়াতাড়ি নিজ অঞ্চলে মৃদুস্পর্শে সে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "বালাই, উনি বেটা ছেলে, উঁহার দুঃখ কি? আমরা মেয়েমানুষ, ঘরের বাহির হইতে পারি না, কাজেই নীরবে পড়িয়া অদৃষ্ট-তাড়না সহ্য করি।"

এই সময় অতি ম্লানমুখে রুদ্ধনিশ্বাসে পাঁচকড়ি তথায় ফিরিয়া আসিল। হৃৎপিণ্ডে বিপুল বেদনা ধরিলে মানুষ যেমনভাবে বসিয়া পড়ে, পাঁচকড়ি সেইরূপভাবে বসিয়া পড়িল। ন-বউ একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

মাতা সে ভাব নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল রে?"

ধরা-গলায় ভরা-আওয়াজে পাঁচকড়ি বলিল, "কিছু হয় নাই। আমি আর এ বাড়ীতে থাকিব না!"

মা। কেন, হঠাৎ আবার কি হ'ল? কোথায় যাবি?

পাঁচকড়ি একেবারে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল, বুঝি জ্ঞান হইয়া অবধি এমন মর্ম্মান্তিক দুঃখময়স্বরে সে এই প্রথম কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মেজ-বউ আমার বুকের ভিতর হইতে আমার প্রাণের পুতুল শচীকে কাড়িয়া লইয়াছেন।"

মা। যার ছেলে সে যদি লয়, তুই কি করিবি?

পাঁচ। শচী পাগলের প্রাণের বন্ধনী—মেজ-বউ সে বাঁধন খসাইয়া লইলেন। আমি এ বাড়ীতে আর থাকিব না।

মাতাও কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অনেক রকমে কষ্ট পাইতেছি। আবার তুই যেন পলাইয়া গিয়া কষ্ট দিস্ না। যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি, সে কয়দিন সাম্‌নে থাক্। তারপর যেখানে অদৃষ্টদেবী লইয়া যাইবেন, যাস্।"

পাঁচকড়ি নীরব হইয়া কি ভাবিল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "না খাইয়া সম্মুখে থাকিব কি প্রকারে? মেজ-বউ আর আমাদিগকে খাইতে দিবেন না। যেরূপ অবস্থা, তিনি দাদাকে লিখিয়া পৃথক্ হইবেন। তখন উপায় কি হইবে?"

মা। উপায় আমার মাথা মুণ্ডু।

পাঁচ। ন-দাদা যে কি করিলেন, কিছু বুঝিতে পারা যায় না। সবাই বলে, ভিতরে কোন একটা গূঢ় ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতেই তিনি বাড়ী-ঘর ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি একটা কথা বলিতেছি।

মা। কি?

পাঁচ। কাল সকালেই আমি মজঃফরপুর যাই। সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার ব্যাপারটাও জানিয়া আসিতে পারিব—আর কিছু আনিতে পারিব।

মা। সে কথা মন্দ নয়; কিন্তু যাবি কি ক'রে? পথ খরচ ত চাই।

বড়-বউ পাড়ার মধ্যে গিয়াছিলেন, তিনি বাড়ী আসিয়া নিস্তারের নিকট সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়া, শাশুড়ীর নিকট আগমন করিলেন।

পাঁচকড়ি অর্থাভাবে মজঃফরপুর যাইতে পারিবে না, অথচ সেখানে যাইতে পারিলে এই অনটনের একটী উপায় হইতে পারে, ইহা বুঝিয়া বড়-বউ বলিলেন, "আমার একছড়া রূপার চন্দ্রহার আছে। সেই ছড়া

বিক্রয় করিয়া কিছু আমাদিগকে খোরাকীর জন্য দিয়া, অবশিষ্ট লইয়া তুমি মজঃফরপুর যাও, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই আমাদের একটা উপায় হইতে পারিবে।"

তখন সকলেরই সেই মত হইল। বড়-বউ বাক্স খুলিয়া তাঁহার চন্দ্রহার বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন। বিক্রয় করিবার জন্য পাঁচকড়ি তাহা লইয়া স্বর্ণকারের দোকানে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বেলা সাড়ে আট্টার গাড়ীতে পাঁচকড়ি মজঃফরপুর যাত্রা করিবে। পাঁচকড়ি স্নান করিয়া আসিল, কিন্তু আহারে আর বসিতে পারে না। শচী নিকটে বসিয়া না খাইলে তাহার আহারে তৃপ্তি হয় না। কাল হইতে সে শচীকে ক্রোড়ে লইতে পায় নাই।

বড়-বধূ বলিলেন, "গাড়ীর আর সময় নাই, খাবে এস।"

পাঁচকড়ি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু শচীর দর্শন পাইল না। গাড়ীরও আর সময় নাই। অগত্যা অপ্রসন্নমনে বিষণ্ণবদনে আহার করিতে বসিল।

সহসা তাহার কর্ণে শচীর কথা প্রবেশ করিল। শচী বলিতেছে, "আমি কাকার সঙ্গে ভাত খাব।"

মেজ-বউ তাহাকে কোলে করিয়া কোথায় গমন করিয়াছিলেন, এই সময় তিনি বাড়ী ফিরিলেন। শচী ছোটকাকার সঙ্গে খাইবার জন্য জেদ ধরিয়াছে, মাতাও তাহাকে লইয়া গৃহ-গমনের চেষ্টা করিতেছেন। ছেলে কোলের উপর কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে, মাতা তথাপি তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছেন না।

শচীর প্রথম স্বর শুনিয়াই পাঁচকড়ি তাহার দিকে চাহিয়াছিল, তাহার

মনে হইয়াছিল, শচী আব্দারে মাতাকে পরাস্ত করিয়া চলিয়া আসিবে ; কিন্তু মাতা যখন কিছুতেই তাহাকে ছাড়িলেন না, তখন পাঁচকড়ি অতি কাতরে বলিল, "মেজ-বউ, শচীকে ছাড়িয়া দাও, ও না বসিলে আমার যে খাওয় হয় না।"

মেজ-বউ কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার প্রাবৃটের তমসাচ্ছন্ন অম্বরের ন্যায় মুখ দেখিয়া পাঁচকড়ি চমকিয়া উঠিল। মেজ-বউ রোদনশীল শিশুকে প্রহার করিয়া অত্যন্ত বল প্রকাশে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন পাঁচকড়ি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল এবং করুণ-নয়নে বড়-বউএর দিকে চাহিল।

তিনি বলিলেন, "কি করিব দাদা, মেজ-বউএর শরীরে মানুষের রক্ত নাই। ভাত খাইয়া মা-দুর্গার নাম করিয়া, যে কাজে যাইতেছ তাই এস। বাড়ী আসিয়া আবার শচীকে কোলে লইও।"

পাঁচকড়ি আর কোন কথা বলিল না। কোন প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ অন্ন উদরস্থ করিয়া উঠিল। তারপর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিল। তদনন্তর বধূদিগের চরণে প্রণত হইয়া বার বার মেজ-বউএর গৃহপানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল—যাইবার সময় একবার শচীর মুখখানি দেখিয়া যাইতে পারিলে, বুঝি তাহার প্রাণ শীতল হইত ; কিন্তু মেজ-বউ শচীকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দিলেন না।

গাড়ীর আর সময় নাই। পাঁচকড়ি বাটীর বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল—তাহার যেন একবার কাণে যাইতেছিল—"ছোটকাকা দাঁড়াও, আমি যাব"—বলিয়া শচী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে। কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, কেহ নাই, কেবল শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া দেবদারুবৃক্ষে বাতাস বহিতেছে।

পাঁচকড়ি যখন ষ্টেশনে গেল, তখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সেখান হইতে মুখ বাহির করিয়া পথের দিকে চাহিতে লাগিল ; বুঝি তাহার মনে হইতেছিল

—শচীকে হয় ত তাহার মাতা এতক্ষণ ছাড়িয়া দিয়াছে, সে হয় ত একেলা পথে ছুটিয়াছে, পথে কত গরু-বাছুর! মা সর্ব্বমঙ্গলা—শচীকে রক্ষা করিও।

প্রবল অশ্রুধারায় তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিতেছিল।

এই সময় ভীষণ শব্দে গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া পশ্চিমদিকে ছুটিল।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রঘুনাথপুর ক্ষুদ্র পল্লী। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় সমস্ত গ্রামখানি সমাচ্ছন্ন।

একটী ছিন্ন ছত্র বগলে করিয়া, দক্ষিণহস্তে জুতাজোড়াটী লইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র এই সময় হন্ হন্ করিয়া, রঘুনাথপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ-নীরসিক্ত এবং দেহ পরিশ্রম ক্লান্ত।

রঘুনাথপুরে ক্ষিতীশের শ্বশুরালয়। গ্রামের মাঝখানে কৃষ্ণদাস ঘোষের বাড়ী। স্ত্রী, তুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া কৃষ্ণদাস অনেক দিন হইল ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত ক্ষিতীশের বিবাহ হইয়াছিল।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই একজন পরিচিত কৃষকের সহিত ক্ষিতীশের সাক্ষাৎ হইল। সে তখন তাহার বলদ তুইটীকে চরাইয়া মাঠ হইতে ফিরিতেছিল। হর্ষোৎফুল্ল-স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "জামাইবাবু, কোথা থেকে গো? বাড়ীর সব ভাল ত?"

ক্ষিতীশচন্দ্র পরিশ্রমের তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি বাড়ী হইতে আসিতেছি না। তুইমাস হইল বাড়ী-ছাড়া; অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। ও-বাড়ীর সব ভাল ত?"

কৃষক। হ্যাঁ, সব ভাল। কেবল ছোট-মাঠাকুরুণের অসুখ শুনিয়াছি।

এই কৃষকের বাস ক্ষিতীশের শ্বশুরবাড়ীর পার্শ্বে। সে ক্ষিতীশের শ্বশুরকে দাদা বলিয়া, এবং তাঁহার কন্যাদিগকে মা-ঠাকুরুণ বলিয়া ডাকিত। ছোট মা-ঠাকুরুণ অর্থে ক্ষিতীশের স্ত্রী।

ক্ষিতীশের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি অসুখ?"

কৃষক। জ্বর। জ্বরটা একটু বাড়াবাড়িই হ'য়েছে।

ক্ষিতীশ। ক'দিন হয়েছে?

কৃষক। বার চৌদ্দ দিন হবে। কালী-ডাক্তার দেখ্‌ছে। দুপুর-বেলা মাঠ থেকে গিয়ে শুন্‌ছিলাম, আজ একটু বেড়েছে! তা' ভয় নাই— সেরে যাবে।

গৃহে অগ্নি লাগিয়া ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গৃহমধ্যে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি তখন একদিকে অগ্নিদাহ অল্প দেখিয়া বাহির হইবে বলিয়া ছুটিতেছে, এমন সময় যদি সেদিকেও লহ-লহ অগ্নি-শিখা দেখা দেয়, তবে তাহার প্রাণে যে ভাব উপস্থিত হয়, ক্ষিতীশের প্রাণেও সেই ভাব সমুপস্থিত।

বাটী হইতে বাহির হইয়া দুই মাস কাল কত স্থানে ঘুরিয়াছে, কত জনের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছে—কত লোককে তোষামোদ করিয়াছে, কিন্তু সামান্য একটু চাকুরীর সুবিধা কোথাও করিতে পারে নাই! মাসিক দশটী মুদ্রা বেতন দিয়াও কে হার জ্বলন্ত প্রাণে শান্তি ঢালিতে স্বীকৃত হয় নাই।

ক্ষিতীশ স্পন্দিতবক্ষে শুষ্কমুখে শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইলেন। গৃহের দাবায় জুতাজোড়াটি ফেলিয়া, কক্ষের ছাতাটি দেওয়ালগাত্রে হেলাইয়া রাখিয়া ডাকিলেন, "ঘোষ-মহাশয়, বাড়ী আছ না কি?"

ঘোষ-মহাশয় অর্থে তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক হরিচরণ ঘোষ। হরিচরণ সম্বন্ধে এবং বয়সে তাঁহার বড়।

হরিচরণ বাড়ী ছিলেন না। রন্ধন গৃহ হইতে রমণীকণ্ঠে জিজ্ঞাসিত হইল, "কে গা? দাদা বাড়ী নাই, ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন।"

"আমি ক্ষিতীশ"—ক্ষিতীশ দাঁড়াইয়া ছিল, এই কথা বলিয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল।

যে কথা কহিয়াছিল, সে ক্ষিতীশের মধ্যমা শ্যালিকা। নাম বিরাজ-মোহিনী।

বিরাজমোহিনী ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "কে রায়-মহাশয়? আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। শিবুর বড় ব্যারাম।"

ক্ষিতীশ। আসিয়াছি—না আসিলে এ যাতনা-ভোগটা বাকী থাকিয়া যাইত যে!

বিরাজমোহিনী সে কথার অর্থ গ্রহণ করিল না; সে বাহির হইয়া আসিয়া গৃহমধ্য হইতে একখানা আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, এবং তাহার দাদার ছোট-মেয়ে বুড়ীকে একঘটি জল আনিয়া দিতে বলিল।

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?"

বিরাজ। শিবুর কাছে, পশ্চিমের ঘরে।

ক্ষিতীশ। ব্যারাম কি বড় শক্ত?

বিরাজ। হ্যাঁ,—আজ বড়ই বাড়িয়াছে! ভুল বকিতেছে—চোখ লাল হইয়াছে। দত্তখুড়া হাত দেখিয়া বলিলেন, নাড়ীর অবস্থাও না কি খারাপ। রাত্রি দুই প্রহরের সময় জ্বর কম হয়—সেই কমের সময়ে আশঙ্কার কথা। তাই শুনিয়া দাদা ডাক্তারের কাছে গিয়াছেন।

উত্তপ্ত শ্বাস বক্ষে চাপিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন—আমাকে বুঝি সকল জ্বালার হস্ত হইতে অব্যাহত দিবার জন্য সেজ-বউ স্বর্গগমন করিবে! যাহার একটী পয়সা সংস্থান নাই, যে সারা বিশ্বে একটী পয়সা উপার্জ্জন করিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না, তাহার পক্ষে এ মরণ মঙ্গলের হেতু! ক্ষিতীশের দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। বিরাজমোহিনীকে গোপন করিয়া কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, "চল, একবার দেখিয়া আসি।"

বিরাজমোহিনী, ক্ষিতীশকে সঙ্গে লইয়া, যে গৃহে সেজ-বউ রোগ-শয্যায় পড়িয়া ভুল বকিতেছিল, তথায় প্রবেশ করিল।

গৃহতলে শয্যার উপরে চৈতন্যবিরহিতা শিবমোহিনী, রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। শিরোদেশে মৃন্ময় প্রদীপ জ্বলিতেছিল। শিবমোহিনীর

মাতা পার্শ্বে বসিয়া আছেন—সমস্ত গৃহখানি যুড়িয়া যেন মৃত্যুগন্ধী বায়ু স্তব্ধ হইয়া আছে। পাড়ার তনুর মা আর শ্যামের খুড়ী দূরে দেওয়াল হেলান দিয়া নিস্তব্ধে বসিয়া আছেন।

বিরাজমোহিনী বলিল, "মা, রায়-মহাশয় এসেছেন।" পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া,মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "মা,আমার একদিনও সুখী হইতে পারেন নি। এমন জামাইয়ের হাতে দিয়েছিলাম যে একটী রূপার আঁকড়া দিয়াও শুধায় নি। সংসারের জ্বালায়—শাশুড়ী-জায়ের বিষ-কথায় মার শরীর আমার জর-জর। অভিমানিনী মা আমার অভিমানেই প্রাণত্যাগ করিলেন।"

তনুর মা বড় পাকা গিন্নী। তিনি বলিলেন, "নে বউ জামাইটে কোন্ দেশ থেকে ছুটতে ছুটতে এল, এখনও গায়ের ঘাম শুকায়নি—এখনও পায়ের ধূলো ধোয়া হয়নি—এদিকে তার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়—আর তুই এখন ধর্লি, তোর মেয়েকে এমন জামাইএর হাতে দিয়েছিস্ যে, সে গহনা দেয়নি! ব'স বাবা ব'স—ভয় কি, ব্যারাম হয়েছে, সেরে যাবে।"

ক্ষিতীশ কোন কথাই কর্ণে তুলিলেন না। তিনি হাত দেখিতে জানিতেন। রোগীর পার্শ্বে গিয়া হস্ত টিপিয়া দেখিলেন—দুবার তিনবার করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "না, আজই প্রাণের আশঙ্কা নাই। নাড়ীর অবস্থা মন্দ নহে, সুচিকিৎসা হইলে বাঁচিবার আশা করা যায়। মাথায় কতকগুলো রক্ত উঠিয়াছে—সেই জন্যই এত ভুল বকিতেছে।"

তনুর মা বলিলেন, "সে কথা আমি আজ তিন চারি দিন ধরিয়া বলিতেছি। মানপুরের কেলে নাপিত, সে আবার চিকিৎসা করিতে জানে? চতুরপুরের দেবু ডাক্তারকে আন্লে কোন্ কালে রোগ সেরে যেত।"

ভ্রূকুটি করিয়া সেজ-বউয়ের মা বলিলেন, "ওগো, সব টাকার কাজ।

হরি আমার পায়ে কত, একবার ভাতকাপড় দিয়া পুষিতে হবে, আবার ডাক্তারের টাকা কোথায় মিলে। কালীকে সামান্য কিছু দিলেই ওষুদ দেয়, তাই তাকেই দেখান হ'চ্চে। এখন এলেন, আজ যদি বাঁচে, কাল দেবু ডাক্তারকে আনুন।"

তনুর মা বলিলেন, "তা আনবেন বৈ কি! যাও বাবা, এখন তুমি হাত-মুখ ধোওগে। ভয় কি—ব্যারাম মানুষের হইয়া থাকে, সারিয়াও যায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় ছয়দণ্ডের সময় হরিচরণ, কালী-ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া বাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কোথা হইতে? তুমি যে বহরমপুরের ঐ দিকে গিয়েছিলে?"

বিষাদক্লিষ্ট-স্বরে ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন, "শুধু বহরমপুর! কলিকাতা, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, আসাম, না গিয়াছি—কোথায়?"

হরি। কি জন্য গিয়াছিলে?

ক্ষিতীশ। চাকুরীর জন্য।

হরি। জুটিল?

ক্ষিতীশ। না।

হরিচরণ, ক্ষিতীশের সহিত কালী-ডাক্তারের পরিচয় করাইয়া দিলে, তিনি বলিলেন, "রায়-মহাশয় রোগীকে দেখিয়াছেন কি?"

ক্ষিতীশ। হাঁ দেখিয়াছি। তবে আমরা ত আর তেমন বুঝি না! তুমি দেখ।

কালী-ডাক্তার জাতিতে নাপিত। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয়ভাগের কয়েক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি, বৎসরকাল দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন দিয়া কয়েকটী রোগী আরোগ্য করিয়া হঠাৎ ডাক্তার হইয়া পড়েন। এখন তাঁহার পসার বেশ!—নিকটবর্ত্তী ডাক্তারদের নিকট হইতে দুই চারিটা ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া, যদুবাবুর সরল জ্বর-চিকিৎসা দেখিয়া ঔষধ দিয়া একজন নামজাদা ডাক্তার হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রোগ চিনিতে পারেন না—ঔষধ নির্ব্বাচনও হয় না। অধিকন্তু ঔষধের নাম পড়িতে বা বলিতে হইলেই বিষম গোলযোগ বাধিয়া উঠে।

কালী-ডাক্তার, হরিচরণের সহিত গর্ব্বিত-পদক্ষেপে রোগীর গৃহে গমন করিলেন। হাত টিপিয়া চোখমুখ দেখিয়া সরিয়া আসিলেন।

অপরাধীর ন্যায় ক্ষিতীশও তাঁহাদেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখলে?"

মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের বিকাশ ও অভিজ্ঞতার জ্যোতিঃ ফুটাইতে চেষ্টা করিযা কালী-ডাক্তার বলিলেন, "কৃমি-উব্বান।"

এত দুঃখেও হাসি আসিল। মুখের হাসি মুখে চাপিয়া ক্ষিতীশ বলিল, "নাড়ীর অবস্থা কি প্রকার?"

কালী। উব্বান-বিগারে যেমন হয়।

ক্ষিতীশ। আমি তাহা বলিতেছি না—বাঁচিবে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি!

কালী। আমি ত আর ভীষ্মদেব নই যে তা বলিব।

ক্ষিতীশ। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে। তুমি কি সে প্রকার বুঝিতেছ?

কালী। কোন শালা তা ব'লতে পারে না। আমি এ নাগাৎ কত ডাক্তার দেখ্‌ছি—কৈ, কারু ত তেমন ক্ষমতা দেখিনি।

ক্ষিতীশ। যদি তেমন হয়, তবে কি করিতে হইবে? তুমি রাগ

করিও না, কালীবাবু! চিকিৎসককে এ সব বিষয় রোগীর আত্মীয়গণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাহারা ত আর নিজে এ সকলের মীমাংসা করিতে পারে না।

কালী। না, আমি রাগ্‌বো কেন। আপনি আমায় পরীক্ষা কচ্চেন, তা করুন! কত বেটা আমাকে ঘাঁটিয়ে দেখেছে।

ক্ষিতীশ। যদি নাড়ী ছাড়ার উপক্রম হয়, তবে কি ঔষধ দেবে?

কালী। কেন—ব্রাণ্টেকের নম্বর, কাডেমেকো স্প্রীট্, কলেরা ইতর; এই কয় পদ অসুদ দিলেই ঠিক হবে! যে রোগী মরিতেছে—এ অসুদের জোরে সেও একবার কথা কহিয়া যায়।

ক্ষিতীশচন্দ্র দানীশের চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক লইয়া মধ্যে মধ্যে পাঠাদি করিতেন। ঔষধগুলির নাম যদিও কালী-ডাক্তার কিছুমাত্র উচ্চারণ করিতে পারিল না, তথাপি যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিল, এই ঔষধগুলি বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত মন্দ হইবে না! বলিলেন, "যদি উহা ব্যবস্থা হয়, তবে দাও!"

একখানা গামোছায় জড়ান ছোট ছোট গুটীচারেক শিশি ছিল, গামোছা টানিয়া শিশি খুলিয়া বাহির করিয়া ডাক্তার বলিল, "একটা শিশি আর একটু জল দাও।"

তখনই তাহা প্রদত্ত হইল। কালী-ডাক্তার তখন লেবেলহীন সেই শিশিগু'ল হইতে কোন ঔষধ এক ফোঁটা, কোন ঔষধ দুই ফোঁটা ঢালিয়া দিল এবং খানিক জল দিয়া শিশিটা বার দুই ঝাঁকিয়া বলিল, "এই ঔষধ তিন ঘণ্টা অন্তর ছয়বার খাইয়ে দিবে।"

ঔষধের অবস্থা দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্রের মন নিতান্ত বিচলিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এত বড় রোগ বিনা চিকিৎসা বা কু-চিকিৎসায় রহিয়াছে! কিন্তু কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। গৃহ হইতে বাহির হইয়া দাবায় গিয়া উপবেশন করিলেন।

কালী-ডাক্তার তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া, একটা আলো ও লোক লইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষিতীশ, হাত-মুখ ধুইয়া আর একবার গিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন জ্বর কম হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নাড়ীর অবস্থা পূর্ব্ববৎই আছে। কাজেই ভরসা জন্মিল যে, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না।

যথাসময়ে আহার প্রস্তুত হইলে, হরিচরণের সহিত ক্ষিতীশও ভোজন করিতে গেলেন। ভোজনে তাঁহার কিছুমাত্র রুচি ছিল না—তবে দিবা-ভাগে আহার হয় নাই বলিয়া বসিলেন মাত্র, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিল না।

ভোজনান্তে রোগীর নিকট পুনরপি গমন করিলেন। হাত টিপিয়া নাড়ী দেখিলেন, নাড়ীর অবস্থা মন্দ নহে—জ্বর আরও কম।

বিরাজমোহিনী বলিল, "রায়-মহাশয়, তুমি এত ঘন ঘন ঘরের মধ্যে আসিলে, মা বসিতে পারেন না। তুমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া শোও, প্রয়োজন হইলে ডাকিব।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষিতীশচন্দ্র বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। একখানা তিনদিকে মাটীর দেওয়াল-বেষ্টিত গৃহ। গৃহমধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবা সধূম আলোক দান করিতেছিল এবং বাতাসে পড়িয়া কাঁপিতেছিল। মধ্যস্থলে একটা মাদুরের উপরে একটা ময়লা বালিশ। পার্শ্বে আর একটা বিছানা, তদুপরি বাড়ীর কৃষাণ রতিকান্ত শয়ন করিয়া আছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র বুঝিলেন, শূন্য শয্যা তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছে। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

রতিকান্ত গা মোড়া দিয়া ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি কি তামাক খাবা?"

ক্ষিতীশ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখানে কি হুঁকা আছে?"

রতিকান্ত উঠিয়া পড়িল; দাবার কোণ হইতে একটা খেলো হুঁকা

টানিয়া আনিল, বলিল, "আছে আমার মনিব এই হুঁকাতে মাঠে গিয়া তামাক খান।"

তারপর সে তাহার নিজের হুঁকার মস্তক হইতে কলিকা নামাইয়া লইয়া তাহাতে তামাক সাজিল। তৎপরে অপর হুঁকার মস্তকে কলিকা স্থাপন করিয়া, ক্ষিতীশের হস্তে প্রদান করিল ক্ষিতীশ বসিয়া ধূমপান করিলেন। তার পরে হুঁকা রাখিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

রতিকান্ত তখন গল্পারম্ভ করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন কোন চাক্‌রী টাক্‌রী কর না ক

ক্ষিতীশ। না, চাক্‌রী নাই তবে চেষ্টায় আছি।

রতি। আপনাদের চাক্‌রী না থাক্‌লে তত সুবিদে থাকে না। সেদিন আমাদের মা-ঠাকরুণ ঐ কথা বল্‌ছিলেন।

ক্ষিতীশ। কি বল্‌ছিলেন ?

রতি। ছোট মেয়েটার গহনাপত্তর নেই, তাই আপ্‌শোস্ কোরে বোল্‌ছিলেন, হাবাতের ছেলের হাতে মেয়েডা দিয়ে কান্‌তি কান্‌তি জান গেল।

ক্ষিতীশ সে কথার কোন উত্তর করিল না। রতিকান্ত তখন বুঝিল কথাটা জামাইবাবুর প্রীতিপদ হয় নাই। সে তখন অন্য কথা তুলিল। বলিল, "মেয়েডার জ্বর বড় বেয়াড়া হয়েছে। তা কালী-ডাক্তার ওর কি ক'রবে ? আমার বোধ হয় মেয়েডার উপরিদৃষ্টি হ'য়েছে। নইলে অত ভূতোসন্নি ব'ক্‌বে কেন ? মাদারে ফকির ওসব বিষয়ে ভারি ওস্তাদ্;— ঘাটে নেমে আঘাট থেকে এক নিশ্বাসে এক ঘড়া জল আন্‌তে হয়। তাই পোড়ে দেয়—একদিনেই রোগী আরাম হোয়ে যায়।

ক্ষিতীশচন্দ্র সে কথারও কোন উত্তর করিলেন না। রতিকান্ত ভাবিল, তবে জামাইবাবুর ঘুম আসিতেছে, অগত্যা সেও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল এবং

অচিরাৎ নিদ্রাগত হইয়া নাসিকা গর্জ্জনে চণ্ডিমণ্ডপখানা মুখরিত করিতে লাগিল।

ক্ষিতীশের নিদ্রা নাই। চিন্তাদগ্ধ প্রাণে অনেকক্ষণ শয্যায় পড়িয়া থাকিল। তৎপরে চণ্ডিমণ্ডপের দাবায় গিয়া উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণে থাকিয়া, বাড়ীর মধ্যে কোন গোলযোগ হইতেছে কি না শ্রবণ করিল। যখন বুঝিল, সেখানে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিতেছে, তখন একটা খুঁটীতে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া করুণ-নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সহসা সে শুনিতে পাইল, সেজ-বউ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। দ্রুতপদে বাটির মধ্যে যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—সম্মুখের দরজা বন্ধ। তখন চীৎকার করিয়া শ্যালককে ডাকিল। অনেক ডাকাডাকির পরে তিনি সাড়া দিলেন।

অতি বিনীতস্বরে বিপন্ন ক্ষিতীশ বলিলেন, "তোমার ভগিনী বড় চেঁচাইতেছে,—সম্ভবতঃ ভুলই বকিতেছে। একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।"

তিনি তখন শয্যায়। বলিলেন, "রোজ রাত্রিতেই অমনি চেঁচায়, মা ওখানে আছেন, ভয় নাই। তুমি শোওগে।"

অতি ক্ষুণ্ণপ্রাণে ক্ষিতীশচন্দ্র শয্যায় ফিরিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষরাত্রে ক্ষিতীশের একটু নিদ্রা আসিয়াছিল—কিন্তু সে অতি অল্প-ক্ষণের জন্য, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল! নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃৎপিণ্ড দ্রুততরভাবে কম্পিত হইতে লাগিল। দেহ মন নিতান্ত অবসন্ন! তখনও বাড়ীর কেহ উঠে নাই। অধিক রাত্রি জাগরণের অবসাদে সকলেই নিদ্রিত! রোগীও তখন একটু স্থির হইয়াছিল।

ক্ষিতীশ উঠিয়া রতিকান্তকে জাগাইলেন। সে উঠিয়া চক্ষু কচলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি তামুক খাবে গা?"

ক্ষিতীশ। না, আমি একটি কথা বলিব বলিয়া ডাকিতেছি। গ্রামান্তরে যাইব—ফিরিতে যদি বেলা হয়, হরিবাবুকে বলিও, আমি দেবেন্দ্র-ডাক্তারের নিকটে গিয়াছি!

রতি। আচ্ছা, তা ব'লব। আহা সোয়ামী না হলে কি কারু পরাণ কচ্ কচ্ করে গা! তা যাও বাবু—দেবেন-ডাক্তার ভারি ডাক্তার! সে মরা মানুষ বাঁচায় গো!

রাত্রিতে যদি অত্যন্ত বাতাসে শীত করে, এই জন্য শয়ন করিবার সময় চাদরখানি লইয়া আসিয়াছিলেন—জুতো জামা ও ছাতা বাটীর মধ্যেই ছিল সুতরাং তাহা লইবার জন্য বাড়ীর লোকদিগকে ডাকিয়া বিরক্তিভাজন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, ক্ষিতীশচন্দ্র চাদরখানি স্কন্ধে করিয়া নগ্ন-পদেই বাহির হইলেন। রঘুনাথপুর হইতে দেবেন্দ্র-ডাক্তারের বাড়ী প্রায় দুই ক্রোশ হইবে—বেলা করিয়া গেলে যদি তাঁহার সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়।

তখন কেবল উষালোক প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রামের বাহির হইয়া কুমারী নদীর তীরে তীরে পথ—সেই পথ ধরিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র যাইতে লাগিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস—নদীতে সামান্য জল—আর দুই পার্শ্বে বিস্তৃত বালির চর। মধ্যে একগাছি রজতসূত্রের ন্যায় ক্ষীণাঙ্গী কুমারী বহিয়া গিয়াছে। অপর পার হইতে শিশির-শীকরসিক্ত উষানিল নৈশফুল্ল বন-কুসুমের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। ক্ষিতীশের হৃদয় বিষাদ কম্পিত। তিনি যেন জগতের কাছে বিশাল অপরাধে অপরাধী!

যখন জগতে রৌদ্র ফুটিয়া উঠিল, তখন ক্ষিতীশ দেবেন-ডাক্তারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারখানায় গিয়া শুনিলেন, ডাক্তারবাবু তখনও বাটীর মধ্যে আছেন, শীঘ্রই আসিবেন। ক্ষিতীশ তখন বাহিরের একখানা বেঞ্চির উপরে বসিয়া, আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিতে

দেখিতে অনেকগুলি লোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কেহ রুগ্ন-পুত্র ক্রোড়ে করিয়া, কেহ বালিকা-কন্যার গায়ে তাহার মাতার অলঙ্কার পরাইয়া লইয়া, কেহ শুধু একটা শিশি হাতে করিয়া, কেহ নিজের রোগ-জীর্ণ দেহভার যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া জুটিল।

আরও কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন। তিনি আসিবামাত্র ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকা প্রদান করিল। চারিদণ্ড ধরিয়া হুঁকা টানিয়া টানিয়া শেষে পরিচিত রোগিগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগ পরীক্ষা করিলেন—ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বিদায় দিলেন। তারপর নবাগত রোগীদিগের রোগ শুনিয়া হাত টিপিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। তাহারাও চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, ক্ষিতীশ উঠিয়া তাঁর নিকটস্থ হইয়া অতি বিনীতস্বরে বলিলেন, "আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। বড় বিপদে পড়িয়াই আসিয়াছি। আপনি দয়া না করিলে আমার উপায় নাই।"

ডাক্তার। কি, বলুন।

ক্ষিতীশ। আমি বাড়ী হইতে প্রায় দু'মাস বাহির হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, গতকল্য সন্ধ্যার সময়ে রঘুনাথপুরে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রীর ভারী ব্যারাম।

ডাক্তার। কি ব্যারাম?

ক্ষিতীশ। জ্বর—সম্ভবতঃ জ্বর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার প্রায় ছাড়িয়া যায়। কিন্তু মাথায় রক্ত আছে—ভুল বকে। অন্যান্য উপসর্গও আছে।

ডাক্তার। কেহ চিকিৎসা করিতেছে?

ক্ষিতীশ। সে কু-চিকিৎসার চেয়ে অচিকিৎসা ভাল কালী-ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছে।

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তার পর?"

ক্ষিতীশ। এখন সম্পূর্ণ দয়ার ভিখারী হয়ে আপনার দুয়ারে এসেছি।

ডাক্তার। আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ক্ষিতীশ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি রিক্তহস্তে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছি; আমি দরিদ্র, স্ত্রীর গায়ে কোন অলঙ্কার নাই যে তদ্দারা অর্থ সংগ্রহ করিব, চিকিৎসা না হইলেও সে বাঁচিবে না! অতএব আপনি দীনের প্রতি দয়া করুন। রঘুনাথপুরে আপনাকে যাইতে হইবে—কেবল এক দিন নহে, যে কয়দিন রোগ না সারে—আর ঔষধও দিতে হইবে। আমি আগামী কল্য টাকার যোগাড় দেখিব—কিন্তু কোথায় যাইব—তাহারও স্থিরতা নাই! দরিদ্রের নিকট যাহা গ্রহণ করেন—তাহা আমি নিশ্চয় দিব—তবে গুছাইয়া লইতে হইবে। দরিদ্রের জীবন ও শান্তিদান করিলে ভগবান্ আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন।

ডাক্তারবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথপুরে আপনার শ্বশুর কে?"

ক্ষিতীশচন্দ্র করুণ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "আমার শ্বশুর জীবিত নাই, শ্যালকের নাম হরিচরণ ঘোষ।"

ডাক্তার। কেন, তাঁহার ত অবস্থা মন্দ নয়! তাঁর ভগিনীর ব্যারাম, তাঁর বাড়ীতে ব্যারাম—ডাক্তারের খরচ তিনি কেন দিবেন না?

ক্ষিতীশ। ডাক্তারবাবু, আমার যদি অবস্থা ভাল হইত—আমার যদি টাকা থাকিত, তবে আমার স্ত্রীর ব্যারামে আমার শ্যালক অর্থ-ব্যয় করিতেন। যাহার অর্থ নাই, তাহার জন্য কেহই মুষ্টিদানে স্বীকৃত হয় না।

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল! ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি যাইব, ঔষধ দিব—আপনি ক্রমে ক্রমে আমায় টাকা দিবেন।"

যে জল ক্ষিতীশের চক্ষুতে গড়াইতেছিল, তাহা ধারাকারে প্রবাহিত হইল। গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিলেন, "আপনার জয় হউক। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

ডাক্তার। আমি আপনার খরচ বাঁচাইবার জন্য সাইকেলে যাইব, কিন্তু ঔষধের বাক্স কে লইয়া যাইবে ?

ক্ষিতীশ। আমি লইয়া যাইব।

দন্তে জিহ্বা কাটিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আপনি ভদ্রলোক।"

ক্ষিতীশ। ডাক্তারবাবু, যাহার টাকা নাই, সে আবার ভদ্রলোক কিসের ? না লইয়া গেলে আমার স্ত্রী মারা যাইবে।

ডাক্তার। এক কাজ করুন—আজ একটা লোকে লইয়া চলুক, তাহাকে চারি আনা পয়সা দিবেন। কাল হইতে আপনি শিশি লইয়া আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইবেন।

ক্ষিতীশের নিকট মোট আট আনার পয়সা ছিল। তিনি ডাক্তারবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তবে আপনি যান, আমি গাড়ীতে যাইব, একটু পরে আসিতেছি। লোকটাকে আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান।"

ঔষধ-বাহককে সঙ্গে লইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র একটু উৎসাহিত চিত্তে গমন করিলেন।

যাইবার সময় বাজার হইতে চৌদ্দ পয়সা দিয়া একটা বেদানা ক্রয় করিয়া লইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্র-ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, "কোন ভয় নাই। চিকিৎসা হইলে রোগ এত বাড়িত না। কালীর চিকিৎসা-গুণেই রোগী এত কষ্ট পাইয়াছে।"

তিনি ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। তনুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার চলিয়া গেলে বলিলেন, "আহা ক্ষিতীশের পয়সা নাই, তবু প্রাণের টানে ডাক্তার আনিয়াছে। হাজার হউক স্বামী!"

ক্ষিতীশের শাশুড়ীর নিকট সে কথা অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল। তিনি মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "কি করিব ঠাকুরঝি, আমার যেমন ক্ষমতা, তেমনি ডাক্তার দেখাইয়াছি—এখন উহার বস্ত উনি দেখান।"

তনুর মা। আহা, যেমন করিয়াই পারুক, তা দেখাবে বই কি। একটী বেদানাও কিনিয়া আনিয়াছে!

শাশুড়ী। দিবার ত সম্পর্ক—মা-ভাইতে আর কার কুলায় বল? তবে যেমন অদৃষ্ট করিয়াছিলাম—তেমন জামাই পাইয়াছি।

তনুর মা। জামাই আর মন্দ কি বউ! তবে স্বচ্ছল অবস্থা সকলের সকল সময় থাকে না।

এই সময়ে বাহিরের প্রাঙ্গণ হইতে ক্ষিতীশ ডাকিয়া বলিলেন, "মা, ঠাকুরঝি কোথায়? আমার জামা,জুতো ও ছাতাটা কোথায় আছে নেব!"

তনুর মা। কেন গো, এখন তা কি হবে?

ক্ষিতীশ। একটু গ্রামান্তরে যাইব।

তনুর মা। এত বেলায়? খাওয়া দাওয়া করিয়া যাইও।

ক্ষিতীশ। না, আবার বৈকালে ফিরিতে হইবে। সে প্রায় তিন ক্রোশ পথ।

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী বলিলেন, "যদি নিতান্ত প্রয়োজন থাকে, তবে ঘুরিয়া আসুন। ঐ মাঝের ঘরে বিরাজ আছে।"

ক্ষিতীশচন্দ্র 'মাঝের ঘরে' গমন করিলেন এবং সেই ঘরেই তাঁহার দ্রব্যগুলি ছিল, বিরাজ তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এখন ওসব কেন?"

ক্ষিতীশ। আমি নন্দনগ্রামে যাইব।

বিরাজ। এত বেলায় যাইবে কেন? আহারাদি করিয়া যাইও।

ক্ষিতীশ। যাহার অর্থ নাই ঠাকুরঝি—তাহার খাওয়া দাওয়ার কি সময় অসময় আছে? সেইখানে গিয়াই সে কাজ সারিব।

বিরাজ। এত তাড়াতাড়ি সেখানে যাবে কেন?

ক্ষিতীশ। ডাক্তারকে এক পয়সাও দিই নাই। তাহাকে কিছু না দিলে চলিবে না। তাই সেখানে টাকার জন্য যাইতেছি।

বিরাজ। সেখানে কে আছে

ক্ষিতীশ। আমার একটী বন্ধু আছেন—তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। আমার এই বিপদের কথা শুনিলে, কিছু ঋণ দিতে পারেন।

বিরাজ। আজই আসিবে ত ?

ক্ষিতীশ। হাঁ, নাগাইদ সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই ফিরিব। ঔষধটা যাহাতে নিয়মিতভাবে খাওয়ান হয়, তাহা করিও।

বিরাজমোহিনী সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিল। ক্ষিতীশচন্দ্র তাহার অর্দ্ধ-ময়লা জামাটি গায়ে দিয়া বাটীর বাহির হইলেন।

জ্যৈষ্ঠের দারুণ রৌদ্র ভেদ করিয়া তত বেলায় ক্ষিতীশচন্দ্র তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, বন্ধু তখন আহারাদি করিয়া, গৃহের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষিতীশের আগমনবার্ত্তা পাইয়া তখনই উঠিয়া আসিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন।

ক্ষিতীশ পরিশ্রম-ক্লান্ত শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "আমার বড় বিপদ্। স্ত্রীর অত্যন্ত ব্যারাম।"

বন্ধু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যারাম ?"

ক্ষিতীশ। জ্বর-বিকার।

বন্ধু। কে দেখিতেছে ?

ক্ষিতীশ। দেবেন্দ্র-ডাক্তার।

বন্ধু। সুচিকিৎসক বটে ; যাই হউক—এখন স্নান কর, আহার কর—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র একটু বিশ্রাম করিয়া স্নানাহার করিলেন। তৎপরে

তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে লইয়া তাপহীন নিভৃত গৃহে গমন করিলেন এবং বিস্তৃত শয্যার উপরে শয়ন করিয়া বলিলেন, "এখন একটু ঘুমাও।"

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন, "শোন ভাই, যাহার হাতে একটী পয়সা নাই, যে আশ্রয়হীন, আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত, তদুপরি যাহার স্ত্রী জ্বরবিকারে আসন্ন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তাহার কি সুখ-নিদ্রার সম্ভাবনা আছে? বড় অভাবে পড়িয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি।"

বন্ধু। কাজটা ভাল হয় নাই—ভাইদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াটা যে তোমার বুদ্ধির কাজ হয় নাই, সে কথা আমি তোমাকে আগেও বলিয়াছি। এখনও বলিতেছি, স্ত্রীর রোগ আরোগ্য হইলে বাড়ী যাইও।

ক্ষিতীশ। সে ত পরের কথা—আপাততঃ আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার না দিলে, আমি মারা পড়ি।

বন্ধু। কোন আপত্তিই ছিল না—তবে বর্ত্তমানে আমার হাতে একটী পয়সা নাই। যাহা ছিল, এই সকালবেলা একজনকে ধার দিয়াছি।

ক্ষিতীশ। দোহাই তোমার—এ বিপদে রক্ষা কর। আমি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতেছি! তুমি জান, আমার অংশের বাড়ী ঘর আছে, জমিজমাও আছে—বিক্রয় করিলে সুদসহ পঞ্চাশটাকা আদায় হইতে পারিবে তাহা নিশ্চয়। অন্যমত করিও না—আমি বড় বিপদে পড়িয়া বড় আশা করিযাই তোমার নিকটে আসিয়াছি।

বন্ধু। আমার কাছে ত টাকা নাই-ই। তবে যদি দিদির তহবিলে বিশ পঁচিশ টাকা থাকে!

ক্ষিতীশ। যে তহবিলেই থাক্ আমায় দাও। কিন্তু বিশ পঁচিশ টাকাতে কিছুই হইবে না। অন্ততঃ চল্লিশটা করিয়া দাও।

বন্ধু। এখন ঘুমোও, পরে দেখিব এখন।

ক্ষিতীশ। আমার ঘুম হইবে না—তুমিও আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার কর, আজ আর ঘুমাইও না। বাড়ীর মধ্যে যাও, ঠিক করিয়া আইস।

বন্ধু। যতদূর হয়, একপ্রকার হইবেই এখন—এ রৌদ্রে কিছু যাইতে পারিবে না। একটু পরেই দেখা যাইবে। এখন ঘুমাও।

এই কথা বলিয়া ক্ষিতীশের বন্ধুপ্রবর একটা 'পাশের বালিশ' কোলের দিকে টানিয়া লইয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন এবং অচিরাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ক্ষিতীশের নিদ্রা নাই—তিনি চিন্তার দারুণ দাহ জ্বালায় শয্যার উপরে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্ষিতীশের নিকট বোধ হইতে লাগিল, যেন সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই—কিন্তু বন্ধুর বিরক্তির জন্য ডাকিতেও সাহস করিতেছিলেন না। যদি তিনি বিপদে পড়িয়া টাকার জন্য না আসিতেন, তবে এতক্ষণ ডাকিয়া তুলিতে পারিতেন—এমন কতদিন ঘুমাইতে দেন নাই, কিন্তু আজ তাঁহার সে সাহস নাই। ক্রমে জ্যৈষ্ঠের প্রবল রৌদ্রতাপ কমিয়া আসিল—ক্ষিতীশের বন্ধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঘুমাও নি?"

ক্ষিতীশ। পোড়া-চক্ষে ঘুম আসে নাই।

বন্ধু। (হাসিয়া) খুব বউ-পাগ্‌লা যাই হোক্, 'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে, অভাগার ঘোড়া মরে'—তা এত চিন্তাই বা কি? যদিই মরে, আবার বিবাহ করিও—বিবাহের বাজার আজকাল বড় সস্তা!

ক্ষিতীশ। আমার মত দরিদ্রের স্ত্রী না থাকাই মঙ্গল—কিন্তু একটা মানুষ বিনা-চিকিৎসায় মরে যাবে, এ হতে কষ্টের কথা আর কি আছে।

বন্ধু। যাহারা টাকা খরচ করিয়া দেবেন-ডাক্তারকে দেখাইতে পারে না—তাহারা বুঝি সবাই মরিয়া যায়? আর দেবেন-ডাক্তারকে দেখাইতে টাকাই বা অত লাগিবে কেন? তার ত দুই টাকা করিয়া ভিজিট্‌!

ক্ষিতীশ। রোগ শক্ত—ক'দিন আসিতে হইবে, কে জানে! তা ছাড়া ঔষধের দাম আছে—পথ্য আছে।

বন্ধু। পথ্যও কি তোমাকেই কিনিতে হইবে? কেন, তার ভাযের বাটীতে আছে, সে দেবে না?

ক্ষিতীশ। নাও দিতে পারে—দরিদ্রের স্ত্রীর জন্য কে অত করিতে যায়?

বন্ধু। তবে সেখানে রাখ কেন? রাগ করিও না, তুমি বড় স্ত্রীর বাধ্য। যা বলে, তাই কর—ইহাতে কষ্ট না পাইবে কেন? আজ যদি বাড়ীতে থাকিতে, তবে কি এতটা কষ্ট—এতটা অভাব সহ্য করিতে হইত?

ক্ষিতীশ। বর্ত্তমানে বাড়ীর অবস্থা আরও শোচনীয়।

"তবুও সেটা নিজের বাড়ী।"—এই কথা বলিয়া বন্ধু উঠিয়া গেলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র সেই স্থানে বসিয়া আকাশ পাতাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বন্ধু ফিরিয়া আসিলেন। তাহার প্রতিপাদক্ষেপে ক্ষিতীশের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল—পাছে তিনি বলেন—"টাকার সংস্থান হইল না।" কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিবার কথা শুনিয়া তাঁহার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন হইয়া গিয়াছিল। তবে বিষয় এবং আসল টাকা ও তাহার তিন বৎসরের সুদের সামঞ্জস্য করিয়া তিনগুণ হিসাব মনে মনে খতাইয়া দেখিয়া—ত্রিশটাকা হাতে করিয়া লইয়া আসিলেন।

শয্যায় উপবেশন করিয়া অতি গম্ভীর বদনে বলিলেন, "নিজের হাতে টাকা না থাকিলে এমন বিপদেও পড়িতে হয়। দিদির কাছে অনেক বলিয়া কহিয়া এই ত্রিশটী টাকা আনিয়াছি। সে কেবল তোমার জন্য—নতুবা আমি ও-সব মেয়েলী ফেসাদের মধ্যে যাই না। সুদ, প্রতি টাকায় দুই পয়সার হিসাবে।"

ক্ষিতীশ। তাই।

বন্ধু। একখানা হ্যাণ্ডনোট লেখ।

কাগজ কলম কালী সেই স্থানেই ছিল। ক্ষিতীশচন্দ্র হ্যাণ্ডনোট লিখিতে উদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদির নামে লিখিব না কি?"

বন্ধু। না—আমার নামেই লেখ। মেয়েমানুষের নামে লিখিবার প্রয়োজন নাই।

ক্ষিতীশের বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, অধিক মাত্রায় সুদ আর দলীলখানি লেখাইয়া লইবার জন্যই বন্ধুবরের দিদির নাম প্রকাশ করা। যাহা হউক, তিনি টাকা পাইলেন, ইহাই যথেষ্ট। তখন দলীল লিখিয়া দিয়া টাকা ত্রিশটী লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বন্ধু। কি রকম—এখনই নাকি?

ক্ষিতীশ। হ্যাঁ—সন্ধ্যার পূর্ব্বে পঁহুছান চাই।

বন্ধু। তোমার স্ত্রী কেমন থাকেন, সংবাদ দিও।

"দিব"—এই কথা বলিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

নন্দনগ্রাম হইতে রঘুনাথপুর যাইতে হইলে, মধ্যপথে দেবেন্দ্র-ডাক্তারের বাড়ী, একটু বামপার্শ্বে আধক্রোশখানেক রাস্তা ঘুরিয়া যাইতে হয়। ক্ষিতীশচন্দ্র সেই পথ ধরিয়া ডাক্তারের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তারবাবু তখন আরাম-চৌকিতে বসিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। সেখানে অন্য কেহ ছিল না। ক্ষিতীশচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন, "আসুন, খবর কি?

ক্ষিতীশ পার্শ্বস্থাপিত একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "রোগীর খবর অধিক কিছুই জানি না। আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেখান হইতে আসিয়াছি।"

ডাক্তার। কোথায় গিয়েছিলেন?

ক্ষিতীশ। আপনাকে সকালে বলিয়াছিলাম, চেষ্টা করিয়া আপনাকে কিছু দিতে পারিব—সেই চেষ্টাতেই গিয়াছিলাম।

এই বলিয়া দশটী টাকা বাহির করিয়া ডাক্তারবাবুর সম্মুখস্থ টেবিলে রক্ষা করিলেন।

দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দশ টাকা কিসের জন্য? আমার ভিজিট্ দুই টাকা, আর ঔষধের দাম আন্দাজ এক টাকা।"

ক্ষিতীশ। আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—নিত্য দিতে পারিব কি না সন্দেহ; যাহা সংগ্রহ হইল, আপনার কাছে দাখিল করিলাম! আপনি রোগীকে আরোগ্য করুন—কবে আবার দিতে পারিব, জানি না। তবে ফাঁকি দিব না—সংগ্রহ হইলেই দিব।

ডাক্তার। আপনি দুইটী টাকা আমাকে দিয়া বাকি লইয়া যান—প্রয়োজনমত দিবেন।

ক্ষিতীশ। আপনার নিকট গচ্ছিত থাক্—নতুবা আমার অনেক অসুবিধা আছে।

ডাক্তারবাবু বাক্সের মধ্যে টাকা রাখিয়া বলিলেন, "বাজার হইতে গোটা কয়েক বেদানা লইয়া যাইবেন, আর দুগ্ধ সেবন করিতে দিবেন—রোগীকে না খাইতে দিয়া, বড়ই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া ক্ষিতীশ বিদায় হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্র-ডাক্তার বিশেষ যত্ন সহকারে ক্ষিতীশের স্ত্রীর চিকিৎসা করিলেন। পনের ষোল দিন যথারীতি ঔষধাদি সেবন করিয়া সেজ-বউ নিরাময় হইলেন। কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল—ডাক্তার বলিয়াছিলেন, এখন কিছুদিন বলকারক ঔষধ ও সুপথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঔষধ দেবেন্দ্র-ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে ক্ষিতীশ লইয়া আসিতেন—পুরাতন মিহি-চাউল, জীবিত-মৎস্য ও অন্যান্য পথ্য যাহা পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থের সংসারে সচরাচর থাকে না, তাহাও ক্ষিতীশ ক্রয় করিয়া আনিতেন। এই-রূপে আর কয়েকমাস কাটিয়া গেল—সেজ-বউ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সেদিন ক্ষিতীশের শ্যালক হরিচরণ পাড়া হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার মাতা ও তনুর মা দাওয়ায় বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক্ষিতীশ কোথায় ?”

মাতা উত্তর করিলেন, “ঘরের মধ্যে, আবার কোথায় ?”

হরিচরণ দাওয়ায় উঠিয়া বসিলেন এবং ক্ষিতীশকে বাহিরে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ক্ষিতীশ তথায় উপস্থিত হইলেন।

হরিচরণ বলিলেন, “ব’স, কথা আছে।”

ক্ষিতীশ উপবেশন করিল। হরিচরণ বলিলেন, “এখন তুমি কি করিবে স্থির করিতেছ ?”

তন্নর মা বলিলেন, “কি আবার করিবেন, শিবু আরাম হইল, এখন তাহাকে লইয়া বাড়ীর ছেলে বাড়ী যান।”

হরিচরণের মাতা বলিলেন, “বাড়ীতেও ত মহাসুখ, ছুঁড়ীর হাড়ে কালী দিয়া ছাড়িয়াছে। উনিও ত পেটে দুটো ভাত পান না।”

হরিচরণ বলিলেন, “আমি যাহা স্থির করিয়াছি, ক্ষিতীশও শুনুন, তোমরাও শোন, মত হয়, তবে ক্ষিতীশ তাহাই করুক।”

সর্ব্বাগ্রে ক্ষিতীশই বলিলেন, “কি বল।”

হরি। ও পাড়ায় রাম-দা একটা আড়ত করিবেন—তাঁর দু’জন লোকের দরকার। আমি ক্ষিতীশের কথা বলায় তিনি স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু আপাততঃ মাসিক বেতন ছয় টাকা। কিছুদিন পরে দশ টাকা পর্য্যন্ত হইবে।

তনুর মা। ছয় টাকায় দুইজনের খোরাকী চলিবে না আর কিছু হইবে ? সে আমার নিকট ভাল বোধ হয় না।

হরি। খোরাকী কি উহার মধ্যে হয়! খাওয়াটা আমার মধ্যেই চলিবে। আমি একা সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখিতে পারি না। একটু মাঠটা দেখিবেন, আমার এখানেই খাওয়া দাওয়া চলিবে।

তন্নুর মা। সেখানে কাজ করিবে না, তোমার কাজ করিবে ?

হরি। একটু সুবিধা আছে। রামপুরের বাজারে আড়ত হইবে কি না, ক্ষিতীশ দশটার সময় খাইয়া যাইবে।

তন্নুর মা। আসিবে কখন ?

হরি। সন্ধ্যার পর।

তন্নুর মা। তা হ'লে সকালে তোমার কাজকর্ম্ম দেখবে ?

হরি। হাঁ।

তন্নুর মা। আমার নিকটে তাহা ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শ্বশুর-বাড়ী থাকিয়া কাজ-কর্ম্ম করিয়া খাওয়া মোটেই ভাল নয়। অনেক কথা জন্মে।

হরির মা। কিন্তু যান কোথায় ?

হরি। দেখুন, উনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমার যতটুকু সাধ্য আমি তাহা চেষ্টা করিলাম।

হরির মা। মা দুর্গার আশীর্ব্বাদে তুমি আমার বেঁচে থাক, তুমি নইলে হতভাগিনীর আর উপায় কি। এমন অদৃষ্টও আমি করেছিলাম যে মেয়েটার কপালে একবিন্দুও সুখ হ'ল না।

ক্ষিতীশ। হাঁ, ঐ কাজই আমি করিব। কবে যাইতে হইবে ?

হরি। আর তিন দিন পরে।

ক্ষিতীশ। তবে তাহাই হইবে।

তার পরে রাধাচরণের কথা উঠিল। রাধাচরণ হরিচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—সে বাইশ বৎসর বয়সে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে, তাহার মত ছেলে আর হয় না। সকলেই বলে সে হাকিম হইবে, হাকিম হইলে তাহার একজন বাজার সরকারের প্রয়োজন; অতএব ক্ষিতীশের শাশুড়ী ভরসা করেন, তখন ক্ষিতীশ সেই কাজ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিবে, এখন ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়া রাধুকে বাঁচাইয়া রাখিলে হয়।

তার পর ঠাকুরবাড়ী যাইবার বন্দোবস্তের কথা উঠিল। সে কথার মর্ম্ম—হরিচরণের মাতার সেখানে যাইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না; পাড়ার পাঁচজন যাইতেছে বলিয়াই যাওয়া—না যাইলে লোকে নিন্দা করিবে! নতুবা তাঁহার মত রত্নগর্ভার আবার জগন্নাথ দর্শন কি? দুইটী পুত্র, সাক্ষাৎ জগন্নাথ আর বলরাম।

গল্পের যখন জমাট্ উত্তমরূপে বাঁধিয়া উঠিল, তখন হরিচরণের গুড়ুকের প্রয়োজন হইল। বলিলেন, "র'তে এখনো আসে নি, হুঁকাটা বাহিরে আছে?"

হরিচরণ কর্ম্মসংস্থান ও অন্নদানে স্বীকৃত হইয়া ক্ষিতীশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে একটু তামাক সাজিয়া না খাওয়ান ক্ষিতীশের পক্ষে নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্য বিবেচনায়, "আমিই দেখিতেছি" বলিয়া ক্ষিতীশ হুঁকার অনুসন্ধানে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলা আটটার সময় মজঃফরপুর ষ্টেশনে গাড়ী উপস্থিত হইল। পাঁচকড়ি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং টিকিটবাবুর হাতে টিকিটখানি প্রদান করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে গেল।

বিদেশ গমনে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত পাঁচকড়ি, ষ্টেশনের বাহিরে গিয়া বিষম বিভ্রাটে পড়িল। যেদিকে চাহে সেই দিকেই পশ্চিমদেশীয় লোক—তাহার আবাল্যের পরিচিত মানুষের মত একটি মানুষও দেখিতে পাইল না। মাথায় বড় বড় পাগড়ী বাঁধিয়া, নাগারা-জুতা পায়ে গম্ভীর পাদবিক্ষেপে ভদ্রলোকেরা গমনাগমন করিতেছেন। কুলী মজুরেরাও তাহার দৃষ্ট মানুষের মত নহে। সে অনেকখানি পথ আপন মনে চলিয়া গেল—কিন্তু কোথায় যাইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। একজন সেই

দেশীয় ভদ্রলোক দেখিয়া বাঙ্গালাতে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারবাবুর বাসা কোথায় ?"

ডাক্তারবাবু মজঃফরপুরে অনেক। সে ভদ্রলোক ঠিক করিতে না পারিয়া, সরল হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ডাক্তারবাবুর বাসা খুঁজিতেছ ? ডাক্তারবাবু এখানে অনেক আছে।"

পাঁচকড়ি তাহার অগ্রজের নাম করিল। সে চিনিতে পারিল না। বলিল, "ঐ সম্মুখে ডাকঘর। ডাকঘরে দুইজন বাঙ্গালীবাবু আছেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সব খবর জানিতে পারিবে।"

পাঁচকড়ি তখন ডাকঘর অভিমুখে গমন করিল।

ডাকঘরের বারেন্দায় গিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছে—ভিতর হইতে একজন বাঙালীবাবু তাহা দেখিয়া ত্বরিতপদে বাহিরে আসিলেন এবং ভদ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি দেখিতেছি আমাদের দেশের লোক এবং আপনি যে এখানে নূতন আসিয়াছেন তাহাও বুঝিতেছি—কোথায় যাইবেন ?"

বাঙলা কথা শুনিয়া পাঁচকড়ি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল, "আপনার অনুমান সত্য—বঙ্গদেশ হইতে সবেমাত্র এই গাড়ীতে এখানে আসিয়াছি। আমার দাদা এখানে ডাক্তারী করেন, তাঁহার বাসায় যাইব। কিন্তু কোথায় তাঁহার বাসা আমি তাহা জানি না।"

বাঙ্গালী। আপনার অগ্রজের নাম কি ?

পাঁচ। দানীশচন্দ্র রায়, তিনি সরকারী ডাক্তার।

বাঙ্গালী। ও বুঝিয়াছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন ; পিয়ন চিঠি লইয়া বাহির হইতেছে, ডাক্তারখানার চিঠি থাকিতে পারে, আপনাকে সেখানে পঁহুছিয়া দিয়া যাইবে।

পাঁচু। কতদূর ?

বাঙালী। অধিক দূর নহে—সহরের মধ্যস্থলে।

এই সময় পিয়নেরা চিঠি লইয়া বাহির হইল। বাঙ্গালীবাবুটি একজন পিয়নকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই বাবুটিকে সরকারী ডাক্তারখানা দেখিয়ে দিও। ইনি ডাক্তারবাবুর ভাই। পথশ্রান্ত হয়েছেন, আগে ইঁহাকে ডাক্তারখানা দেখিয়ে দিয়ে তুমি অন্যত্র যাইও।"

পিয়ন পাঁচকড়িকে সঙ্গে লইয়া গেল।

সহরের মাঝে সরকারী ডাক্তারখানার অট্টালিকা উন্নত শীর্ষ উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। অট্টালিকার সম্মুখে প্রকাণ্ড গেট। গেটের মধ্যে অনাবৃত স্থলে তখন রোগীর শয্যা, রোগীর খট্টা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে, নিম্নশ্রেণীর ভৃত্যগণ চারিদিকে কার্য্য করিয়া ফিরিতেছে। পাঁচকড়ি নিত্য নির্ভীক, সে প্রায় কোন বিষয়েই বিচলিত হইত না। পিয়নের সঙ্গে পরিচিতের ন্যায় সেখানে প্রবিষ্ট হইল।

যেখানে ডাক্তারবাবু বসিতেন, পিয়ন তাহা জানিত, পাঁচকড়িকে সঙ্গে লইয়া তথায় গেল। দানীশচন্দ্র তখন টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি পাঠ করিতেছিলেন। পিয়ন সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, এই বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" দানীশচন্দ্র মস্তকোত্তোলন করিলেন। পাঁচকড়িকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত যুগপৎ হর্ষ বিষাদে উদ্বেলিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে তুই কোথা থেকে? বাড়ীর সব ভাল ত?"

পাঁচকড়ি পার্শ্বের দেওয়ালে ছাতাটি হেলান দিয়া রাখিয়া বলিল, "সকলে জীবিত আছে বটে!"

"যা, এখন বাসায় যা, সেখানে সব কথা শুনিব। পথে বিশেষ কষ্ট হয় নাই ত?" এই কথা বলিয়া তিনি একটি ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে, পাঁচকড়িকে বাসায় রাখিয়া আসিতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "বাসায় রাখিয়া সকলকে বলিয়া আসিস্, এই বাবু আমার ভাই। সকাল সকাল যেন স্নানাদির যোগাড় করিয়া দেয়।"

পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন যাবেন না?"

দানীশ। আরও দুইঘণ্টা পরে আমি যাইব। বাসায় গিয়া স্নান করিয়া তুই জলটল খা-গিয়ে।

পাঁচ। আমি এখানে এক বিপদে পড়িয়াছি, কাহারও কথা ভাল বুঝিতে পারি না। আপনার বাসায় যারা আছে, তারা কি সবাই এ দেশের লোক?

দানীশ। (হাসিয়া) পাচক-ব্রাহ্মণ বাঙালী।

"যাক্, বাঁচা গেল"—এই কথা বলিয়া দেওয়ালগাত্র হইতে ছাতাটি লইয়া পাঁচকড়ি ভৃত্যের সঙ্গে বাসায় চলিয়া গেল।

যথাসময়ে দানীশ বাসায় আসিয়া আহারাদি অন্তে পাঁচকড়ির নিকট বাটীর সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন। তাঁহার প্রাণে অনুতাপের একটা তপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল,আমি মাসে এত টাকা উপার্জ্জন করিয়া অপব্যয় করিতেছি,উপরন্তু মাসে মাসে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছি; কিন্তু আমার মা,আমার স্ত্রী,আমার ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতৃগণ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে।

দাদার কাছে সকল কথা জানাইয়া পাঁচকড়ি বলিল, "তিন চারি দিনের মধ্যে আপনি একবার বাড়া চলুন।"

দানীশ বলিলেন, "বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু এখন ছুটি পাইব বলিয়া আশা হইতেছে না। এখানে এখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এ সময়ে আমাকে ছাড়িবে না।"

পাঁচ। খুব লোক মরিতেছে না কি?

দানীশ। হাঁ—এ সময়ে এখানে আসা তোর ভাল হয় নাই।

পাঁচ। কেন, রোগের ভয়? আমি ওসব মানি টানি না। কিন্তু কতদিন পরে আপনি বাড়ী যাইতে পারিবেন?"

দানীশ। ঠিক কি করিয়া বলিব। ছুটির দরখাস্ত করি, তার পর যেমন হয় জানিতে পারিব।

পাঁচ। তবে আজকার ডাকেই কিছু টাকা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠান, নতুবা বাড়ীর লোক না খাইয়া মারা যাইবে।

দানীশ। তুই বাড়ী যাবি না ?

পাঁচ। আমি দিনকতক দেশটা দেখি। আপনার ছুটি মঞ্জুর হইলে তার পরে যাইব।

দানীশ। আমার ইচ্ছা নয় যে, এই প্লেগের সময় তুই এখানে থাকিস্।

পাঁচ। সে জন্য আপনার কোন ভয় নাই। বাঁচিয়াও আমার কোন সুখ নাই। একবাড়ীতে থাকিব, অথচ শচীকে পাইব না—তাহা কখন সহ্য হইবে না। টাকা আজই পাঠাইবেন ত ?

দানীশ। টাকা ত তহবিলে নাই। বাসাখরচের জন্য গোটা-দশেক টাকা আছে।

পাঁচ। আজ তাই পাঠিয়ে দিন। তার পর আবার দেবেন।

দানীশ স্বীকৃত হইলেন। পাঁচকড়ি টাকা লইয়া তখনই ডাকঘরে চলিয়া গেল—সে আসিবার সময় ডাকঘর চিনিয়া আসিয়াছিল। ডাকঘরে গিয়া দশটাকা মণি-অর্ডার করিল এবং মাতার নিকট চিঠি লিখিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাঁচকড়ি ডাকঘরের কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া নগরে বাহির হইল। সারা সহরখানি ঘুরিয়া সে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

বাসার সম্মুখে তখন একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, গাড়ীখানা মূল্যবান্ এবং অশ্ব দুইটি হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। মুহূর্ত্তকাল চিন্তা না করিয়া বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল।

যে গৃহে দানীশ থাকে, সে গৃহে তখন মধুর হারমোনিয়মের সুরের

সহিত রমণী কণ্ঠের স্বর উত্থিত হইতেছিল পাঁচকড়ি ব্যাপার দেখিবার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। দেখিল এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী দানীশের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হারমোনিয়ম রাখিয়া গান গাহিতেছে। তাহার গায়ে জামা, পায়ে জুতা-মোজা, মাথার চুলে বেণী বাঁধা। মেয়েমানুষের এমন সাজ—এমন ব্যবহার তাহার চক্ষে নূতন দৃশ্য।

পাঁচকড়ি দরজার নিকট দাঁড়াইয়া সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। গান গাহিতে গাহিতে যূথিকার নয়ন দরজার দিকে পতিত হইল। দেখিল একটি তরুণ যুবক এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। গান বন্ধ করিয়া যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে মহাশয়?"

পাঁচকড়ি বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, যূথিকা মনে মনে হাসিল; ভাবিল—লোকটা ভারি বোকা, একটা কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। কিন্তু মানুষটা সুপুরুষ বটে—আলাপ পরিচয়ের নিতান্ত অযোগ্য নহে। বয়স অতি অল্প—মোটে গোঁফের রেখা দিয়াছে, হয় ত সেই জন্যই এত মুখচোরা।

দানীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গান বন্ধ করিয়া কি ভাবিতেছ?"

যূথিকা একবার দানীশের মুখের দিকে চাহিল! তাহার পর অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "ঐ লোকটীর কথা।"

দানীশ হাসিয়া বলিল, "ও আমার ছোট ভাই, তুই ভাইকেই আর ভাবিও না।"

দানীশ কথাটা রহস্য করিয়াই বলিয়াছিল, কিন্তু যূথিকার হৃদয়ে তাহা উজ্জ্বলতরভাবে বিকশিত হইল, তাহার মনে হইল তাহাতে দোষ কি? অমন চোখ, অমন মুখ—অমন সরল দৃষ্টি, কয়জনের আছে?

যূথিকা হারমোনিয়মের চাবি বন্ধ করিয়া বলিল, "উনি কবে আসিয়াছেন?"

দানীশ। আজ সকালে।

যূথিকা। এখানে কতদিন থাকিবেন ?

দানীশ। স্থির নাই। উহার ইচ্ছা লইয়া কথা।

যূথিকা। উনি কি কলেজে পড়েন ?

দানীশ। না, লেখাপড়া ভাল জানে না। বাল্যকালে মাথার ব্যারাম হইয়াছিল, তাই ডাক্তারেরা অধ্যয়নাদি মানসিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

যূথিকা। আহা! অমন সুন্দর পুষ্পটি নির্গন্ধ।

দানীশ। এক গুণ আছে।

যূথিকা। কি ?

দানীশ। সুন্দর হারমোনিয়ম বাজাইতে ও গাহিতে পারে।

যূথিক। তবে ডাক না।

দানীশ। আমার সম্মুখে গাহিবে না।

যূথিকা। অশিক্ষিত এবং পল্লীবাসী কি না! এ কুসংস্কার কত দিনে যে বঙ্গভূমি হইতে বিদূরিত হইবে!

দানীশ। তুমি অন্য সময় উহার গান শুনিতে পারিবে।

যূথিকা। কাল সকালে যখন তুমি ডাক্তারখানায় যাইবে, আমি আসিয়া গান শুনিব।

দানীশ। সেই ভাল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দানীশের সহিত যূথিকার পরামর্শ হইয়াছিল যে, পর দিবস সকালে যূথিকা আসিয়া পাঁচকড়ির গান শুনিয়া যাইবে, কিন্তু সকাল বেলা সঙ্গীত মাধুর্য্য পূর্ণতমভাবে প্রকাশ পায় না, এই অজুহাতে যূথিকা সকালে না আসিয়া সন্ধ্যার পরে আসিল।

আকাশ সেদিন বেশ পরিষ্কার ছিল এবং চন্দ্রকিরণে দিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছিল।

যূথিকা যখন আগমন করিল, তখন পরামর্শানুসারে দানীশ বাড়ী ছিল না। দানীশ জানিত যূথিকা শিক্ষিতা, যূথিকা প্রেমিকা; কেবল বিশুদ্ধ পবিত্র সঙ্গীত শ্রবণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

যূথিকা আসিবামাত্র ভৃত্য দানীশের বসিবার ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। যূথিকা আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় ?"

ভৃত্য। বাহিরে গিয়াছেন।

যূথিকা। ছোটবাবুকে ডাকিয়া দে।

ভৃত্য গিয়া ছোটবাবুকে সে কথা বলিল। ছোটবাবু ওরফে পাঁচকড়ি তখন সন্ধ্যার প্রাণায়াম সমাপ্ত করিয়া, একটা রসগোল্লা কামড় দিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সেটা গলাধঃকরণ করিয়া পাচককে জিজ্ঞাসা করিল, "ও মাগীটা কে গা ?"

পাচক। বাঙালী মেম সাহেব। এখানকার খৃষ্টানী মেয়েস্কুলের কর্ত্রী।

পাঁচ। এখানে আসে কেন ?

পাচক। কি জানি, শুনিয়াছি, ইংরাজী-পড়া মেয়ে-পুরুষে একত্রে বসিয়া ইয়ারকি দেয়। সাহেব-মেমও দেয়। ওতে নাকি দোষ হয় না।

পাঁচ। মাগীর চরিত্র ভাল ত ?

পাচক। সাতটাকা মাহিনায় ভাত রাঁধিতে আসিয়া, অত বড় বড় লোকের খবর জানিব কি প্রকারে বাবু ?

পাঁচকড়ির যদিও তাহার নিকটে যাইতে কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তথাপি এদেশের কায়দা-কানুন জানে না, যদিই বা অভদ্রতা কিংবা দোষ হয়, এই ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি যে গৃহে যূথিকা বসিয়াছিল, সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। যূথিকা মৃদু হাসিয়া বলিল—"বসুন। আমি অনেকক্ষণ আসিয়া আপনার প্রতীক্ষায় আছি।"

সে কথার কি উত্তর করিতে হয়, পাঁচকড়ি তাহা খুঁজিয়া পাইল না। একটু হাসিয়া একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল।

যূথিকা বলিল—"আপনি ভাল গাহিতে পারেন, তাই আপনার নিকটে গান শুনিতে আসিয়াছি। হারমোনিয়মটা খুলিয়া লইয়া একটি গান করুন।"

পাঁচকড়ি এবার কথা কহিল। বিনীতভাবে বলিল—"আমি গাহিতে পারি, কে বলিল?"

যূথিকা। কেন, আপনার দাদা—ডাক্তার সাহেব।

পাঁচকড়ি চমকিয়া উঠিল। যূথিকা হাসিয়া বলিল—"আপনি কি লজ্জিত হইলেন? উহা পল্লীগ্রামে অবস্থানের ফল। গান অতি পবিত্র—উহা স্বর্গীয় পদার্থ। কাহারও নিকট গাহিতে লজ্জা নাই।"

পাঁচকড়ি হারমোনিয়ম বাজাইয়া একটা গান গাহিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে গান গীত হইল—তারপরে পাঁচকড়ি গান সমাপ্ত করিয়া কপালের স্বেদ-নীর মুছিয়া ফেলিল। যূথিকা বলিল—"আপনার কণ্ঠস্বর, আপনার হারমোনিয়মশিক্ষা, অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু গানটী অতি কুরুচিমাখা—অমন গান ভদ্রলোকের গাহিতে নাই!"

পাঁচকড়ি বুঝিতে পারিল না, ঠাকুর দেবতার গান কুরুচিমাখা কেন হইবে? সে কোন কথা কহিল না, বিস্ময়-সূচক চাহনিতে যূথিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যূথিকার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল—"আপনি বোধ হয়, ঐ গানটির বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। সেই হরিঠাকুর—হরি এই নাম কাণে গেলেই সেই বৃন্দাবন, সেই যমুনাতট, সেই কদম্ববৃক্ষ—ক্ষমা করিবেন, আর বলিতে পারিব না—সেই সকল জঘন্য কথা মনে পড়ে। তার উপর আবার কুরুচি—বিষম কুরুচি—পূজার আয়োজন—ঈশ্বরের ভোজন—ভোগের পাত্র—হায়, হায়, একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের গৃহে একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার সম্মুখে এ গান অন্যে গাহিলে এতক্ষণ আমার মূর্চ্ছা হইত—কিন্তু আপনাকে ভালবাসি—তাইতে

এতক্ষণ বসিয়া আছি! সবিশেষ অনুরোধ, আর কখনও অমন গান গাহিবেন না। আর একটি গান করুন। আমি বড় আশা করিয়া আসিয়াছি।

পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি গান গাহিব?

যূথিকা বলিল—"কেন প্রেম-সঙ্গীত? আপনি কি জানেন না, প্রেমেই জগৎ বাঁধা! প্রেম প্রেম—পবিত্র প্রেম বিনা জগতের কোন অস্তিত্বই নাই।

পাঁচকড়ি ভাবিল—"ইংরেজী পড়িলে মানুষ ক্ষেপে না কি? কথা যা বলে, তাও বোঝা যায় না—আর স্বভাব-চরিত্র ত ঠিক উন্মাদের মত।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোলের উপর হারমোনিয়ম রাখিয়া প্রায় চক্ষু মুদিত করিয়া গাহিল,

ওগো, তোমার দুয়ারে আসি তাই।
আমি যাহা চাই, তুমি তাই।
জীবনের ঘুম ঘোরে, পূজি গো নিতি তোমারে
বিরল-বিরহ বাসে তোমারে ধেয়াই॥

গৃহে কাচমধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। সেই তীব্র উজ্জ্বল আলোকতলে পাঁচকড়ি গান গাহিতেছিল। পাঁচকড়ির গান সমাপ্ত হইল। যূথিকা কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"আপনার গান বুঝি স্বর্গের জিনিস। আমার জ্ঞান হইতেছিল, আপনি এই স্বর্গীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সৌন্দর্য্য-দেবতারূপে আমার মন-প্রাণ হরণ করিতেছিলেন।"

পাঁচকড়ি মৃদু হাসিয়া বলিল—"আপনি সন্তুষ্ট হইলেন, ইহাতে আনন্দিত হইলাম।"

যূথিকা। আমার একটি অনুরোধ আছে, রাখিবেন কি?

পাঁচ। কি বলুন।

যূথিকা। আপনি যে কয়দিন এখানে আছেন, প্রত্যহ একবার করিয়া আমার ওখানে যাবেন কি ?

পাঁচ। কেন ?

যূথিকা। আপনার গান আমাকে পাগল করিয়াছে।

পাঁচ। যাহাতে মনের বিকৃতি আনয়ন করিয়াছে, তাহা আর না শোনাই ভাল।

যূথিকা। আপনার বড় কঠিন প্রাণ।

নবম পরিচ্ছেদ

বর্ষার লতার মত অপ্রতিহত-গতিতে যূথিকার লালসা বাড়িয়া উঠিল। সে পাঁচকড়িকে চায়—পাঁচকড়ি এখন তাহার ধ্যেয়। কিন্তু শিকারোন্মুখী ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া হরিণশিশু যেমন দূরে দূরে সরিয়া যায়, পাঁচকড়ি তেমনই দূরে দূরে সরিয়া থাকিত। তাহার হৃদয় বিশ্বমাতার স্তন্য সুধা ধারায় অভিসিঞ্চিত—সে রমণীমাত্রকেই মায়ের মূর্ত্তি বলিয়া জানিত, সে সৌন্দর্য্যে কখনও তাহার প্রাণে একবিন্দুও কালিমা-দাগ নিপতিত হইত না, মাতৃভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত!

তাহার পরে এক মাস গত হইয়া গিয়াছে—যূথিকা তাহার বাসনা-বিষে যত জ্বলিতেছে, পাঁচকড়িকে বাঁধিবার জন্য যত চেষ্টা করিতেছে, পাঁচকড়ি তত পিছলাইয়া পড়িতেছে। প্রথম প্রথম সে যূথিকার আহ্বানে তাহার বাড়ী গমন করিত, কিন্তু ক্রমে যূথিকার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, ক্রমে সে সেখানে যাওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; এখন সংবাদ পাইলেও যূথিকার বাড়ী যায় না। তবে যেদিন নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পড়ে, সেদিন না গিয়া পারে না।

সেদিন শ্রাবণী পূর্ণিমা। সহর যুড়িয়া ঝুলনোৎসবের আনন্দ-তুফান। আকাশ মেঘশূন্য—দিকে দিকে জ্যোৎস্নার রজতোচ্ছ্বাস।

পাঁচকড়ি যূথিকার নিতান্ত অনুরোধে তাহার বাড়ীতে গিয়াছে। অট্টালিকার সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে দুইখানি আসনে দুইজন উপবিষ্ট। পাশের কৃত্রিম ঝর্ণা হইতে ঝর্ঝর্ শব্দে জল পড়িতেছিল, হাস্নাহানা ফুলটি সৌরভে দিগন্ত মধুমাতোয়ারা করিতেছিল। পাঁচকড়ি হারমোনিয়াম লইয়া মৃদু গ্রামে বাজাইতে আরম্ভ করিল।

যূথিকার নয়ন পাঁচকড়ির মুখের উপরে সংস্থাপিত। সমীরস্পর্শে অলক-গুচ্ছ কপোলের উপর স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। হৃদয়াবেগোন্মত্ত-প্রাণে কম্পিতকণ্ঠে যূথিকা পাঁচকড়িকে বলিল—"একটা গান গাও।"

এখন যূথিকা, পাঁচকড়িকে 'তুমি সম্বোধন করে এবং পাঁচকড়িকে অনুরোধ করিয়া ঐরূপ বলায়।

হঠাৎ চূতশাখাগ্রে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। পাঁচকড়ি গাহিল—

চাঁদনী এ রাতি, তোমার মূরতি
ছাইয়া ব'সেছে সারাটি দেশ।
ফুলের সুবাসে মলয়ার শ্বাসে
সেজেছে বঁধুয়া মোহন বেশ॥
রহিতে না পারি গুমারিয়া মরি
ফাটিয়া যেতেছে হৃদয়দেশ।
কর হৃদি আলা ঘুচে যাক্ জ্বালা
বাজুক বেহাগ করুণ-রেশ॥

যূথিকা আবেশ তরল-নেত্রে পাঁচকড়ির চন্দ্রালোক বিভাসিত সুন্দর আনন সস্পৃহলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিল। প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার সেই তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত কোমল রক্তোষ্ঠ স্পর্শ করিতে প্রবল বাসনা হইতেছিল। পাঁচকড়ি গান সমাপ্ত করিল। যূথিকা হাসিয়া বাহুযুগল দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল।

শরাহত সিংহ যেমন গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিয়া উঠে, পাঁচকড়ি তেমনই লম্ফ দিয়া উঠিল—"কেন মা, আমাকে এমন অকরুণা? আমি যে তোমার সন্তান!"

যূথিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মূর্ত্তি তখন উন্মাদিনীর ন্যায়। বলিল—"প্রিয়তম, আমাকে প্রাণে মারিও না। আমি তোমারি! তুমি ভাবিতেছ, তোমার দাদার সহিত আমার ভালবাসা আছে—কিন্তু তাহা নহে। যূথিকা জগতে কাহাকেও ভালবাসে নাই—সকলের ভালবাসা লইয়াই চলিয়াছে; এইবার তুমি তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ;—প্রাণের প্রদীপ, আমাকে রক্ষা কর। তুমি টাকা উপার্জ্জন করিতে পার না—তাহাতে ক্ষতি কি? আমি মাসে মাসে অনেক টাকা বেতন পাই; তোমাতে আমাতে আজন্ম তদ্দ্বারাই সুখে কাটাইব। আমার সঞ্চিত অর্থও অনেক আছে—তোমার চরণে সে সকলই অর্পণ করিব। তুমি আমার হও। আমি তোমার দাসী হইয়া পরমসুখে দিন কাটাইব।

গভীর অমাবস্যা-নিশীথে প্রেতমূর্ত্তি দর্শনে পথিক যেমন ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, পাঁচকড়িও তদ্রূপ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেট পার হইয়া রাস্তা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ঐ ঘটনার পরদিন রাত্রে আহারাদি অন্তে দানীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে নিকটে ডাকিয়া, কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে তুমি কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

পাঁচকড়ি বিনীতস্বরে বলিল, "বাড়ীতে শান্তি নাই—সুখ নাই, তাই এখানে আসিয়াছি! আর আপনি খরচপত্রও পাঠান না, তাই বলিবার জন্য।"

দানীশ। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না।

পাঁচ। কোথায় যাইব ?

দানীশ। বাড়ী।

পাঁচ। বলিলাম ত বাড়ীতে আর সুখ শান্তি নাই। এমন কি, মেজ-বৌ শচীকে আমার কাছে পর্য্যন্ত আসিতে দেন না।

দানীশ। তোমার মত গুণধরের ঐরূপ পুরস্কারই যোগ্য।

পাঁচকড়ি চমকিয়া উঠিল। তাহার সদা সহাস মুখে কালি ঢালিয়া দিল। বুঝিতে পারিল না, সে কি অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু কোন অপরাধ যে হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল। কেন না, বিনা অপরাধে তাহার দাদা কখনই রাগ করিবেন না, এবং রাগ যে করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, দাদাকে জিজ্ঞাসা করে, সে কি করিয়াছে, কেন তিনি তাহার উপরে রাগ করিয়াছেন ; কিন্তু সাহসে কুলাইল না, নীরবে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কোন প্রকার উত্তর না পাইয়া দানীশ বলিলেন—"একটি পয়সা রোজগারের ক্ষমতা তোমার নাই, পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন কাটাইতেছ, আবার এত বাঁদরামি।"

পাঁচকড়ি এবার জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি করিয়াছি ?"

অধিকতর উত্তেজিত স্বরে দানীশ বলিলেন—"কি করিয়াছ ! মূর্খের নানা দোষ ! তোমার সব গুণ শুনিতে পাইয়াছি।"

পাঁচকড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দানীশ বলিবার অবকাশ না দিয়া বলিলেন—"এত সাহস তোমার প্রাণে। তোমার এখানে থাকা হইবে না—আমি শুদ্ধ মারা পড়িব। আজ রাত্রেই তুমি চলিয়া যাও। এই নাও, তোমার রেলভাড়ার চারি টাকা—রাত্রি এগারটায় যে গাড়ী ছাড়ে, তাহাতেই যাওয়া চাই।"

পাঁচকড়ি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার স্বভাব, সে কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতে ভালবাসে না। এখানেও স্বভাবমত কার্য্য করিল। দানীশের কথার প্রতিবাদ করিল না। বাড়ী যাইতে স্বীকৃত হইল। কেবল ছলছল নেত্রে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া অতি করুণ-বিনীত স্বরে বলিল, "ন-বৌ আপনাকে বাড়ী যাইবার জন্য বড় অনুরোধ করিয়াছিলেন।"

দানীশ বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন—"এই যে, ভায়ার আমার কাব্যশাস্ত্রে খুব দখল হ'য়েছে। মা গেল, দাদা গেল, ভাই-বৌরা গেল—ন-বৌএর অনুরোধ জানান হ'ল! বাহবা কি বাহবা।"

পাঁচকড়ি বড় অপ্রতিভ হইল তথাপি বলিল—"বাড়ীর জন্যে কিছু খরচ দিবেন কি ?"

"দিতে হয়, পাঠাইয়া দিব। দশটা বাজিয়া সাত মিনিট হইয়াছে—এর পর গেলে গাড়ী ধরিতে পারিবে না। ঐ গাড়ীতে তোমার যাওয়া চাই-ই।"

দানীশ এই কথা বলিলে পাঁচকড়ি আর দ্বিরুক্তি করিল না। তাহার কাপড় চোপড় ও ছাতাটি লইয়া বাহির হইল।

পাঁচকড়ির প্রাণে যে কোন প্রকার দাগ লাগিয়াছিল, এমনও বোধ হয় না। সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"গভীর ঘন-ঘটা প্রকটে বামার কলেবরে,
ভীষণ-ভ্রূকুটি-ভঙ্গী উলঙ্গিনী কে শবোপরে।"

এগারাটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে পাঁচকড়ি যাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। গাড়ী তখন আসে আসে—অনেক যাত্রী টিকিট্ কিনিয়া প্ল্যাট্ফরমে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। টিকিট্ লইবার ঘরের দিকে দুই চারিজন লোক ছিল। একটি বৃদ্ধ সেখানে বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল।

পাঁচকড়ি ষ্টেশনে গিয়া গাড়ী আসিবার বিলম্ব নাই শুনিয়া তাড়াতাড়ি

কলিকাতার একখানি টিকিট্ কিনিয়া আনিল। তারপরে প্ল্যাটফরমে যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, একজন বৃদ্ধকে দরজার নিকট কাঁদিতে দেখিয়া আসিয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ফিরিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কাঁদিতেছ কেন বাপু?"

বৃদ্ধ বলিল—"আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বাবা।"

পাঁচ। কি হইয়াছে খুলিয়া না বলিলে, বুঝিব কি প্রকারে? গাড়ী আসিবার আর বিলম্ব নাই—বল তোমার কি হইয়াছে?

বৃদ্ধ। আমার ছেলে এই দেশে চাকুরী করিত—এক বাবুর বাড়ী ভাঁড়ারী ছিল। তাহার প্লেগ হইয়াছিল—বাবু তাহাকে হাসপাতালে দিয়া দেশে চলিয়া যায়। আমি সেই সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়াছিলাম। বাবা আমাকে ফাঁকি দিয়ে, আজ সকালে চিরকালের তরে চলিয়া গিয়াছে। হায়, আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে গো! এই বুড়ো বয়সে অমন ছেলে হারিয়েছি গো!

পাঁচ। সবই আপন কর্ম্মফল—আর এখানে বসিয়া কাঁদিয়া কি করিবে? গাড়ী আসিবার বিলম্ব নাই—বুঝি ঐ গাড়ী আসিতেছে—হ্যাঁ, ঐ শব্দ শোনা যাইতেছে। শীঘ্র চল। তুমি কোথায় যাইবে?

বৃদ্ধ। হা ভগবান্—মহাশয়, আমি কলিকাতায় যাইতাম, কিন্তু যাইবার উপায় নাই—আমার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ছেলের শোকে বড় কাতর ছিলাম, টিকিট্ করিবার যায়গায় বড় ভিড় দেখিয়া একটি বাবুর হাতে টিকিটের দাম দিয়াছিলাম—তিনি নিজের টিকিট করিতে গেলেন, আমারও টিকিট আনিয়া দিবেন। কিন্তু বাবুর দেখা আর পাইলাম না—ষ্টেশনের বাবুদের জানাইলাম, তাঁহারা বলিলেন—"জুয়াচোর ঠকাইয়াছে।" মহাশয়, আমি প্রাণে মারা পড়িলাম—একে পুত্রশোক! তাহাতে সারাদিন কিছু খাইনি—হাতে আর একটি পয়সাও নাই। ওগো, আমার কি হবে গো!"

বৃদ্ধের ক্রন্দনের বেগ সমধিক বৃদ্ধি পাইল এবং ঠিক সেই সময় গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইল। ষ্টেশনে গাড়ী আসিল, বৃদ্ধ তাহাতে উঠিয়া যাইতে পারিবে না জানিয়া একেবারে আকুল হইয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচকড়ি তাহার অবস্থা অবগত হইয়া ব্যথিত হইল এবং নিজের টিকিটখানি তাহার হস্তে দিয়া বলিল—"শীঘ্র যাও, গাড়ীতে উঠগে!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল এবং গেট্ পার হইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িল।

পাঁচকড়ির যাওয়া হইল না। তাহার দাদা তাহাকে কেবল বাড়ী পঁহুছিবার গাড়ীভাড়াটা মাত্র দিয়াছিলেন—সে কলিকাতার টিকিট করিয়াছিল—সামান্য কয়েক পয়সা মাত্র তাহার নিকট উদ্বৃত্ত ছিল। সে আর টিকিট কিনিবে কি দিয়া? কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র চিন্তা হইল না। সে ব্যাগটি হাতে করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া গেল।

ষ্টেশনের অনতিদূরে খাবারের দোকান। দোকানে রেলযাত্রী ভদ্রলোকগণ উপবেশন, শয়ন ও জলযোগাদি করিয়া থাকেন। পাঁচকড়ি সেই দোকানে গিয়া আশ্রয় লইল। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। দোকানের সম্মুখে একখানা তক্তপোষের উপরে ছিন্ন মাদুর পাতা ছিল—পাঁচকড়ি তাহার উপরে আপনার ব্যাগ মাথায় দিয়া শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে কলিকাতায় যাইবার আর একখানা গাড়ী ছিল। গাড়ী আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একখানা অশ্বযানে করিয়া কয়েকটী বাঙালী যুবক আসিয়া দোকানদারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

সে দোকানখানা দিনরাত্রিই খোলা থাকিত। বাঙালীবাবুরা আসিয়া পাঁচকড়ি যে তক্তপোষের উপর নিদ্রা যাইতেছিল, তাহার উপর উপবেশন

করিলেন এবং নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অতি উচ্চ হাসি, বিবিধ-ভঙ্গি স্বর ও দুই একটা গানের ভাঙা চরণের আবৃত্তিতে বেশ একটু গোলযোগের সৃষ্টি হইল, সে গোলযোগে পাঁচকড়ির নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, সে উঠিয়া বসিল।

একটি যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে বাঙালী দেখিতেছি, আপনি এখানে কেন?"

পাঁচ। আমার দাদা এখানে থাকেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

যুবক। কোথায় যাইবেন?

পাঁচ। আপাততঃ কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলাম। আপনারা কোথায় যাইবেন?

যুবক। কলিকাতায়।

পাঁচ। আপনারা কোথায় গিয়াছিলেন?

যুবক। কয় বন্ধু লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম।

তাহার পর তাহারা জলযোগ করিল। একজন ঘড়ি ও রেলওয়ের সময় নিরূপণ-তালিকা খুলিয়া বলিল—"গাড়ী আসিতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা সময় আছে। ততক্ষণ একটা গান হোক, হারমোনিয়মটা খোল না যদু!"

তাঁহাদের মধ্যে এক যদুনাথই ভাল গায়ক। যদু কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হওয়ায় তিনি অপরকে গাহিতে অনুমতি করিলেন, তিনি আবার অপর একজনের উপরে ভারার্পণ করিলেন; এইরূপে পরস্পর পরস্পরের উপরে ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে এই যুবক পাঁচকড়িকে ধরিল—"যদিও বলিবার আমার কোন অধিকার নাই, তথাপি বলিতেছি, —অনুগ্রহ করিয়া আপনি যদি একটি গান গাহিতেন। আমরা বিদেশে এইরূপ স্ফূর্ত্তি করিয়া কাটাইতেছি।"

পাঁচকড়ি কোন আপত্তি না করিয়া হারমোনিয়মে বেলো করিয়া

গান গাহিতে আরম্ভ করিল। সে মধুর স্বর শুনিয়া যুবকগণ মোহিত হইতে লাগিল।

গান হইতেছে, এমন সময়ে টিকিট লইবার ঘণ্টা পড়িল। একটি যুবক বলিল—"একজন গিয়া টিকিট আন, গান বন্ধ করা হইবে না! তারপরে গাড়ী আসিলে, গাড়ীর মধ্যে বসিয়াও গান গাহিতে গাহিতে যাওয়া যাইবে, কেমন মহাশয়, আমাদের সঙ্গে যাইতে আপনার কোন আপত্তি নাই ত?"

পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল—"আপনারাও কলিকাতায় যাইবেন, আমিও কলিকাতায় যাইব, সুতরাং আপনাদের সঙ্গে যাইতে আপত্তি কেন হইবে? বরং আমোদ-প্রমোদে যাইতে পারিব। কিন্তু, আমার কাছে ভাড়ার টাকা নাই, এ গাড়ীতে আমার যাওয়া হইবে না।"

"কুচ্ পরোয়া নাই—সে জন্য আটকাইবে না।" এই বলিয়া সেই যুবক গিয়া তাহাদের টিকিট ও পাঁচকড়ির টিকিট কিনিয়া আনিল, তারপর যথাসময়ে গাড়ী আসিলে পাঁচকড়িকে সঙ্গে লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। পাঁচকড়ির ভাড়ার টাকার জন্য কোন অভাব হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যূথিকার নিকট হইতে যেদিন পাঁচকড়ি পলায়ন করিয়াছিল, সেই দিন হইতে যূথিকার প্রাণে নিরাশ-প্রেমের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। নিরাশ প্রণয়ের বিষম বিষাদে কখনও সে জ্বলে নাই। তাই সে বড় কাতর হইয়া পড়িল। পাঁচকড়ি ব্যতীত আর কাহাকেও তাহার ভাল লাগিত না। সে দিন-রাত্রি পাঁচকড়িকে ভাবিত।

পাঁচকড়ির বিরহ সে সহ্য করিতে পারিল না।

একদিন মধ্যাহ্নকালে দানীশকে লইয়া এক পরামর্শ আঁটিল।

দানীশ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিল না।

যূথিকা আরাম চৌকিতে দেহ-যষ্টি হেলাইয়া, বিষণ্নস্বরে বলিল—"আর পারি না। অসহ্য বেদনা ডাক্তারবাবু, এমন করিয়া আর কতদিন যাইবে?"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন যূথিকা, তোমার আবার কি হইয়াছে?"

যূথিকা। ডাক্তারবাবু, তুমি আমি ভিন্ন-বাসায় থাকি, ইহা আমার সহ্য হয় না, তোমাকে মুহূর্ত্ত বিদায় দিলে বড় কষ্ট হয়।

দানীশ। যূথিকা!—প্রিয়তমে! তবে আমি কি বাসা-বাড়ী উঠাইয়া দিয়া তোমার এখানে থাকিব? অথবা তুমিই আমার বাসায় গিয়া থাকিবে?

যূথিকা। হাঁ, ভাল কথা! তোমার সে ভাইটির নাম কি? ও—মনে হইয়াছে, পাঁচকড়ি। তাহাকে তুমি বাড়ী পাঠাইয়া দিলে কেন?

দানীশ। সে তেমন লেখাপড়া জানে না; বাড়ী গেলে সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম্ম দেখিতে পারিবে। চাকরী-বাকরী ও করিতে পারিবে না।

যূথিকা। না পারুক্—কিন্তু বেশ সরল ও বুদ্ধিমান্। তাকে অমন বাজে কাজে না রাখিয়া যেমন হউক একটা কাজ-কর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করান উচিত—আমি তাকে বড় স্নেহ করি। তা' তোমার সম্বন্ধের গুণেই হউক, আর তার সরলতার গুণেই হউক্। যাক্—আমি যে কথা বলিতেছিলাম। ডাক্তারবাবু—তুমি আমার একটি কথা রাখিবে কি?

দানীশ। সে কি যূথিকা—তোমার কথা আমি রাখিব না? এ প্রাণ কেবল তোমারি জন্য—

যূথিকা। আমি তা জানি। জানি বলিয়াই এমন মরণ মরিয়াছি; কথা কি জান ডাক্তারবাবু, এখানে যদি আমরা এক বাসায় একত্রে বাস করি, লোকে বড় নিন্দা করিবে। এখনি অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিতেছি উভয়েই চাকরী ত্যাগ করিয়া চল, কলিকাতায় যাই।

দানাশ। তারপর?

যূথিকা। তারপর কি? মনের কষ্ট দূর হইবে—সেখানে উভয়ে এক বাসায় থাকিব। সংসার চলিবে কি করিয়া? তার জন্য ভাবনা কি? আমার প্রায় পাঁচহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে—বিক্রয় করিয়া, ঐ টাকা দিয়া একটা ঔষধালয় খুলিব। আমাদের কি চলিবে না?

দানীশ বলিল—"যূথিকা, তুমি আমায় এত ভালবাস—তোমার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে তাহাই হইবে।"

যূথিকা। হইবে নয় ডাক্তারবাবু, এই মাসেই নোটিস দাও, আমিও দেই! আগামী মাসে, আমরা উভয়েই কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইব।

দানীশচন্দ্র পুলকিত-প্রাণে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং কলিকাতায় বাস সম্বন্ধে আরও নানাবিধ পরামর্শ আঁটিয়া চলিয়া গেলেন।

যূথিকা, সে পরামর্শের মধ্যে এ কথাও বলিয়া রাখিল যে, ডাক্তার-খানার তত্ত্বাবধান জন্য পাঁচকড়িকে আনিতে হইবে। দানীশ বুঝিলেন, তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া পাঁচকড়িকে যূথিকা বড় স্নেহ করে।

দানীশচন্দ্র চলিয়া গেলে, যূথিকা উঠিয়া বসিল। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল, তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল—"পাচকড়ি, প্রাণের পাঁচকড়ি, তোমাকে লাভ করিবার জন্য আরও এক নূতন কৌশলের সৃষ্টি করিলাম। আমার কষ্ট-সঞ্চিত অর্থরাশির মায়া পরিত্যাগ করিলাম। তুমি এ চির-শান্ত হৃদয়ে যে আগুন জ্বালাইয়াছ, তুমি ব্যতীত তাহা মিটিবে না। তোমাকে আমার বাসায় রাখিব। যেরূপেই পারি, তোমাকে আমার করিব, অবশেষে দানীশকে দূর করিয়া দিব।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন শ্রাবণ মাসের শেষ-বেলায় গাড়ী হইতে নামিয়া পাঁচকড়ি বাড়ী চলিল। তাহার দক্ষিণ-হস্তে সাত আনা মূল্যের একটি ছোট ঢোলক, শচী বাজাইবে। বাম-হস্তে একটি পুঁটুলি—তন্মধ্যে কয়েকখানি নূতন বস্ত্র, শচীর একটা জামা, একজোড়া জুতা ও একটা বাঁশী।

পাঁচকড়ি মজঃফরপুরের ষ্টেশন হইতে যাঁহাদিগের সহিত কলিকাতায় গিয়াছিল—তাঁহারা সকলেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র। পাঁচকড়ির সহিত আলাপ আপ্যায়িতে এবং পাঁচকড়ির গানে তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পাঁচকড়িকে আপনাদের বাটীতে কিছুদিন রাখিয়া, তৎপরে পাথেয়স্বরূপ কুড়িটি টাকা দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। পাঁচকড়িও তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতায় কিছুদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করিয়া বাড়ী ফিরিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া পাড়ার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, পাঁচকড়ি তাহাকে শচীর কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং সে ভাল আছে শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল।

পাঁচকড়ি হন্ হন্ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল এবং প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"শচী।"

শচী উত্তর দিল না। পাঁচকড়ি পুনরপি ডাকিল। নিস্তার বাহির হইয়া বলিল—"কে ছোটবাবু, বাড়ী এসেছো! শচী ঘুমিয়েছে। চল চল—কর্ত্তা-মা এই তোমার কথা ব'ল্‌ছিলেন।"

পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"মেজ-বউ কোথায়?"

গৃহমধ্য হইতে মেজ-বউ সে দৃশ্য দেখিয়া দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিস্তারকে যথোচিত ভৎ'সনা করিলেন ও তৎক্ষণাৎ শচীকে লইয়া তাঁহার নিকট দিবার জন্য আদেশ করিলেন।

নিস্তার নাকি-সুরে বলিতে লাগিল—"দাও বাবু, খোকাকে শীগগীর নামিয়ে দাও। ওমা, কাকার কোলে ছেলে দিলে এমন হবে, তা জান্‌লে কোন চোক্‌খাগী দিত!"

পাঁচকড়ি তথাপি চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু মেজ-বউ তখন নিস্তারকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ছেলে দাও ব'ল্‌চি, নতুবা একটা বিদিকিচ্ছি কাণ্ড হবে। আমি ও সব নেকামি বুঝি না।"

নিস্তার গিয়া শচীকে চাপিয়া ধরিল। শচী কিছুতেই ছোট-কাকার ক্রোড় হইতে নামিবে না। নিস্তারও ছাড়িবে না। সে বলপ্রকাশে টানিয়া লইল। শূন্যবুকে পাঁচকড়ি মাতার নিকটে ফিরিয়া গেল। শচী নিস্তারের কোলের উপর কাঁদিয়া আছাড় খাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিবস সন্ধ্যার পর পাড়ার বিষ্ণুচন্দ্র সরকার আসিয়া যতীশচন্দ্রের গৃহ-দাবায় উপবেশন করিলেন। তিনি সম্পর্কে যতীশচন্দ্রের খুল্লতাত। বিষ্ণুচন্দ্র পাড়ার মুরুব্বি ও সম্ভ্রান্ত লোক।

যতীশচন্দ্র তামাকু সাজিয়া, একটা আম্রপত্রের নল করিয়া হুঁকার মুখে লাগাইয়া, তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।

বিষ্ণুচন্দ্র হুঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন—"আর ক'দিন বাড়ী আছ?"

যতীশ। বোধ হয় কালই যাব।

বিষ্ণু। এখন কি সেখানে অধিক কাজ আছে?

যতীশ। হাঁ—প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল, এখন একপ্রকার মিটমাট

হইয়া গিয়াছে—কবুলতি লওয়া, বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি অনেক কাজ পড়িয়াছে।

বিষ্ণু। এবার বোধ হয়, এই সূত্রে তোমার কিছু রোজগারও হইয়াছে?

যতীশ। সামান্য!

বিষ্ণু। এরূপস্থলে কর্ম্মচারীদের কিছু হয় বৈ কি! যাক্, আমি তোমাকে কতকগুলি কথা বলিতে আসিয়াছি—বৌ কোথায়?

'বৌ' অর্থে যতীশের মাতা।

যতীশচন্দ্র বলিলেন—"তিনি বড় এদিকে আসেন না। বোধ হয় রান্নাঘরে আছেন।"

বিষ্ণু। একবার ডাক ত—তাঁর সম্মুখে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।

যতীশচন্দ্র, নিস্তারকে ডাকিয়া বলিলেন—"কাকার নাম ক'রে মাকে ডেকে আন ত।"

নিস্তার চলিয়া গেলে, পার্শ্বের জানালার ধারে আসিয়া মেজ-বউ দাঁড়াইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই যতীশের মাতা আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন এবং বিষ্ণুচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরপো কি আমাকে ডেকেছ?"

বিষ্ণুচন্দ্র হাতের হুঁকা পার্শ্বের দেওয়ালে হেলান দিয়া রাখিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ বৌ, ডাকিয়াছি; অনেকদিন তোমাদের সংসারের খবর-টবর লই নাই—পরস্পর অনেক কথা শুনি, তাই একবার এলাম।"

যতীশচন্দ্রের মাতা বলিলেন—"জগতে তেমন লোক আমাদের আর নাই! সংসারের খবর শুনিয়া কি করিবে ঠাকুরপো? এখন আমার মৃত্যু হইলেই হাড় জুড়াইত!"

তাঁহার চক্ষু পূরিয়া জল আসিল।

বিষ্ণুচন্দ্র, যতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দানীশের কোন সংবাদ পাইয়াছ?"

যতীশ। কি জানি, পেঁচো সেখানে গিয়েছিল—কাল এসেছে। আমি সব শুনিও নি।

বিষ্ণু। কেন, তোমার ভাই—বিশেষ আর এক ভাই সেখান হইতে আসিল—তুমি কোন খবরই লইলে না?

যতীশ। আমি আর ওসব খবরের মধ্যে নাই।

বিষ্ণু। কেন, যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সংসারের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়াছ না কি?

যতীশ। প্রায় তাই—আমি সাতেও নাই, পাঁচেও নাই। দু'এক দিনের জন্য বাড়ী আসি, দুটো খাই—আবার চলিয়া যাই।

বিষ্ণু। কোথায় খাও? তোমার মায়ের নিকট?

যতীশ। না!

বিষ্ণু। তবে? স্ত্রীর কাছে?

যতীশ। হুঁ।

বিষ্ণু। কেন?

যতীশ। কি করি?

বিষ্ণু। কি করি কেন? যদি স্ত্রী, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একত্রে থাকিতে অস্বীকার করে, পৃথক হোক্—তাহাকে মাসিক বৃত্তি দাও—তুমি মায়ের ছেলে মায়ের কাছে থাক না কেন?

যতীশচন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন—"তোমার মা কি খান?"

যতীশ। আমি মাসে পাঁচ টাকা দিব।

বিষ্ণু। গুদামভাড়া? ভাল,—তোমার ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য সকলে কি খায়?

যতীশ। আমি জানিব কি প্রকারে? সকলের সঙ্কুলান করা আমার অবস্থায় কুলায় কি?

বিষ্ণু। ছিঃ ছিঃ যতীশ! কথাটা মুখে আনিতে তোমার লজ্জা করিল না! কুলায় না বলিয়া তাহারা শুকাইয়া মরিবে—আর তুমি ও তোমার স্ত্রী সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে, খাইবে, পরিবে? যাহা আন, তাহাই ভাগ করিয়া খাও—একবেলা সকলে উপবাস দাও, একবেলা খাও, তাই ত হিন্দুর ছেলের কাজ।

যতীশ। তাই ত হইতেছিল।

বিষ্ণু। বন্ধ হইল কেন?

যতীশ। একটা লোককে সকলে মিলিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিল; একটু সহ্য করিয়া গেলেই কোন গোল হইত না।

বিষ্ণু। সে একটা লোক কে? তোমার স্ত্রী বোধ হয়? তা' একটু সহ্য করিয়া যাওয়ার উপদেশ অপরকে না দিয়া, তাঁহাকে দিলে না কেন? তিনি তোমার স্ত্রী—অপরের উপর অপেক্ষা তাঁহার উপর তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

যতীশচন্দ্র কথা কহিলেন না।

বিষ্ণুচন্দ্র পুনরায় বলিলেন—"আমি শুনিলাম, কাল পাঁচু আসিয়া তোমার ছেলেকে কোলে লইয়াছিল, কিন্তু মেজ-বৌমা তাহা লইতে দেন নাই। পাঁচু তাহাতে প্রাণে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছে।"

যতীশ। তা' যার ছেলে, সে যদি নাই নিতে দেয়, তবে অত কাড়া-কাড়িই বা কেন?

বিষ্ণুচন্দ্র বিদ্রূপের উচ্চ হাসি হাসিলেন। গম্ভীর অথচ বিকৃত-স্বরে বলিলেন—"যতীশ, তোমাকে আগে মানুষ বলিয়া ধারণা ছিল; আজ জানিলাম, তুমি একটা বানর! যাক্, আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি শোন।"

যতীশ। কি বলুন?

বিষ্ণু। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, এবার তোমার মহালের এই গোলযোগে তুমি প্রায় দুই তিন হাজার টাকা উপরি রোজগার করিয়াছ—কেমন, সত্য কিনা ?

যতীশ। আজ্ঞে না। ওটা কি জানেন—পরের ধন সকলেই বেশী দেখে !

বিষ্ণু। না হোক, কিছু কম হবে। কিন্তু তোমার মাকে তাহা হইতে পাঁচশত টাকা দিতে হইবে। উনি সে টাকায় পাঁচুর দ্বারা লাঙল করাইয়া, ব্যবসা করাইয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

যতীশ। আজ্ঞে এত টাকা—

বিষ্ণু। এ তোমাকে দিতেই হইবে।

যতীশ। আমি এ কথার ত্তর আজ দিতে পারিলাম না—কাল দিব।

"ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু আমার কথার উত্তর এবং কথিত টাকা না দিয়া, কাল যেন চলিয়া যাইও না!"—বলিয়া বিষ্ণুচন্দ্র দাবা হইতে নামিয়া গেলেন।

যতীশচন্দ্রের মাতাও ধীরে ধীরে রন্ধন-গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যতীশচন্দ্র গৃহমধ্যে গমন করিলেন—মেজ-বৌও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন; তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে রক্তমুখে বলিলেন—"যত খোসামুদে মিন্সেরা আসেন, কেবল ওদের দাও—টাকা যেন গাঙের জল।"

যতীশচন্দ্র পশ্চাৎ ফিরিয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি সব শুনিয়াছ না কি ?"

নথ নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া গৃহিণী বলিলেন—"শুনব না কেন? যেমন গাঁ, তেমনি ভদ্রলোক—তেমনি বিচার!"

যতীশ। সে কথা ঠিক! এখন বিষ্ণুকাকা যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার কি?

গৃহিণী। কি, টাকা দেবার কথা?

যতীশ। হাঁ।

গৃহিণী। এক পয়সাও না! টাকা আমাদের, আমরা দিব কেন? না দিলে উনি কি করিবেন?

যতীশ। কি আর করিবেন; কিন্তু—

গৃহিণী। কিন্তু কি? দিবে? তা দাও—আমার শচীর হাতে টুকনি দাও। তুমি কি আমার কচি ছেলের কথা একবারও মনে ভাব না? ও আমার কি খেয়ে মানুষ হবে? আমি এক পয়সাও দেব না, দেব না, দেব না,—তা যাই ক।

যতীশ। শোন বলি,—দশেও নিন্দা করিতেছে, একটু ধর্ম্মেরও হানি হইতেছে। এবার প্রায় তিন হাজার টাকার উপর আনিয়াছি—তাহা হইতে শো তিনেক টাকা দাও। তাই লাঙ্গল গরু করিয়া পেঁচো একরূপ চালাক।

গৃহিণী। এক পয়সাও না।

যতীশ। আহা, ওদের বড় কষ্ট হইয়াছে। পেঁচোর কথা শুনিয়া তখন বাস্তবিকই আমার প্রাণ বিচলিত হইয়াছিল—

গৃহিণী। ওরে আমার দয়ার সাগর রে।—না, আমি এক পয়সাও দিব না। আমার শচীকে এক মুঠা মুড়ী দিবার লোক নাই। আজ যদি ওরা রাজা হয়, আমার শচীর কি! শচী আমার যে কাঙালের ছেলে সেই কাঙালের ছেলেই থাকিবে। তুমি একটী পয়সাও বাজে খরচ করিতে পারিবে না।

যতীশচন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—কথা মিথ্যা নয়—আজ যদি আমি মরিয়া যাই, বা ব্যারামে পড়ি শচীকে কে দেখিবে?

তবে ওরা বড় কষ্টে পড়িয়াছে—আমার সিন্ধুকে টাকা বোঝাই, অথচ আমার মা ভাই এক মুঠা অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে! কিন্তু কি করিব গৃহিণী যাহা বলে, তাহাও মিথ্যা নয়—শচী আমার কি খাইয়া মানুষ হইবে।

পার্শ্বের কুঠারীতে শচী নিদ্রা যাইতেছিল—সে এই সময়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বামী-স্ত্রীতে ছুটিয়া তাহার নিকটে গমন করিলেন।

সে গৃহে একটি মৃৎ-প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে ক্ষীণ আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয় নাই। শচী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ও বাবা! উহুঁ—দ'লে গেল, পুলে গেল। আমাকে মিনি কাম্‌লে দিয়েচে!"

'মিনি' শচীর পোষা বিড়াল। শচী আকুলভাবে কাঁদিয়া সমস্ত গৃহ মুখরিত করিল! সে ভীষণ যাতনার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ!

যতীশচন্দ্র তাহাকে ক্রোড়ে তুলিযা লইলেন এবং আলোর কাছে লইয়া দেখিলেন পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গোড়ায় কামড়ের দাগ—ঝর্ ঝর্ ধারায় রক্ত ঝরিতেছে!

ছেলে ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিল। মুখ চোখ নীলবর্ণ হইতে লাগিল। যতীশচন্দ্র বলিলেন—"দেখ ত বিছানায় বিড়ালটা আছে কি না!"

মেজ-বৌ তাড়াতাড়ি প্রদীপ লইয়া শয্যাপার্শ্বে গেল এবং নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল—কৈ, বিছানায় ত বিড়াল নাই। তক্তপোষের নীচে দেখিল—দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এক ভীষণ বিষধর সর্প তক্তপোষের পায়ে জড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছে।

যতীশচন্দ্র তাহা দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সর্পদষ্ট পুত্র ক্রোড়ে করিয়া বাহির হইলেন। মেজ-বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

যতীশচন্দ্র বাহির হইয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"পেঁচো, পেঁচো, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে রে! শচীকে সাপে কামড়েছে!"

পাঁচকড়ি পাড়া হইতে আসিয়া চিঁড়া ও গুড় খাইতে বসিয়াছিল। সে গালের চিঁড়া দূরে ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ওঝা ডাকিতে বাগ্দী পাড়ায় ছুটিয়া গেল।

বামা-বাগ্দী সাপের বড় ওঝা—পাঁচকড়ি তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল। কিন্তু তখন শচীর দেহে প্রাণ ছিল না—শচী পাখী তখন শিকলি কাটিয়া কোন্ অজানা দেশের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর সকলে তাহার পার্শ্বে পড়িয়া আছাড় খাইয়া খাইয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু হায়! যে যায়, সহস্র ক্রন্দনেও সে আর ফিরিয়া চাহে না।

পাড়ার দশজন আসিয়া জুটিল এবং স্নেহ-করুণার আধার শচীর কচি-দেহ তাহার পিতা, মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া, শ্মশানে ফেলিয়া আসিল।

সর্পদষ্ট-দেহ আগুনে দিতে নাই—জলে ভাসাইতে নাই, শ্মশান-তটে রাখিয়া আসিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তখনও নিশার অন্ধকার পৃথিবী-তল পরিত্যাগ করে নাই। আকাশের গায়ে প্রভাহীন দুই চারিটী তারকা তখনও বিরাজ করিতেছিল। তখনও নিশাচর জীবগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিল।

এই সময় পাঁচকড়ি ব্যথিত-বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া শ্মশান-তটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বুঝি শচীকে খুঁজিতে আসিয়াছিল—গতরাত্রে সে দেহ যে,এইস্থানে ফেলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কোথায়? সর্ব্বত্র শূন্য!

শ্মশান-তট ধৌত করিয়া নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। শূন্য-বায়ু হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে! দূরে দূরে শবভুক্ শৃগাল-কুক্কুর কলরব করিতেছে। 'শচী—প্রাণাধিক শচী, কত দীর্ঘ দিন যে তোমায় কোলে

লই নাই বাপু!—একবার কি আসিবে না? বুক যে একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে।' কেহ তাহার উত্তর করিল না—কেহ সে কথা কানে তুলিল না।

পাঁচকড়ি এত ডাকিল, তবু কেহ সাড়া দিল না। তখন তাহার মনে হইল,—শচীহীন জগতে থাকিয়া কি লাভ! সে সংসার ত্যাগ করিয়া গেল—আমরা কি পারি না? ঐ যে জলরাশি, উহার তলে শয়ন করিলে সকল জ্বালা কি শীতল হয় না!

"তবে শচী,—প্রাণের শচী, একবার দেখা দিয়ে যা। একবার কোলে উঠে যা, তোকে কোলে নিতে দেয় নাই।"

ঠিক এই সময় পাঁচকড়ির পশ্চাতে কে একজন আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে পাঁচকড়ি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই; তার পরে চিনিল—সে তাহার মেজদাদা।

"তার মা যে তোকে কোলে নিতে দেয় নাই!—প্রাণাধিক ভাইরে —এত ভালবাস্‌তিস্? আয় ভাই, আজ আমরা এক তীর্থের যাত্রী; এক দেবতার দর্শনার্থী। আর ও কথা তুলিস্ নে।"

যতীশচন্দ্র ভ্রাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন! পাঁচকড়িও কাঁদিতে লাগিল।

তারপরে দুই ভ্রাতায় বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

যতীশচন্দ্র, মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন—"যার জন্য সঞ্চয় করিতে-ছিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে! বুঝি তাহার কাকা-কাকীদের ফাঁকি দিতেছিলাম—বুঝি তাহাকে একা ভোগ করিব বলিয়া বিভাগ করিতে-ছিলাম—তাই সে বংশের তিলক, সকলের নিধি, আমার একার হইয়া থাকিল না; আমারই পাপে চলিয়া গেল। আর না মা, আজ পেঁচোকে ও আমাকে একত্রে ভাত দাও, খাইয়া জন্মের মত যেখানে চাকুরি করি, সেই স্থানে চলিয়া যাই—যাহা পাইব, মাসে মাসে পাঠাইয়া দিব। শচীহারা বাড়ীতে আর ফিরিব না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যতীশচন্দ্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে তিন-চারি দিন চাকুরীস্থলে যাইতে দিলেন না।

এই তিন-চারি দিন মধ্যে তাঁহাদের সংসারের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

যতীশচন্দ্র আর পৃথক্ থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। মেজ-বৌ পুত্র-শোকে উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও আর সে বিষয় লক্ষ্য করিলেন না! তখন সকলেই আবার পূর্ব্ববৎ একান্নবর্ত্তী হইলেন। ন-বৌ প্রাণপণে পুত্রশোকাতুরা মেজ-জায়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

শচীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া মেজ-বৌএর বিধবা ভ্রাতৃবধূ, তাঁহার পঞ্চ বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক পুত্র রামসেবককে লইয়া, সেদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যতীশচন্দ্র গৃহমধ্যে বসিয়া পুত্রশোকাতুরা পত্নীকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার শ্যালক-পত্নী ও শ্যালক-পুত্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুত্রহারা রমণী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রামসেবেকের মাতাও চক্ষে অঞ্চল প্রদান করিলেন।

মেজ-বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বৌ, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে; আমার ঘর শূন্য—কোল শূন্য—বুক শূন্য!"

রামসেবকের মাতা বহুপ্রকার উপমা ও পৌরাণিকা কথার অবতারণা করিয়া, ননদকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন এবং তৎপরে উপসংহারে রামসেবকের হাত ধরিয়া টানিয়া, তাঁহার ক্রোড়-সমীপে বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"উদর আর সহোদর বিভিন্ন নয়, তোমার ভাইয়ের ছেলে—একেই নিজের ব'লে কোলে নাও, আজি হ'তে তোমার, আমার নয়।"

মেজ-বৌ সে কথার আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন না। যতীশ-চন্দ্র বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। নিস্তারিণী আসিয়া রামসেবককে আর রামসেবকের মাতাকে রান্নাঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

আহারের সময় যতীশচন্দ্র মাতাকে বলিলেন—"মা, যাহা অদৃষ্টে ছিল হইয়া গেল। আমি আর শচীশূন্য বাড়ীতে স্থির থাকিতে পারিতেছি না; সেজন্যও বটে, আর মহালের নানাবিধ গোলযোগ সেজন্যও বটে;—আজ শেষরাত্রে চলিয়া যাইব—হাঁটিয়াই যাইব, কারণ, আমাকে ম্যানেজারের বাড়ী হইয়া যাইতে হইবে; তিনি বাড়ী আসিয়াছেন।"

মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে আস্‌বি আবার?"

যতীশ। তা' এখন বলিতে পারি না। বোধ হয় আর আসিব না।

মাতা। বালাই! অমন কথা মুখে আনিস্‌ না।

যতীশ। পূজার মধ্যে আর আসা হইবে না। কাহার জন্যই বা আসিব? সে নাই—যাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিত! এখন একটা কথা বলিয়া যাই।

মাতা। কি বল্‌।

যতীশ। পেঁচোর একটা বিবাহের যোগাড় কর। আমার আশা আর করিও না—বুক ভাঙিয়া গিয়াছে। ক্ষিতীশকে বাড়ী আনাইবার চেষ্টা দেখ। রামসেবক আর রামসেবকের মা আসিয়াছে,—বোধ হয় শীঘ্র যাইবে না। সেজন্য তোমরা কিছু বলিও না, আর আমার সঞ্চয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই—যাহার জন্য সে আয়োজন, সে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। এখন আমি মাসে মাসে যাহা পাইব, তাহার দ্বারাই সংসার চলিয়া যাইবে।

মাতা। তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে, তাহাই হইবে তবে অত উতলা হইও না—সকলই ভগবানের হাত।

যতীশ। ভগবানের দোষ কি মা? সবই জীবের কর্ম্মফল

পুত্রশোক-সন্তপ্ত যতীশচন্দ্র গৃহিণীকে বুঝাইলেন—"আর না—সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জীবনের বাকি গণা দিন কটা কাটাইয়া দাও।"

মেজ-বৌ তাহাতে অস্বীকৃত হইল না।

তারপর শেষরাত্রে উঠিয়া যতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে ডাকিলেন। বলিলেন—"যতক্ষণ ভোর না হয়, আমার সঙ্গে চল। ভোর হইলে, তুই ফিরিয়া আসিস্। একটু রাত্রি থাকিতে না গেলে, রৌদ্রে কষ্ট পাইতে হইবে।"

পাঁচকড়ি, মোটা একগাছা বাঁশের লাঠি লইয়া দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দুই ভ্রাতাই নীরব—দুই ভ্রাতাই হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ বেদনা লইয়া পথ বাহিয়া চলিয়াছে।

ক্রমে তাঁহারা গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে উপস্থিত হইলেন। মাঠ ছাড়াইয়া নদীতীরের পথে পড়িলেন।

বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে যতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে বলিলেন—"তবে তুই ফিরিয়া যা। ভোর হইয়া আসিল, আমি চলিলাম! সকলই থাকিল—যাহা রোজগার করিব মাসে মাসে পাঠাইয়া দিব।"

রুদ্ধকণ্ঠে, সকরুণ-কাতরস্বরে পাঁচকড়ি বলিল—"আমার কাছে! আমি সংসারের গুরু-ভার বহনে অক্ষম। বাড়ীতে থাকিলে—শচীহীন বাড়ীতে থাকিলে বাঁচিব না। আমাকে না দাদা—তুমি কর্ত্তা—তুমি দাদা, যাহা হয় করিও। আমি শীঘ্রই বাড়ী হইতে পলাইব।"

যতীশচন্দ্রের পুত্রশোক-সন্তপ্ত হৃদয় অনুতাপের উষ্ণ অশ্রুতে গলিয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"পাঁচু, ভাই! ভগবান আমার শচীকে কাড়িয়া লইয়া, আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন—বুঝাইয়া দিয়াছেন—যাহা কর্ত্তব্য—যাহা করিতে হয়, তাহা কদাচ ভুলিও না। ভুলিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। না ভাই, কোথাও যাস্ নি,—আমি তোর উপরে অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, শচীকে তোর কোলে দিতে দেয় নাই, তাহা শুনিয়াও প্রতিকার করি নাই—অধিকন্তু

তাহার মতেই মত দিয়াছি। আমার অপরাধ—সেই গুরু অপরাধ, ক্ষমা করিস্।” অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে রুদ্ধস্বরে যতীশচন্দ্র এই কথা বলিলেন।

“ক্ষমা—ক্ষমা কি দাদা? আমি তোমার ছোট ভাই।”—পাঁচকড়ি আর কথা কহিতে পারিল না। তার কম্পিত দেহখানি বাহু-বেষ্টন করিয়া যতীশচন্দ্র তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

তার পরে অশ্রুভারাকীর্ণ নয়নে দুই ভাই দুই দিকে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রভাতের রৌদ্র অত্যন্ত উগ্র হইবার পূর্ব্বেই পাঁচকড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সমস্ত বাড়ীখানা যেন শচীর অভাবে হাহাকার করিতেছিল। বাড়ীর বৃক্ষলতাগুলাও যেন শচীর জন্য ম্লানমুখে কালযাপন করিতেছিল।

পাঁচকড়ি বাড়ী আসিয়া, মেজ-বৌ-এর নিকট গমন করিল। তিনি তখনও শুইয়া ছিলেন। করুণস্বরে ডাকিয়া বলিল—“বৌ, ওঠ; কাঁদিয়া ফল নাই, দেহপাত করিলেও সে মাণিক আর মিলিবে না;—যদি মিলিত পাঁচকড়ির নিরর্থক দেহ দানে এতক্ষণ সে কার্য্য সাধিত হইত!”

মেজ-বৌ উঠিয়া বসিলেন। উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন—“সে যে তোমার জন্য ছুটিয়া যাইত, আমি হতভাগিনী তাহাকে যাইতে দিই নাই। তাই বুঝি—সেই রাগে, সে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।—শচী! ফিরে আয় বাবা, তোর ছোট কাকা তোর ঘরে এসেছে। আর আমি তোকে বাধা দেব না বাবা—একবার ফিরে আয় বাবা।”

কেহ সে কথার উত্তর করিল না! কেবল পাঁচকড়ির চক্ষু বাহিয়া প্রবল জলস্রোত বহিল—সে কোঁচার কাপড়ে চক্ষু ঢাকিল।

রামসেবকের মা তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাঁচকড়িকে বলিলেন—“ও কি গো, এখন কি অমন ক’রে কাঁদতে আছে। যা’তে ভুলে যায়, কোথায় তাই ক’র্‌বে, না আরও সেই সব কথা মনে জাগিয়ে

দিয়ে কাঁদাচ্ছ ? রামা—রামা, আয়, তোর পিসার কাছে আয়—তোকে দেখে তবু প্রাণটা একটু জুড়াবে এখন। যাও গো, তুমি এখন বাইরে যাও।”

পাঁচকড়ি চলিয়া গেল।

সেই দিবস ব্যবস্থা হইল, রামসেবক ও রামসেবকের মাতা স্থায়ীভাবে সেই বাড়ীতে থাকিবেন। রামসেবক তাহার পুত্রহারা পিসীমাতার পালক-পুত্র হইবেন।

পাঁচকড়ি তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। পাঁচকড়ির মাতা বা অন্য কেহই সে কার্য্যে প্রীতিলাভ করিলেন না। তবে মেজ-বউএর ব্যবস্থার উপর কথা কহে, এমন কেহ বাড়ীতে ছিল না।

এই ঘটনার পনর দিন পরে, পাঁচকড়ি দানীশের এক পত্র পাইল। পত্র কলিকাতা হইতে আসিয়াছে।

দানীশ লিখিয়াছে—

“অনেক দিন তোমাদের পত্র পাই নাই। পরম্পর শুনিলাম, দাদার ছেলেটি মারা গিয়াছে—বড় দুঃখের বিষয়। কিন্তু নিয়তির উপরে মানুষের হাত নাই। আমি এযাবৎ খরচ পাঠাইতে পারি নাই,তাহার অনেক কারণ আছে—জীবনের উপর দিয়া অনেক আপদ বিপদ চলিয়া গিয়াছে। আমি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। এখানে একটি বড় রকমের ডাক্তারখানা খুলিয়াছি। একা সকল কাজ দেখিতে পারি না। বাড়ীতে তোমারও বিশেষ কোন কাজ নাই। পত্রপাঠ এখানে আসিবে। তুমি থাকিলে কাজ কর্ম্মের খুব সুবিধা হইতে পারিবে। পরের উপরে বিশ্বাস করা যায় না; তোমার উপর ভার দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। বাড়ীর খবর লিখিও। ইতি।—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীদানীশ।”

পাঁচকড়ি পত্র পড়িয়া সকলকে শুনাইল। মেজ-বউ ভাল-মন্দ কোন উত্তর করিলেন না। সংসারের কোন বিষয়েই তিনি ছিলেন না—পুত্র-শোকাতুরা জননীকে কেহ সে বিষয়ে লিপ্ত করিতেও চেষ্টা করিত না।

পাঁচকড়ির মাতাও শচীর শোকে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে সকল দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এত শোকদুঃখের মধ্যেও সংসার যদি পুনর্গঠিত হয়, এই নব-আশায় বুক বাঁধিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—"ছেলেটার স্কন্ধ হইতে যদি অপদেবতা নামিয়া থাকে, তবু ভাল! তুই যা। মজঃফরপুর ছেড়েছে, এখন বোধ হয়, ভাল হইবে।"

ন-বউ কত দেবতার নিকটে কত প্রার্থনা করিল—কত পূজা মানিল, মা-কালীর পায়ে বুক চিরিয়া রক্ত দিব বলিয়া কামনা করিল। পাঁচকড়ির কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল। পাঁচকড়িও শচীহীন বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া স্থির হইতে পারিবে ভাবিয়া আগ্রহসহকারে সেই দিন রাত্রের গাড়ীতেই কলিকাতায় রওনা হইল।

পাঁচকড়ি যখন বাড়ী হইতে যাত্রা করিতেছিল, তখন ন-বউএর বড় ইচ্ছা করিতেছিল, বলিয়া দেয়—"একবার যেন তিনি একদিনের জন্যও বাড়ী আসিয়া দেখা দিয়া যান।" কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিল না, হৃদয়ের কথা হৃদয়েই রহিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক্ষিতীশচন্দ্রের কাহিনীটা এই সময় একবার বলিতে হইল।

রামপুরের বাজার তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। মাসিক ছয় টাকা বেতনের জন্য প্রত্যহ বেলা সাড়ে নয়টার সময় তথায় গমন করেন এবং রাত্রি আটটার পরে বাড়ী ফিরিয়া আইসেন। প্রত্যূষে উঠিয়া শ্যালকের আবাদের জমি তত্ত্বাবধানের জন্য মাঠে মাঠে ঘুরিতেন—তার পরে স্নান

করিয়া কোন দিন উষ্ণান্ন, কোন দিন পর্য্যুষিতান্ন এবং কোন দিন বা জলযোগ করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া যাইতেন।

আজ রামপুরের হাট। সপ্তাহে দুই দিন এই হাট বসে। হাটের দিন তরীতরকারী, মৎস্য, দাইল, চাউল প্রভৃতি দ্রব্য সে বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে এবং নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক সকল কয়দিনের মত প্রয়োজনীয় মাছ তরকারী ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে। প্রত্যহ বাজার বসে না, তবে দোকান থাকে, অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

রাত্রি প্রায় নয়টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ; টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

সেই সময় স্কন্ধে একটা তরকারীর মোট, হস্তে একটা মৎস্য, বগলে কতকগুলি রজতধৌত বস্ত্র লইয়া অতিশয় ক্লান্তদেহে ক্ষিতীশচন্দ্র রামপুরে হাট করিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিযা উপস্থিত হইলেন।

হরিচরণ তখন বাড়ীর মধ্যে বসিয়া মাতা ও ভগিনীদিগের সহিত খোস্-গল্প করিতেছিলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র নগ্নপদ—কর্দ্দমে সমাচ্ছন্ন ; পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্র ও মস্তক—সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। সে মূর্ত্তি যদি ক্ষিতীশের মাতা ও ভ্রাতারা দেখিতেন, তাঁহাদের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত ; কিন্তু হরিচরণ হাসিয়া ফেলিলেন। হরিচরণের মাতাও হাসিলেন। ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন —"আ, আবাগীর বেটা, একরত্তি বুদ্ধিও ধর না।"

ক্ষিতীশের স্ত্রী ভ্রূকুটী করিয়া একটু সরিয়া বসিলেন। কিন্তু কেহই সে ভার নামাইল না—ক্ষিতীশচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। সেগুলি অতি কষ্টে নামাইতে নামাইতে করুণ ব্যথিত-স্বরে বলিলেন—"মা দুর্গে, তোর মনে আরও কি আছে, মা!"

হরিচরণ হাসিয়া বলিলেন—"কি হে, নিদেন ডাক কেন?"

ক্ষিতীশচন্দ্র বিরক্ত-স্বরে বলিলেন—"অবস্থা যখন নিদেন, তখন নিদেন ডাক ভিন্ন আর কি হইবে বল?"

হরি। তুমি নিতান্ত বোকা, তাই এত রাত্রি করিয়া কষ্ট পাইয়াছ। ও কি, পায়ে কি?

ক্ষিতীশ। অন্ধকারে একখানা ইটে হুঁচোট্ লাগিয়া আঙুলের আগাট্ ছিঁড়িয়াছে।

হরি। আহা, তামাক খাবে?

ক্ষিতীশ। খাব বৈকি—রও, আগে দম নেই!

হরি। কি কি আন্‌লে?

ক্ষিতীশ। মাছ, পটল, আলু, সব এনেছি।

হরি। আমার তা?

"আমার তা" অর্থে "অহিফেন।" হরিচরণ একটু একটু অহিফেন সেবন করিতেন।

ক্ষিতীশ। আনিয়াছি, কিন্তু অল্প।

হরি। কতটুকু?

ক্ষিতীশ। সিকি ভরি।

হরি। এত কম কেন?

ক্ষিতীশ। পয়সায় কুলায় নি। এ মাসের মাইনে প্রায় আগেই লইয়া শোধ করিয়াছিলাম—তারপরে আজ যা সামান্য পাইলাম, হাট খরচেই গেল।

হরি। তোমার ঐ দোষ—আগেই সব খাইয়া বসিয়া থাক।

ক্ষিতীশ। ক্ষুধা বেশী।

হরি। ধোবাবাড়ীর কাপড়গুলা আনিয়াছ?

ক্ষিতীশ। হাঁ, আনিয়াছি।

হরি। একটু তামাক খাও—তামাক আনিয়াছ?

ক্ষিতীশ। আনিয়াছি—কিন্তু একটু রও, বুকটায় বেদনা ধরিয়া গিয়াছে। একটু পরে তামাক সাজ্‌চি।

হরি। অমন আল্‌সে কেন তুমি? আল্‌সে মানুষের কোন কালেই কিছু হয় না। তামাক সাজিয়া এক ছিলিম খাও, তার পর হাত পা ধুইয়া কাপড়-চোপড় ছাড়।

ক্ষিতীশচন্দ্র বুঝিলেন—হরিচরণের অহিফেনের মৌতাত ধরিয়াছে; এক ছিলিম তামাক সাজিয়া না দিলে অব্যাহতি নাই। অগত্যা তখনই তামাকু সাজিয়া নিজে একবার টানিয়া, হুঁকাটি হরিচরণের হাতে প্রদান করিলেন; পরে হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন।

শাশুড়ী বলিলেন—"আজ আমাদের সব ঘোষেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, তোমারও ছিল। তা' তুমি যেতে পার নাই। অবেলায় খেয়ে হরি বা শিবু কেউ রাত্রে খাবে না। একা তোমার জন্য আর রাত্রে রাঁধা যায় না—তুমি দু'টো চিঁড়ে খাও। কি বল?"

"তাই হবে!" ক্ষিতীশচন্দ্র মুখে এই কথা বলিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার জঠরানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল।

যথাসময়ে দুই মুষ্টি চিপিটক, অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ গুড় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া শয়ন-গৃহে গমন করিলেন।

সেজ-বউ গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আনিয়াছ?"

অতীব নম্র করুণ-স্বরে ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন—"না।"

"না? বেশ!" এই কথা বলিয়া সেজ-বউ এক লম্ফে শয্যার উপরে উঠিলেন এবং একটা বালিশ টানিয়া আছাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—"যম, তুমি আমাকে রাখিয়া উপোস্ কর কেন? না, আমার মত পোড়া-কপালীকে নিতে তোমারও অশ্রদ্ধা হয়? কত ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা যে আমি ক'রেছিলাম, তা ব'ল্‌তে পারি না। হা ভগবান্,—আমার পাপের কি শেষ নাই?"

এক নিশ্বাসে এ কটি কথার অবতারণা করিয়া সেজ-বউ শয্যার উপরে সটানভাবে শয়ন করিলেন।

অতিশয় কাতরভাবে ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন—"শোন, আমার কথাটাই শোন—আমার কোন অপরাধ নাই, আমার সঙ্গতি থাকিলে কি আমি তোমাকে একটা জামা আনিয়া দিতে নারাজ? কি করিব, বড় কষ্টে আছি; ভগবান্ যদি মুখ তুলিয়া চান, তবেই মনের দুঃখ যাবে, নচেৎ এ জীবনটাই বৃথা গেল।"

"আর আদরে কাজ নেই—খুব আদর হ'য়েছে! আমার পোড়া কপাল—আমি নেহাত বেহায়া, তাই তোমার মত লোকের কাছে জিনিস চাই"—এই বলিয়া সেজ-বউ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন।

ক্ষিতীশ বলিলেন—"কি করিব, মাসে ছয় টাকা মাহিনা পাই—তাহা হইতে হাট-খরচ আমাকেই করিতে হয়। আট হাটে আট টাকার কমে হয় না—তোমার দাদা একটি পয়সাও দেন না।"

পদদ্বয় পালঙ্ক বক্ষে আছাড় দিয়া, বিকৃত-স্বরে সেজ-বউ বলিলেন—"তুমি আসল কলি! দাদা আমাদের দুটো মানুষকে খেতে দিচ্ছেন, আর কোথায় তুমি এক পয়সার মাছ, দুটো বেগুন, কি একটা কাঁচকলা এনে মাথা কিনছ। তা বেশ—সে আর তোমায় করতে হবে না। তুমি তোমার চেষ্টা দেখ,—আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।"

অতঃপর সেজ-বউ ক্ষিতীশকে সে শয্যায় শুইয়া অনর্থক তাঁহার প্রাণে বেদনা দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। ক্ষিতীশও সাহস করিতে পারিলেন না!

ক্ষিতীশ শয্যায় স্থান না পাইয়া, কক্ষতলে বসিয়া অন্য কোন ভাল পুস্তক অভাবে নূতন পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়িতে লাগিলেন।

তার পরে সেজ-বউ নিদ্রিত হইলে, ক্ষিতীশ শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া কোনরূপে রাত্রি কাটাইয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যুষে উঠিয়া হরিচরণ ক্ষিতীশকে বলিলেন—"মাঠে মজুর যাইতেছে, কতক মজুরকে দক্ষিণ মাঠে, আর কতক মজুরকে হাজরাতলার মাঠে আইল বাঁধিতে দিয়া তুমি কাজে যাইও।"

ক্ষিতীশচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"দক্ষিণ মাঠে গিয়া মজুরদিগকে কাজ দেখাইয়া, বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আবার হাজরাতলার মাঠে গিয়া মজুরদের কাজের বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতে বেলা দুপুর হইয়া যাইবে, তার পরে কাজে যাইব কখন? এ কয়দিনই বেলায় যাইতেছি বলিয়া তাঁহারা বকিতেছেন?"

হরি। তাঁরা বকিলে আমি কি করিব? এ কাজও ত দেখা চাই। ছ'টাকায় ত আর দু'টো মানুষের খাওয়া চলে না!

ক্ষিতীশচন্দ্র সে কথায় আর কোন উত্তর করিলেন না। একখানি চাদর স্কন্ধে করিয়া বাটীর বাহির হইলেন।

বেলা দশটার পরে শ্রান্ত ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ণমুখে যখন ক্ষিতীশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে—হরিচরণের বড় ভগিনীপতি আসিয়াছেন।

তাঁহার নাম রাইচরণ দে; তিনি ঢাকার একটা পাটের কলের ওজন-সরকার। সে কার্য্যে অনেক চুরী, সুতরাং অনেক পয়সা রোজগার। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছে। দেখিতে কদাকার; লেখাপড়া গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় কিছুদিন করিয়াছিলেন মাত্র। লেখাপড়া যাহাই হউক, তিনি প্রচুর পয়সা উপার্জ্জন করেন, তাঁহার স্ত্রীর অঙ্গে অনেক অলঙ্কার, কাজেই তাঁহার সম্মানও সমধিক।

তাঁহাকে ঘিরিয়া অনেক নর-নারী উপবিষ্ট। তিনি হাসিমুখে সকলের সঙ্গে আলাপ-আপ্যায়িত করিতেছেন; হরিচরণের মাতা জামাতার আহারাদির উদ্‌যোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র আসিয়া তাঁহার পদে প্রণতঃ হইলেন। রাইচরণ ক্ষিতীশের বিষয় চিঠিপত্রে সমস্ত অবগত ছিলেন। একটু হাসিয়া, একটু ব্যঙ্গের স্বর বাহির করিয়া বলিলেন—"কি, ভায়া যে, কেমন আছ ?"

ক্ষিতীশ। আজ্ঞে, একরূপ আছি।

রাই। কোথায় গিয়েছিলে ?

ক্ষিতীশ। মাঠে। কতকগুলা মজুর পাওয়া গিয়াছে, তাই তাদের কাজ দেখাইতে গিয়াছিলাম।

রাই। তা বেশ—হরিবাবুর একটু সাহায্য করা ত চাই।

ক্ষিতীশ। আপনার বাড়ীর সব ভাল ?

রাই। ভাল।

ক্ষিতীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি হুঁকা লইয়া তামাক সাজিলেন; নিজে ধূমপান করিয়া—রাইচরণের হস্তে হুঁকাটি প্রদান করিলেন। তার পর তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া রান্নাঘরে গিয়া শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাত হইয়াছে ?"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া শাশুড়ী উত্তর করিলেন—"এর মধ্যে ভাত হয় কি প্রকারে ? জামাই এসেছে, দেখ্‌ছো না ?—তোমার গায়ে মানুষের চামড়া একেবারেই নেই বাপু।"

ক্ষিতীশ। আমাকে যে এখনি বাজারে যাইতে হইবে!

শাশুড়ী। তা' কি করিব ? এক দিন নয় নাই গেলে!

ক্ষিতীশ। একটা বড় জরুরী কাজ ছিল।

শাশুড়ী। তা' আর কি হইবে ? ভাত হইতে এখন অনেক দেরী। এই সবেমাত্র রাইচরণের সরু চাউলের ভাত চাপাইয়াছি! তার পরে মাছের ঝোল হইলে তোমাদের ভাত চড়িবে।

ক্ষিতীশ। সে এখনও অনেক দেরী! তবে আজ আর খাওয়া হইল না। জল খাইবার কিছু আছে কি ?

শাশুড়ী। না, তাড়াতাড়িতে মুড়ী ভাজা হয় নাই—একটু গুড় নাও, আর ঐ ঘটীটায় জল আছে, খাও।

ক্ষিতীশচন্দ্র গুড় ও জল খাইয়া চণ্ডীমণ্ডপে গমন করিলেন। সেদিন কাজে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইল; কারণ তিনি জানিতেন, সেদিন বিশেষ কতকগুলি কার্য্য আছে। কিন্তু যাইবেন কি প্রকারে? গতকল্য সেই দশটার সময় কয়টি অন্ন উদরে পড়িয়াছিল, ক্ষুধায় তাঁহার শরীর তখন কাঁপিতেছিল।

রাইচরণ স্নান করিয়া ক্ষীর-সর-নবনীত ও কয়েকটি গোল্লার যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আগমন করিলেন। হরিচরণও স্নান ও জলযোগ করিয়া সেখানে আগমন করিলেন। পাড়ার শ্যামাচরণ, হরিদাস ও বিমলকুমার সেইখানে আসিয়া জুটিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের উপরেই তামাক সাজিবার ভার পড়িল, তিনি তামাক সাজিয়া আনিলেন। তার পর তাস খেলা আরম্ভ হইল।

ঘণ্টা-দেড়েক পরে, রাইচরণ ও হরিচরণের আহারের ডাক পড়িল। ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমিও যাইব না কি?"

উত্তর হইল—"না! তোমার এখনও হয় নাই।"

ক্ষিতীশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া ম্লান-মুখ অন্য দিকে ফিরাইলেন। রাইচরণ ও হরিচরণ উঠিয়া বাটীর মধ্যে চলিলেন।

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্ষিতীশবাবুর আহার কখন হইবে?"

ক্ষিতীশ। যখন পাইব।

বিমল। বুঝতে পাল্লে না, চাক্‌রে জামাই এসেছে, তাঁর আহারের উদ্‌যোগটা একটু ভালরকম আছে—সম্বন্ধীবাবুর সেই সঙ্গে হবে, আর ইনি "গৃহপালিত" কি না, এঁর বুড়কীচালের ভাত এখনও হয় নাই।

শ্যাম। রাগ করিও না ক্ষিতীশবাবু! তুমি লেখাপড়াও জান, বংশ-মর্য্যাদাও তোমার যথেষ্ট, তুমি এখানে পড়িয়া থাক কেন? বাড়ীর ছেলে,

বাড়ী যাও—ভাই ভাইতে বনিবনাও না হয়, পৃথক হইয়া বাস করিও; কিন্তু এ কি! এমন করিয়া অপমান হও কেন? শ্বশুরবাড়ীর গোলামী কি এতই ভাল লাগিয়াছে?

ক্ষিতীশ সে কথার কোন উত্তর করিলেন না।

তার পর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রাইচরণবাবু হরিচরণবাবু আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। হরিচরণবাবু তখন ক্ষিতীশচন্দ্রকে বলিলেন—"যাও, তুমি আহার কর গে, হুঁকা কল্কিটা হাতে করিয়া যাও, একটু তামাক সাজিয় কল্কিটায় আগুন দিয়া বুড়ীকে দিয়া হুঁকা পাঠাইয়া দিয়া তুমি আহারে বসিও।"

অতি ম্লান-মুখে ক্ষিতীশচন্দ্র হুঁকা লইয়া বাটীর মধ্যে গমন করিলেন এবং আদেশ পালন করিয়া আহারে বসিলেন।

তাঁহার জন্য মোটা চাউলের অন্ন প্রস্তুত হইয়াছিল। মৎস্যটা কল্য বড় কষ্ট করিয়া এবং নিজে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া আনিলেও ক্ষিতীশচন্দ্র তাহার এক টুক্‌রাও পাইলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

রাত্রে আহারাদির পর ক্ষিতীশচন্দ্র শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন—দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইয়া গেল, তাঁহার স্ত্রী আসিল না। এখনও আসে না কেন? রান্নাঘরে আলো নাই, সকলেই কার্য্যাদি সমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ক্ষিতীশচন্দ্র বাহির হইলেন।

তাঁহার ঘরের পাশের ঘর হইতে স্ত্রী কণ্ঠের গীত-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। সে স্বর তাঁহার চির-পরিচিত, তাঁহার স্ত্রীর ক রব। জানালা উন্মুক্ত ছিল, চাহিয়া দেখিলেন, শয্যার উপর রাইচরণ অর্দ্ধশয়নাবস্থায়; পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার স্ত্রী একটী প্রেমগাথা গাহিতেছিল। তাঁহার তাহা ভাল লাগিল না।

কিন্তু স্ত্রীকে ডাকিতেও পারিলেন না, এমন যে অনেকেই গায়। তবে তিনি সে স্থান হইতে নড়িলেন না, আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার শাশুড়ীঠাকুরাণী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্ষিতীশকে আড়ি পাতিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধ-গম্ভীর-স্বরে অথচ অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"শোন ত বাপু।"

ক্ষিতীশ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে ডাকিয়া দ্রুতপদে তাঁহারই শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। ক্ষিতীশও ত্বরিত গমনে সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মুখখানা অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া শাশুড়ী বলিলেন—"ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিলে বাপু?"

ক্ষিতীশ। কিছুই না, বাইরে যাচ্ছিলাম, তাই একবার চেয়ে দেখলাম।

শাশুড়ী। ওরকম দেখ্‌তে নাই! ভগিনীপতির সঙ্গে শালীতে কত রকম করে, তা আবার আড়ি পেতে কোন্ পুরুষ দেখে?

ক্ষিতীশ। না মা, আমরা ত জানি, ভদ্র-কামিনীগণ বড় ভগিনীপতিকে দাদার মত এবং ছোট ভগিনীপতিকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি ও স্নেহ করিয়া থাকে। এসব আমাদের চক্ষে নূতন!

অতর্কিতে প্রসুপ্তা ভুজঙ্গিনীর গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, যেমন সে জাগরিত হইয়া মাথা তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠে, ক্ষিতীশের শাশুড়ী তেমনিভাবে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"আমরা সব বাজারে-বেশ্যা—তাই অমন করি! তোমার মা-বোন্ ভাল, আমরা অসতী!"

ক্ষিতীশচন্দ্র হাতযোড় করিয়া বিনয়-নম্রস্বরে কহিলেন—"মা, আমায় ক্ষমা করুন! আমি ত দূষ্য কিছুই বলি নাই। কেবল একবার চাহিয়া দেখিয়াছিলাম মাত্র।"

শাশুড়ীর ক্রোধ তাহাতে শান্ত হইল না। তিনি বলিলেন—"কেন তুমি দেখিবে? অমন অবিশ্বাসী প্রাণ তোমার মত মূর্খ লোকেরই হয়। ভাল সে যদি ঐ সময় তার ভগিনীপতির গায় টায় হাত দিত?"

ক্ষিতীশের হৃদপিণ্ডটা অস্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। শাশুড়ী তখন ক্ষিতীশের বংশ, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র হৃদয়ের সবিশেষ ব্যাখ্যা করিতে করিতে সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

বোধ হয় তিনি বাহির হইয়া কৌশলে কন্যাকে ডাকিয়া, ঐ সমস্ত কথা সালঙ্কারে শুনাইয়া দিয়া, তাহাকে গৃহে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। কারণ অনতিবিলম্বে আষাঢ়ের মেঘের মত মুখখানা অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া সেজ-বউ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং বৈশাখের ঝড়ের মত অনেকক্ষণ গোঁ গোঁ করিয়া, তার পর স্পষ্টভাবে ক্ষিতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ'য়েছে কি?"

ক্ষিতীশচন্দ্র মৃদু হাসিলেন। সে হাসি শুষ্ক—নিরানন্দের বিকট স্ফূর্ত্তিমাত্র। বলিলেন—"হবে আবার কি?"

সেজ-বউ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন—"তুমি কি দেখিতে গিয়াছিলে?"

ক্ষতীশ। আমার শ্রাদ্ধ।

সেজ-বউ। সেটা অচিরে হইলে মন্দ হয় না।

ক্ষিতীশ। আমিও ভগবানের নিকট নিত্য সে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু দুর্ভাগার কোন প্রার্থনাই বুঝি তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সেজ-বউ। বচনে খুব মজবুদ—সকল রকমে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। তোমার মত স্বামী যার—তার মত হতভাগী বুঝি পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মে নাই।

ক্ষিতীশ। সে কথা মিথ্যা নয়। তবে আমি করিয়াছি কি, আমার উপর এত জাতক্রোধ কেন?

সেজ-বউ। উঃ! 'ভাত দেবার কেউ নন,—নাক্ কাট্‌বার গোঁসাই'। নিজের ভগিনীপতি—তার কাছে বসে একটা কথা কইছিলাম, এর জন্য আড়িপাতা হ'য়েছিল, তার পর আবার আমার মাকে সেই জন্য যা ইচ্ছে তাই ক'রে বলা হ'য়েছে। কেন—অত কেন? আছ অন্নদাস হ'য়ে, আবার অত সব! কাণার ভ্রূকুটি ভাল লাগে না।

ক্ষিতীশ। আমি কোন ভ্রূকুটি করি নাই। অন্নদাস কেন, ক্রীতদাস—গোলাম হইয়া আছি। ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাই থাকিতে হয়। এ সব স্বকৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত বৈ ত নয়।

সেজ-বউ। তা' যে যেমন মানুষ, তার তেমনি থাকাই উচিত। যে যার নিজের কর্ম্মফল ভুগিবে না ত অন্যে ভুগিবে?

ক্ষিতীশ। তা ত বটেই! এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে; শোবে, না কি করবে?

সেজ-বউ। আমি শোব না।

ক্ষিতীশ। তবে যাও ভগিনীপতির কাছে গিয়া আর দু'টা গান গাহিয়া আইস।

ক্রুদ্ধা সিংহীর মত সেজ-বউ গর্জ্জন করিয়া বলিল—"তবে কি আমি গান গেয়েই বেড়াই?"

ক্ষিতীশচন্দ্র সেজ-বউএর হাত চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—"চীৎকার করিও না। আমায় ক্ষমা কর—আমি তোমাকে এমন কিছু বলি নাই। এখনই তোমার মা আসিয়া দশকথা শুনাইয়া দিবেন।"

সেজ-বউ। তবে এখানে থাক কেন? আমি মুখরা, আমার মা মুখরা, আমার দাদা কটুভাষী, আমরা সবাই মন্দ—তবে এ মন্দের মধ্যে থাকা কেন?

ক্ষিতীশ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, আর কথা বলা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। কারণ, ক্রমেই তাঁহার স্ত্রীর গলা সপ্তমে উঠিতে-

ছিল। সে শুনিয়া যদি শাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হন, তবেই মহা বিভ্রাট ঘটিবে। অতএব নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

সেজ-বউ অনেকক্ষণ বকিয়া বকিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

তৎপরদিবস মাঠ ঘুরিয়া আসিয়া ক্ষিতীশ যখন তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আহার করিতে গেলেন, তখন শাশুড়ী তাঁহার সম্মুখে একথালা পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিয়া বলিলেন—"জামাই বাড়ীতে, এত সকাল ভাত দিতে পারিব না বলিয়া, কাল রাত্রে ভাত রাঁধিয়া পান্তা করিয়া রাখিয়াছিলাম।"

প্রফুল্লমুখে ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন—"বেশ করিয়াছিলেন। কাল ভাত হইল না বলিয়া কাজে যাইতে পারি নাই।"

"ভাত অভাবে কাজে যাইতে পারি নাই।" এত বড় কথাটা শাশুড়ীর প্রাণে অসহ্য বোধ হইল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"শোন বাপু! তোমার কথাবার্ত্তা যেন চাষার মত—এর জন্যই তোমার সঙ্গে তোমার মা-ভাই-ভাজের বনিবনাও হয় না! কবে তুমি ভাত পাও নি? শেষে কি আমার ঐ কলঙ্ক রটাবে? আমার হরির কি ভাত নেই?"

ক্ষিতীশচন্দ্র বিনীত-স্বরে বলিলেন—"না—না, আমি তা বলি নাই। কাল দাদা আসিলেন বলিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া হইয়া উঠিল না, কি না।"

শাশুড়ী। এই দেখ, বাঁকাভাবে ভিন্ন তোমার কথা নাই। হাতের পাঁচটা আঙুলেই সমান ব্যথা। তোমার শরীরে অত হিংসে কেন বাপু! রাই এসেছে, তাই তোমাকে ভাত দেই নি। ওমা! লোকে শুন্‌লে আমায় কি ব'ল্‌বে। ভাত-কাপড় দিয়ে পুষে, এখন কি না এই কলঙ্ক। একেই বলে দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা।

যে কথা বলিতে যান, তাহাতেই বিপরীত ফল ফলে—এস্থলে আর কথা

বলা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র নিঃশব্দে সেই পান্তাভাত-গুলির সদ্ব্যবহার করিয়া আচমন করতঃ নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলেন। সেজ-বউ তখন কক্ষমধ্যে ছিলেন, কল্য রাত্রি হইতে তিনি ক্ষিতীশচন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ক্ষিতীশচন্দ্র একটা তাম্বুল প্রার্থনা করিলেন, সেজ-বউ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, অধিকন্তু গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

এদিকে বেলা হইয়া গেল। অগত্যা তাম্বুলের আশা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র একটা ছিন্ন জামা গায়ে দিয়া, চাদর স্কন্ধে লইয়া, কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র আড়তে গিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার মনিব তাঁহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন—"তোমার মত লোকের দ্বারা কার্য্য চলিতেই পারে না। কাল চালানী মালের গাড়ীর সঙ্গে ষ্টেশনে যাইবার কথা, কিন্তু কাল তুমি একেবারেই আসিলে না। আমার কত ক্ষতি হইল, তাহা তোমরা বুঝিবে না। যাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, সে মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে—অতএব তোমার দেনা-পাওনার হিসাব পরিষ্কার করিয়া লও, আর আসিও না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র মুখ গুঁজিয়া খাতা লিখিতে লাগিলেন, যেন সে কথা কে কাহাকে বলিতেছে।

পুনঃ পুনঃ ভৎর্সনা করিয়া আড়তদার অগত্যা স্তব্ধ হইলেন; কিন্তু উপসংহারে বলিয়া দিলেন, পুনবায় এরূপ হইলে, সেদিন তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া আড়ত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

ক্ষিতীশচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, যাহার অর্থ নাই, তাহাব পক্ষে এ সকল কথা সহ্য করিতেই হইবে।

যথাসময়ে কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, ক্ষিতীশচন্দ্র আড়ত হইতে বাহির হইলেন। বাজারের মধ্যে একখানি মনোহারীর দোকানে গিয়া একটু

বিশ্রাম করিতেছিলেন—দোকানী বয়সে নবীন এবং কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত। ক্ষিতীশের সঙ্গে একটু সম্প্রীতিও ছিল। সেদিন কলিকাতা হইতে তাঁহার অনেক জিনিসের চালান আসিয়াছিল; ক্ষিতীশ ক্রুদ্ধা স্ত্রীর সন্তোষ সাধনার্থ ধারে এক শিশি গন্ধদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনেকক্ষণ হইল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার তারা উত্তর-আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে এবং শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে বসিয়া কৌমুদী বিতরণ করিতেছেন। একটা গৃহমধ্যে আলো জ্বলিতেছিল। রাধাচরণ সেখানে বসিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ পড়িতেছিল। তৎপার্শ্বে রাইচরণ, হরিচরণ, হরিচরণের মাতা, সেজ-বৌ ও পাড়ার তিন-চারিজন স্ত্রীলোক বসিয়া সে পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন।

রাধাচরণ অনেকখানি আবৃত্তি করিয়া বলিল—"তোমরা বোধ হয় কেহই ইহা বুঝিতে পারিতেছ না, আমারও সাধ্য নাই যে আমি বেশ পরিষ্কার করিয়া তোমাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিই। অতএব এ পণ্ডশ্রমে প্রয়োজন নাই—কাশীদাসী মহাভারত পড়ি।"

রাধাচরণের মাতা বলিলেন—"হ্যাঁরে, লোকে বলিতেছে, তুই আর দিন-কতক পরে হাকিম হবি, আর তুই এই বই বুঝাইয়ে দিতে পারিতেছিস্ না?"

রাধাচরণ হাসিয়া উঠিল, বলিল—"হাকিম, না হাকিমের পেয়াদা হব। এ বড় শক্ত বই মা!—এ বুঝান সহজ নয়।"

মা। তবে নয় তুই পড়িয়া যা, আর রাই বুঝিয়ে দিন্।

রাধা। কে, দে মহাশয়? পাটের ওজনের মধ্যে এ বিদ্যা নাই মা। উনি এ বুঝাতে পারেন না। রায়-মহাশয় বাড়ী আসে নাই?—তিনি পারেন।

মাতা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যাহা রাধাচরণের বিদ্যায় কুলাইল না—এত টাকা উপার্জ্জনক্ষম রাইচরণ যাহা পারিবে না, তাহাই পারিবে কি না ছয় টাকা বেতনভোগী রায়মহাশয়, ওরফে ক্ষিতীশ!

মাতা সে কথা বিশ্বাসই করিলেন না। বলিলেন—"তোর যেমন কথা! রাই আমার দেশজয়ী জামাই, তুই বল্, উনি এখনই বুঝাইয়া দিবেন!"

'তবে দিন্।'—এই কথা বলিয়া রাধাচরণ আবৃত্তি করিল—

"উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি,
সারণ! জানি হে আমি এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ-দুঃখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ! হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়-ধন লয় কেহ হরি।

এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া রাধাচরণ, রাইচরণের মুখের দিকে চাহিল। রাইচরণ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন—"ঐ যে মায়া দয়ার কথা হইল, ও আর বুঝিতে পারিলে না? মানুষের উপর মানুষের মায়া-দয়া করা উচিত, শাস্ত্রে তাই বলিয়া গেল।

রাধাচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধাচরণ তাড়াতাড়ি বলিল— "আপনি আসিয়াছেন? দে-মহাশয়, মেঘনাদবধের একটা প্যারার কি সদর্থ করিয়াছেন শুনুন।" এই কথা বলিয়া রাধাচরণ পূর্ব্বপঠিত কবিতার পুনরাবৃত্তি করিল এবং ক্ষিতীশকে তাহার অর্থ করিতে বলিল। ক্ষিতীশ সুন্দরভাবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

শাশুড়ী কিন্তু বুঝিলেন, বড় জামাই যখন অতটাকা রোজগার করেন,

তখন তিনি কিছুতেই অশাস্ত্রীয় কথা বলেন নাই। ক্ষিতীশ যদি লেখাপড়াই জানিত, তবে এত দুর্গতি উহার হইবে কেন? তাঁহাদের অন্নদাস হইয়া থাকিবে কেন?

রাইচরণ অভিমানে ফুলিয়া উঠিলেন। অভিমানের চির সহচর ক্রোধ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু ক্রোধটা রাধাচরণের উপর না পড়িয়া, পড়িল গিয়া হতভাগ্য ক্ষিতীশের উপর। ক্ষিতীশ কিন্তু ততক্ষণে নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গিয়াছেন।

রাইচরণ অভিমান ও ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে উঠিয়া কক্ষমধ্যে গমন করিলেন। শাশুড়ী কন্যাকে বলিলেন—"জামাইকে পান দিয়ে আয়!"

জামাই অর্থে রাইচরণ, কন্যা অর্থে ক্ষিতীশের স্ত্রী। শিবমোহিনী উঠিয়া গেলেন—ক্রমে হরিচরণ উঠিয়া গেলেন, রাধাচরণ অনেকক্ষণ পাঠ বন্ধ করিয়াছিল। যাঁহারা পাড়া হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও চলিয়া গেলেন, কাজেই নৈশ-সমিতি সেই পর্য্যন্তই স্থগিত থাকিল।

সেজ-বৌ, রাইচরণের গৃহে গমন করিয়াছিলেন, কাজেই ক্ষিতীশচন্দ্র জামা চাদর রাখিয়া পদধৌত করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু জলাভাব।

অগত্যা একটি ঘটি হাতে করিয়া প্রাঙ্গণে গমন করিলেন ও কূপ হইতে জল তুলিয়া আনিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। তারপর শুষ্কমুখে গৃহমধ্যে বসিয়া সেজ-বৌ এর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেজ-বৌ আর আসেন না।

ক্ষিতীশচন্দ্রের স্কন্ধে তখন দুর্ব্বুদ্ধি চাপিল—তিনি বাহির হইয়া রাইচরণের কক্ষসন্নিধানে গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"একবার ঘরে এস, একটু কাজ আছে।"

রাইচরণ সেজ-বৌকে বলিলেন—"যাও, আমি বাঘ, তোমার বরের ভয় করিতেছে, পাছে এক কামড় দিয়া বসি!"

ক্ষিতীশ সে রহস্যের প্রত্যুত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। সেজ-

বৌ অতিশয় বিরক্তস্বরে গুরুপদবিক্ষেপে আপনার শয়নকক্ষে আগমন করিলেন ; ক্ষিতীশ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

সেজ-বউ মুখ ঘুরাইয়া, চোখ উল্টাইয়া বলিলেন—"কি হইয়াছে ? মরণ আর কি—ডাকাডাকি করিতে লজ্জাও করে না ?"

ক্ষিতীশ। ডাকাডাকি এই জন্যে—কতকক্ষণ আসিয়াছি, একবার কি দেখাও দিতে নাই ?

সেজ-বৌ। ছিঃ ছিঃ জ্বালাইলে তুমি ! লোকে কি বলিবে বল দেখি ?

ক্ষিতীশ। আমার কাছে আসিলে, লোকে কি বলিবে—আর বোনায়ের কাছে একা বসিয়া থাকিলে, লোকে কিছু বলিবে না ?

সেজ-বৌ জ্বলিয়া উঠিলেন। রক্তমুখী হইয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জন-সহকারে বলিতে লাগিলেন—"যম, তুমি আমায় নাও—ওমা, আমি যাব কোথায় ? ভগিনীপতির কাছে গিয়াছিলাম বলিয়া এত লাঞ্ছনা।"

কন্যার সে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও নাকিসুর মাতা শুনিতে পাইলেন। তিনি ক্রোধ কম্পিত দেহে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যা বলিলেন—"আমি গলায় দড়ি দিব, আমি নাকি দে মহাশয়কে—আমার মরণ হোক্, এখনি হোক্।"

"বটে ! তবে রে ছোটলোকের ব্যাটা, আমার বুকে খাইতেছিস্, আবার আমারই মেয়ের কুৎসা করিবি ? তোর জন্য কি আমার জামাই বেয়াই বাড়ী আসিবে না ? না আমার ছেলেমেয়ে বাড়ী থাকিবে না ?"—শাশুড়ীর এইরূপ মধুর বাণী জামাতার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এই বাক্য-সুধার লহর-লীলা সমস্ত বাড়ীখানিকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। কি একটা বিষম কাণ্ড ঘটিয়াছে ভাবিয়া অনেকেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কর্ত্রীঠাকুরাণীর মুখে শুনিল যে, ক্ষিতীশ, তদীয় কন্যাকে রাইচরণের গৃহে একবারমাত্র যাইতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করিয়াছেন এবং প্রহার করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছেন।

রাইচরণের, ক্ষিতীশের উপর পূর্ব্ব হইতেই ক্রোধ সঞ্চিত ছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া তিনি বলিলেন—"ঘরজামাই, আর পোষা-কুকুর এরা অন্য লোক বাড়ীতে আসিতে দেখিলে জ্বলিয়া উঠে। তা, আমি আর থাকিতেছি না, কাল সকালে উঠিয়াই চলিয়া যাইব।"

শাশুড়ী বলিলেন—"ওমা, আমি যাব কোথা, এখন যদি ঘোষ বুড়োকে পাইতাম, তবে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁটাইয়া দিতাম। সেই পোড়ামুখোই ত আমার সোণার প্রতিমাকে এমন হতভাগার হাতে দিয়াছিল। আমায় হাড়ে নাড়ে জ্বালাইয়া খাইল।"

হরিচরণ বলিলেন—"শোন ক্ষিতীশ, তুমি অন্য উপায় দেখ, এখানে আর তোমার থাকা হইবে না!"

ক্ষিতীশচন্দ্র এত কথার কোন উত্তর করেন নাই। এইবার বলিলেন—"তাহাই হইবে।"

"বেশ।"—এই কথা বলিয়া হরিচরণ চলিয়া গেলেন। রাইচরণও ক্ষিতীশের চরিত্রের উপর নানাবিধ দোষ জড়াইয়া আছে, এইরূপ মন্তব্য প্রচার করিতে করিতে তথা হইতে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই চলিয়া গেলেন। কেবল ক্ষিতীশচন্দ্র পরাভূত সৈনিকের ন্যায় একাকী সেই গৃহমধ্যে ভগ্নমনে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার হৃদয়ে তখন দাবানলের জ্বালা জ্বলিতেছিল। কাহার জন্য কি

করিলাম? সেজ-বউ, আমি যে তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি; ইহা কি তাহার প্রতিদান! অন্তস্তল ভেদ করিয়া একটা আকুল দীর্ঘশ্বাস বহিয়া গেল। তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। রাইচরণ ও হরিচরণের আহার শেষ হইলে ক্ষিতীশের ডাক পড়িল। ক্ষিতীশ বলিলেন—"আমি রাত্রে আহার করিব না, শরীর অসুস্থ হইয়াছে।"

শাশুড়ী বলিলেন—"বাবুর রাগ হইয়াছে, তা হোক্। এত রাগের ধার কেউ ধারে না।"

আহারাদি সমাপ্ত করিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে যথাসময়ে সেজ-বৌ আসিয়া শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ক্ষিতীশের সহিত বাক্যালাপও করিলেন না—বিনাবাক্যব্যয়ে শয্যাগ্রহণ করিলেন। ক্ষিতীশও কোন কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বাড়ীর সকলে যখন নিস্তব্ধ হইল,—সকলেই যখন নিদ্রিত হইয়া পড়িল, তখন সেজ-বৌকে ডাকিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন—"উঠিয়া আমার একটা কথা শোন।"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে সেজ-বৌ বলিলেন—"রাত দুপুরের সময় তোমার আবার কি কথা? যম আমাকে কবে লইবে যে, তোমার হাত এড়াইব।"

ক্ষিতীশ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আজই শেষ, আজ হইতেই তুমি সুখে থাকিতে পারিবে! সেজ-বৌ প্রাণ হইতে তোমাকে প্রিয় ভাবিয়াছি, তোমার জন্য মাকে, সহোদর ভাইদিগকে, ভ্রাতৃজায়াদিগকে ত্যাগ করিয়াছি, তোমার জন্য নিজের বাড়ী ছাড়িয়া পরের দুয়ারে দাস্যবৃত্তি করিতেছি। কিন্তু তাহার প্রতিদান বেশ দিয়াছ!"

মুখ ঘুরাইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, বিকৃত-কণ্ঠে সেজ-বৌ বলিলেন—"আমার জন্য সব ত্যাগ করিয়াছ—আমিও তোমার শত্রু! তবে কেন আমার কাছে থাকা? যেখানে সুখে থাক, তুমি সেখানে গেলেই পার।"

ক্ষিতীশ। সেখানে? না, সেখানে আর যাইব না! জগৎ বুঝিয়াছি—জগতের মোহ বুঝিয়াছি। এখন যেখানে টাকা আছে, সেইখানে যাইব!

সেজ-বৌ। যেখানে ইচ্ছে, সেখানে যাও, আমার তাহাতে কি? আমাকে ডাকিয়া জ্বালান কেন?

ক্ষিতীশ। যদি তোমার অসুখ বোধ হয়, ডাকিব না। তুমি শোও; একটা কথা—তোমার জন্য একশিশি গন্ধদ্রব্য আনিয়াছিলাম, নাও, হয় ত জীবনে আর কোন জিনিস দেওয়া ঘটিবে না।

ক্ষিতীশের নয়ন-কোণে অশ্রুবিন্দু জমিল। শিশিটা লইয়া সেজ-বৌএর হস্তে প্রদান করিলেন।

"অত আদরে কাজ নাই" বলিয়া সে শিশিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সেজ-বৌ শয্যার উপরে ছিল—ক্ষিতীশ শয্যানিম্নে বসিয়াছিলেন—শিশিটা আসিয়া ক্ষিতীশের কপালে লাগিল, ভাঙিল না, কিন্তু কপালের একস্থান কাটিয়া গিয়া রক্তধারা বহিল এবং প্রবল-আঘাতে কর্ক নড়িয়া খানিক গড়াইয়া পড়িল। সেজ-বৌ একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিয়া শুইয়া পড়িল। রক্তরোধ করিবার কোন প্রয়াস পাইল না।

ক্ষিতীশচন্দ্র ঘটীর জলে রক্ত ধুইয়া, জামা চাদর ও ভগ্ন ছাতাটি লইয়া বলিলেন—"সেজ-বউ, ওঠ, দরজায় খিল্ দাও, আমি অদৃষ্টান্বেষণে ভাসিলাম, আর কখনও দেখা হইবে না—এই দেখাই বোধ হয়, শেষ দেখা।"

সেজ-বৌ উপাধান হইতে মাথা তুলিয়া দেখিলেন—ক্ষিতীশের চক্ষু জলভারে টলটল করিতেছে এবং সমস্ত অঙ্গে যেন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। কপাল হইতে তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল।

ক্ষিতীশচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, জনহীন নিস্তব্ধ গ্রাম্যপথ বাহিয়া চলিয়া গেলেন।

সেজ-বৌ ভাবিলেন, এখনই ফিরিয়া আসিবে। গৃহমধ্যে মৃৎ-প্রদীপে

ক্ষীণরশ্মি আলোক জ্বলিতেছিল—উন্মুক্ত জানালাপথে ধীর সমীর আসিয়া তাহাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল এবং শিশি হইতে নিঃসৃত পারিজাত গন্ধে দিগন্ত ভাসিতেছিল। এই আসে এই আসে করিয়া সেজ-বৌ অনেকক্ষণ কাটাইল। কিন্তু আসিল কৈ ? তবে কি আর আসিবে না ? দাদা জবাব দিয়াছেন, মা গালাগালি দিয়াছেন—আমি অভাগিনী অযত্ন করিয়াছি—শিশি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া রক্তপাত করিয়াছি—তাই কি আর আসিবে না ? তবে কেন যাইতে নিষেধ করিলাম না ? আমি নিষেধ করিলে তিনি যাইতেন না। সেজ-বৌএর চক্ষুতে জল আসিল, সে আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া দরজার কাছে গেল—একবার প্রাঙ্গণপানে চাহিয়া দেখিল—সর্ব্বত্র নীরব, সর্ব্বত্র জনশূন্য ; তারপরে দরজায় খিল দিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেজ-বৌ সকালে উঠিয়া সমস্ত বাড়ীখানা শূন্য দেখিল। হরিচরণ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার ছোট-জামাতা কোথায় ? মাঠে যাইবে না ?"

অবজ্ঞার সুরে মাতা বলিলেন—"কি জানি, আমার ওসব ভাল লাগে না, বাপু ! রাই কাল রাগ করিয়াছিলেন—আজ সকালে চলিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন, এখন কি বলিতেছেন ?"

হরি। কি আর বলিবেন, তিনি কি আর তাই মনে করিয়া আছেন, অমন মানুষ কি আর হয় ?

মা। তা আর একবার করিয়া ?

হরি। আর কি তপস্যা করিয়াই ছোট জামাইটিকে পাইয়াছিলে ?

মা। অদৃষ্ট—আমার পোড়া অদৃষ্টের ফল ?

হরি। এখন গেলেন কোথায় ? দক্ষিণমাঠে একবার না গেলেই নয়।

মা। খুঁজিয়া দেখ।

হরি। শিবুকে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

মাতা তখন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বড় লোকের বেটা কোথায় গেলেন ?"

তিনি প্রায় ক্ষিতীশকে বড় লোকের বেটা বলিয়াই ডাকিতেন! শিবু ম্লানমুখে বলিল—"কাল রাত্রে কোথায় গিয়াছেন।"

মা। ওমা! যাওয়া আবার হইল কোথায় ? বোধ হয় তবে বাড়ী গিয়াছেন—আর যাইবেন কোথায় ? তা যান্, আমার অত শত ভাল লাগে না।

অন্য দিন ক্ষিতীশকে যে যাহা বলিত, সেজ-বৌএর প্রাণে তাহাতে কোন ব্যথা লাগিত না। আজ যেন মাতৃবাক্য বড় তীক্ষ্ণ বলিয়া মনে হইল। সে বলিল—"তা যাবে বৈ কি মা, চিরদিনই কি আর তোমাদের বাড়ী পড়িয়া থাকিবে!"

মাতা সে কথা শুনিতে পাইলেন না। 'ক্ষিতীশ কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে', এই সংবাদ হরিচরণকে প্রদান করিলেন। হরিচরণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"দেখিয়াছো, কি রকম নেমকহারাম! এখন একটু কাজ বেশী পড়িয়াছে কি না তাই চলিয়া গেল।" সেজ-বৌ ও রাধাচরণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাধাচরণ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং বলিল—"কাল তোমরা তাঁহাকে যেরূপভাবে বলিলে, তাহাতে তিনি থাকিবেন কেন ? তোমরা তাহাকে যেমন ক্ষুদ্রাশয় ভাব, বাস্তবিক তিনি তেমন নহেন। তোমরা তাঁহাকে যত হীন মনে কর, বাস্তবিক তিনি তেমন নহেন। তবে সময় সকলের চিরকাল সমান যায় না।"

ছলছল-নেত্রে সেজ-বৌ রাধাচরণের মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা শুনিল। অন্তরের দীর্ঘশ্বাস অন্তরে চাপিয়া মনে মনে বলিল—"আমি

শত অপরাধ করিয়াছি—কিন্তু তিনি কখনও আমাকে রূঢ় কথা বলেন নাই—সময় সকলের চিরকাল সমান থাকে না।”

সেজ-বৌ, রাধাচরণকে তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিল—“একটা কথা বলিব, শুনিবি?”

রাধা। বল্ না কি?

সেজ-বৌ। আমি পয়সা দিব, তুই বাগ্দীপাড়া হইতে একটা লোক ঠিক্ করিয়া আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিয়া আয়।

রাধা। কেন, রায়মহাশয়ের খবর জানিতে?

সেজ-বউ। হ্যাঁ, রাত্রে গিয়াছে, ভালয় ভালয় পঁহুছিল কি না, সংবাদটা লইতে হয়।

রাধা। তা যাইতেছি, পয়সা আর তোকে দিতে হইবে না। আমার কাছে আছে।

সেজ-বউএর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল—“বাড়ীর কেউ যেন না জানিতে পারে—বুঝিলি? সে লোক যেন আমাদের বাড়ীতে না আসে; তুই তাকে পাঠাইয়া দিয়া আসিবি, আবার তার বাড়ী থেকে খবর আনিয়া আমাকে বলিবি।”

‘তাহাই হইবে’—বলিয়া রাধাচরণ চলিয়া গেল।

লোক সে দিবস পাওয়া যায় নাই। পরদিবস কুবীর-বাগ্দী সেখানে গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “তিনি বাড়ী যান্ নাই।”

রাধাচরণ সে সংবাদ তাহার দিদিকে প্রদান করিল। সেজ-বউ সংবাদ শুনিয়া বড় চিন্তিত হইল। বুঝি সেজ-বউ আগে জানিত না যে, সে চলিয়া গেলে প্রাণ এমন অস্থির হইবে। হায়, যখন কপাল কাটিয়া রক্তধারা বহিতেছিল, আমি হতভাগিনী কেন তাহা মুছাইয়া দিলাম না। যখন ছলছল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বিদায় চাহিলেন, আমি কেন পা জড়াইয়া ধরিলাম না।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ন-বৌ বড়-বৌএর কোলের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছিল। কান্না নীরবে—নীরবে চক্ষুর জল পড়িয়া গণ্ড ভাসাইয়া দিতেছিল।

বড়-বৌ বলিলেন—সে কি লো, কাঁদিতেছিস কেন? আমি কয়েক দিনের মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিব। আমার জন্ত কান্না কেন!"

ন-বৌ করতলে চক্ষু রগড়াইয়া বলিল—"দিদি, জগতে আমার আর কেহ নাই, তোমার কাছে আছি, তুমিও চলিলে। শাশুড়ী বৃদ্ধা হইয়াছেন—লোকে বলে তিনি পাগল হইয়া পথে ছুটিয়া বাহির না হইয়া বাটী আছেন, সেই আমাদের ভাগ্য; মেজ-দিদি সাতেও না পাঁচেও না, এক তোমার আঁচল ধরিয়া ছিলাম, তুমি গেলে এ সংসারে আমি একা থাকিব কি প্রকারে?"

বড়-বৌ। আমার যে না গেলে নয় বোন্, যত শীঘ্র পারি, তিনি একটু আরোগ্য হইলেই চলিয়া আসিব।

ন-বৌ। না গেলে নয় কেন? তিনি তোমার কে? মাসীর শাশুড়ী—অত দূরসম্পর্কীয় লোকের ব্যারাম হইলে আবার কে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে যায়?

বড়-বৌ। যে যায় না, সে অন্যায় কাজ করে। রমণীর সে ধর্ম্ম নয় বোন্;—এ কথা তোমাকে কতদিন বলিয়াছি। সম্বন্ধ সম্পর্ক বিচার না করিয়া রোগে শুশ্রূষা, দুঃখে দয়া, শোকে সান্ত্বনা—রমণী বুক পাতিয়া করিবে। যে ডাকিবে—যে শরণাগত হইবে, তাহারই উপকার করিতে হইবে।

ন-বৌ। তবে শীঘ্র আসিও।

বড়-বৌ। তা আসিব বৈ কি। ন-ঠাকুরপোর চিঠি পাইলে, আমাকে সংবাদ দিস্।

ন-বৌ। সে আশা বৃথা ;—ছোট-ঠাকুরপো আজ প্রায় তিন মাস কলিকাতায় গিয়া এ যাবৎ পাঁচ-ছয়খানা পত্র দিয়াছেন ; কিন্তু তিনি একখানিও পত্র লিখিতে পারেন নাই। আর ঠাকুরপোর পত্রের ভাব বোঝ ত ?

বড়-বৌ। তা বুঝিয়াছি, সে চোখখাগী মাগী এখনও অমাবস্যার পেত্নীর মত তাঁর পিছু লাগিয়া আছে।

ন-বৌ। চোখখাগী মাগীর দোষ কি ?

বড়-বৌ হাসিয়া বলিলেন—"তুই যে বশ করিতে জানিস্ না।"

ন-বৌ। তা মিছে নয়। আমার সে ক্ষমতা থাকিলে, তুমি কি আমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিবে ?

বড়-বৌ, ন-বৌএর মুখচুম্বন করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। ন-বৌও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

সেই দিন শেষ-রাত্রে একখানি গরুর গাড়ীতে চড়িয়া বড়-বৌ কামারহাটিতে দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ী পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে চলিয়া গেলেন।

যেখানে পীড়া, যেখানে শোক, যেখানে যাতনা, বড়-বৌ সেই স্থানে গিয়া নিজের বুক পাতিয়া দিতেন, ইহাই তাঁহার জীবনের সার ব্রত হইয়াছিল এবং সেই সকল ফলকামনাশূন্য কার্য্য সমাধা করিয়া, অপার অনাবিল মানসিক আনন্দ উপভোগ করিতেন।

বড়-বৌ চলিয়া গেলেন—সংসারে তখন মেজ-বৌ, ন-বৌ, কর্ত্রী—আর রামসেবক, রামসেবকের মাতা এবং নিস্তার থাকিল।

শাশুড়ী বৃদ্ধা, তাহাতে শোকে তাপে জর্জ্জরিতা ; তিনি কোন দিনই রন্ধনশালায় গমন করিতেন না। মেজ-বৌ, পুত্রশোকাতুরা—বিশেষতঃ

কখনই তিনি রন্ধনশালায় পদার্পণ করেন না। রামসেবকের মাতা কুটুম্বের মেয়ে, কাজেই তিনিও রন্ধন বা কোন কাজকর্ম্মে থাকিতেন না। সংসারের সকল কাজ নিস্তারিণীকে লইয়া ন-বৌকেই সম্পন্ন করিতে হইত। ন-বৌ তাহাতে কোনই কষ্ট জ্ঞান করিত না। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া রাত্রি এক-প্রহর পর্য্যন্ত সে কাজ করিয়াও ক্লান্ত হইত না। সেটা বড়-বৌএর শিক্ষা, বড়-বৌ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, নারী কাজ করিতে জন্মিয়াছে—সেবাব্রতই তাহার মহাব্রত। প্রাণপণে ন-বৌ সে ব্রত পালন করিত। ন-বৌ স্বামীর অবহেলা, স্বামীর অদর্শন, সংসারের একান্ত অভাব, আর প্রভূত খাটুনী, এ সকলের মধ্যেও পতিদেবতার মন্দির মার্জ্জন করিয়া তন্ময় হইয়াছিল। এ শিক্ষা তাহার শিক্ষয়িত্রী বড়-বৌ দিয়াছিলেন। তিনি যাহাতে সুখী হন, তাহাই করুন। নারীর আবার সুখ কি? জগতের আনন্দেই নারীর আনন্দ।

কিন্তু তাহাতেও ঘোর অন্তরায় জুটিল। রামসেবকের পাপ দৃষ্টি সেই অপাপবিদ্ধ অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তির উপর পতিত হইল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামসেবক, এই কয়মাসের মধ্যে এ গ্রামে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বসিয়াছে; তবে ভদ্র-সমাজে সে ভুলিয়াও কোন দিন গমন করিত না। পূর্ব্বাহ্নে বেলা ছয় দণ্ডের সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত, কোন দিন বা তাহারও অধিক হইয়া যাইত। না ডাকিলে নিদ্রাভঙ্গ হইত না। আহারের পর পুনরপি নিদ্রা—সে নিদ্রায় সমস্ত অপরাহ্ণ কাটিয়া যাইত।

অতঃপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে উঠিয়া বেশপরিবর্ত্তন, কেশসংস্কার ও জলযোগ সমাধা করিয়া পাড়ায় বাহির হইত।

রামসেবক, কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কোন দিনই পদার্পণ করিত

না। চাষাপাড়ায় মোড়লদের বাহিরের ঘরে যে সান্ধ্যসমিতি বসিত, রামসেবক তাহারই স্থায়ী সভাপতি ছিল। সে নিত্য নিত্যই সেই সকল স্থানে গমন করিত।

সেই সমিতিতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, দর্শনাদি সকল বিষয়েই আলোচনা হইত। সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা হইত। যেখানে রামসেবক উপস্থিত হইত, সেখানে বক্তা সে একা, অন্য কেহ কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে পারিত না। সকলে কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে তাহার বক্তৃতা শুনিয়া অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ করিত।

রামসেবক কোন দিন রাত্রে এগারটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিত না। মধ্যে মধ্যে দুই-একদিন তাহারও অধিক হইয়া যাইত। কিন্তু রাত্রি যতই হউক, তাহার আবদার ভোজ্য-অন্নগুলি উষ্ণ থাকা চাই।

ন-বৌকে এজন্য বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। বাড়ীতে পুরুষমানুষ আর কেহই ছিল না—বড়-বৌ চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকেই রন্ধনাদি করিতে হইত। তাহার শাশুড়ীর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার একটু জ্বর হইত, তিনি রাত্রে রান্নাঘরের দিকে উঁকি মারিতেও পারিতেন না। মেজ-বৌ সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া পড়িতেন—ন-বৌ সেই পুরীর মধ্যে তত রাত্রে ভাত রাঁধিয়া রামসেবকের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। অনুরোধ উপরোধে নিস্তারিণীর যেদিন দয়া হইত, সেই দিন সে রান্নাঘরের দাবায় পড়িয়া ঘুমাইত; আর যেদিন দয়া না হইত, সেদিন সে সন্ধ্যার পরে বাড়ী চলিয়া যাইত। ন-বৌ তত রাত্রি পর্য্যন্ত একাকিনী ভাত লইয়া বসিয়া থাকিত।

প্রথম প্রথম ইহাতে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে নাই—তারপরে যখন রামসেবকের রসিকতার বরফখণ্ড বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন ন-বৌ বিপদ গণিল। আবার যেদিন টানের মাত্রা অধিক হইত, সেদিন রসিকতার মাত্রাও বৃদ্ধি পাইত। সেরূপ চোখ-মুখ দেখিলে, ন-বৌ তাহার

নিকটে ভাত দিতে যাইতে পারিত না—রামসেবকের মাতাকে গিয়া ডাকিয়া আনিত।

রামসেবকের মাতা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। অনেক অনুযোগ করিয়া—"ও আমার দুধের ছেলে ওকে আবার লজ্জা কি, ভয়ই বা কি, যার মন অশুদ্ধ, সে সব তাতেই দোষ দেখে!" ইত্যাদি বাক্য-বাণ ন-বৌএর উপর বর্ষণ করিয়া অন্নপাত্র রামসেবকের সম্মুখে প্রদান করিতেন। রামসেবক গঞ্জিকারক্ত-নয়নের তীব্র কটাক্ষে ন-বৌএর হৃদ্-পিণ্ড কাঁপাইয়া দিয়া বলিত—"দেখ ত মা, আমি কি বাঘ যে ঘাড়ের রক্ত চুষিয়া খাইব?"

ন-বৌ রামসেবকের সঙ্গে কথা কহিত না, এক গলা ঘোম্‌টা দিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইত। রামসেবক ইহাতেও তাহাকে নানা প্রকার ঠাট্টা তামাসা করিত। ন-বৌ যখন মুখের ঘোমটা মাথায় তুলিয়া কাজকর্ম্ম করিত, রামসেবক তখন চুপি চুপি আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া, ন-বৌএর মুখপানে চাহিয়া থাকিত। মনে আশা, একবার চাহিলে হয়! তাহার সে আশা বড় অধিকক্ষণ অপূর্ণও থাকিত না; ন-বৌ মুখ তুলিয়া সেদিকে চাহিলেই চোখাচোখি হইত—পাপিষ্ঠ অমনি চক্ষু মট্‌কাইয়া হাসিয়া চলিয়া যাইত। ন-বৌএর প্রাণ ভয়ে জড়সড় ও কাঠ হইয়া পড়িত। সে তাড়াতাড়ি একগলা ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া ভয়ে ঘরে পলাইত। শাশুড়ীকে এ সব কথা বলিলে তিনি মেজ-বৌকে বলিতে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। মেজ-বৌকে বলিলে, তিনি বলিতেন—"ন-বৌ, তোর মন বড় অশুদ্ধ! রামা হ'ল পেটের ছেলের মত—হাসিয়াছে, তাই হইয়াছে কি? ওতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয় না—তুই যা।"

ন-বৌ আর কথা কহিতে পারিত না। তাহার চক্ষু কাটিয়া জল আসিত। মনে মনে প্রবাসী স্বামীর উদ্দেশে বলিত—"প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা! আমাকে এমন করিয়া আর কত দিন রাখিবে? আমি যে কত আশা

করিতাম, তোমার পড়া সারা হইলে, তোমার চাকুরী হইলে, প্রবাসে আমি তোমার চিরসঙ্গিনী হইয়া থাকিব—নিয়ত নিকটে থাকিয়া চরণ সেবা করিব। এমন করিয়া পায়ে ঠেলিলে কেন ? আমি তেমন লেখা-পড়া জানি না—আমি গাহিতে বাজাইতে জানি না—সত্য, কিন্তু তোমার চরণ সেবার কদাচ কোনরূপ ত্রুটি হইত না। সেবা-শুশ্রূষায় কি তোমার চিত্ত-বিনোদন হইতে পারিত না ? যদি একান্তই তাহা ভাবিয়াছিলে, তবে লেখাপড়া গানবাজনা শিখাইয়া লইলে না কেন ? তোমার তৃপ্ত্যর্থে আমি কি না করিতে পারি ? কেন আমাকে পায়ে ঠেলিলে ? তুমি যদি পায়ে ঠেলিলে, তবে তোমার পদে উৎসর্গীকৃত এ প্রাণ তোমার অবজ্ঞা অবহেলা সহিয়াও এ মরদেহে রহিয়াছে কেন ?

একদিন সন্ধ্যার সময় ন-বৌকে একা পাইয়া রামসেবক বুঝাইয়া বলিল—"আমি অধার্ম্মিক নহি ! আমি একজন পরমযোগী এবং ভক্ত। তুমি আমার সহায় হও—আমার সঙ্গে রাসলীলা কর, আমরা উভয়ে জীবন্তে ঠাকুর দেখিতে পাইব এবং অন্তে পুষ্পরথে চড়িয়া গোলোক-ধামে গমন করিব।"

ন-বৌ সকল কথা শুনিল না। শুনিতে পারিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেদিনকার কথাও সে যথাকালে শাশুড়ী ও মেজ-জাকে জানাইল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। ক্রমে রামসেবকের সাহস বাড়িতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাগুক্ত ঘটনার পরে রামসেবক একদিন বড়ই বাড়াবাড়ি করিল। ন-বৌ যখন রাত্রে তাহাকে ভাত দিয়া ফিরিতেছিল, তখন তাহার অঞ্চল ধরিয়া টান দিল, এবং মুখে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া ন-বৌ অন্তরে মরিয়া গেল। গৃহমধ্যে গিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিল।

রামসেবকের মাতা এই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ন-বৌ আগেই ডাকিয়া আসিয়াছিল কিন্তু উঠিয়া আসিতে এতক্ষণ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। ন-বৌকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন গো, কান্না কেন? আজ আবার কি হইয়াছে?"

ন-বৌ কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রামসেবক বলিল—"আমার এ বাড়ীতে থাকা হইল না। আমি কি ওর মামাশ্বশুর, না ভাসুর? ভাতের থালাখানা দিবার শ্রী দেখ ত? যেন বেগার দেওয়া—ওইখানে দাঁড়াইয়া ধপ করাইয়া দেওয়া হইল। অমন করিয়া না দিলেই হয়। তাই বলিয়াছি বলিয়া বুঝি আবার কান্না হইতেছে!"

রামসেবকের মাতা জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"হ্যাঁগা ন-বৌ, ওকি দুটি ভাতের জন্য তোমাদের বাড়ী পড়িয়া আছে? ওর পিসী—আপন পিসী—বাপের বোন্ পিসী—তার ছেলে মারা গেল তাই তাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আছে, তুমি ওকে অমন বিষ-নয়নে দেখ কেন? তোমার খায়, না তোমার পরে? আর বাছা, অত সতীগিরী ফলান ভাল নয়।"

ন-বৌ আর কথা কহিল না। তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। সে চক্ষুর জলে গণ্ড-স্থল ভাসাইতে ভাসাইতে মেজ-বৌএর গৃহে গমন করিল। সে জানিত, শাশুড়ীকে জানাইলে কোন ফল হইবে না।

মেজ-বৌ তখন গাঢ় নিদ্রিত। অতি করুণ কাতরস্বরে ন-বৌ ডাকিল—"মেজ-দিদি, একটু ওঠ ত—একটা কথা শোন!"

মেজ-বৌএর ঘুম ভাঙিল না। তখন ন-বৌ তাঁহার পদতলে হাত বুলাইয়া ডাকিল—"দিদি, একটা কথা শোন।"

মেজ-বৌ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। চক্ষু ঈষৎ উন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি লা, ডাকিতেছিস কেন?"

ন-বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা বলিল। রামসেবক বলিয়াছিল

—"সহজে স্বীকৃত না হইলে বল প্রকাশ করিব, কাহারও সাধ্য নাই আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। দু'শ চাষা আমার হুকুমদার—কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে লইয়া যাইবে কেহ জানিতেও পারিবে না, তার চেয়ে ঘরে থেকে দু'জনে ধর্ম্মকর্ম্ম করি—তুমি সম্মত হও।" ন-বৌ সব কথা জানাইয়া মেজবৌয়ের পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিদি, আমায় রক্ষা কর ; আমি তোমাদেরই বৌ—তোমাদেরই আশ্রিতা, তোমাদেরই ভগিনী—আমাকে তোমরা না রক্ষা করিলে কে রাখিবে বল ?"

কীচক-ভয়ে ভীতা সৈরিন্ধ্রী বুঝি এমনি করিয়াই বিরাট-মহিষীর চরণ ধরিয়া অভয় মাগিয়াছিল। মেজ-বৌ আর যাহাই হউক, সতীত্ব গর্ব্বিতা রমণী ; সতীর অপমান শুনিয়া সত্যই তাঁহার মনটা কেমন হইয়া গেল, তিনি নীরবে কি চিন্তা করিতেছিলেন—সহসা গৃহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—"তবে রে দজ্জাল !" বলিতে বলিতে রামসেবকের মা সপ্তমে গলা ছাড়িয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন এবং ন-বৌএর প্রতি ভীষণ বক্রদৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ছেলেটাকে না তাড়াইয়া ছাড়বি না ! আহা, সে কচি ছেলে—তুই তার উপর লাগ্‌লি কেন ? সে আসিয়াছে তার পিসীর বাড়ী—পেটের দায়ে আসে নাই, পরণের দায়ে আসে নাই—আহা হা, এত অপমান ! ঠাকুরঝি —দাও ভাই আমাদের বিদায় দাও—আমরা বাড়ীর মানুষ বাড়ী যাই।" বলিয়াই বক্তৃতা-স্রোত প্রবাহিত করিয়া উপসংহারে রামসেবক যাহা বলিয়াছিল, তাহাই বিকৃত বিবর্ত্তনে সালঙ্কারে ঠাকুরঝির নিকট পেশ করিলেন। মেজ-বৌ তাহা শুনিয়া ন-বৌএর দোষই স্থির করিলেন এবং তাহাকে কিছু ধমক দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

ন-বৌ তখন যায় কোথায় ? শাশুড়ীর গৃহে গমন করিল। তাঁহার সেদিন বড় জ্বর, সে দুই-একবার ডাকিয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল, জ্বরের উত্তাপে ত্বক্ যেন ফাটিয়া যাইতেছে ! সে ফিরিয়া নিজ গৃহে যাইতেছিল, তখন নরাধম রামসেবক দাঁড়াইয়া ছিল—সে বিকট হাসি হাসিয়া বলিল—

"যেখানেই যাও যাদু, আমার হাতে নিস্তার নাই। আমাকে বাবা বলিতেই হইবে, আর আমার বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে। নতুবা তোমার বাবার বাবা আসিলেও রক্ষা করিতে পারিবে না।"

বাগুরাহস্ত ব্যাধের পাশ কাটাইয়া ভীতা, চঞ্চল হরিণী যেমন ছুটিয়া পলায়ন করে, ন-বৌ তেমনই ভাবে রামসেবকের পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিজ গৃহমধ্যে গিয়া দরজায় খিল দিল এবং শয্যার উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল—"প্রভু, হৃদয়দেবতা! রমণীর রক্ষাকর্ত্তা—তুমি আমার কোথায়? তোমারই বাটীতে, তোমার হতভাগিনী দাসী এক দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হইতেছে। তুমি কি আসিবে না? তুমি কি রক্ষা করিবে না? আমি কোন ঠাকুর-দেবতা চিনি না—তোমা ভিন্ন আমার কোন দেবতাকে ডাকিতেও লজ্জা করে—তুমিই আমার ভগবান্। ভক্তের ডাকে ত তুমি স্থির থাকিতে পার না—তবে কেন আসিবে না? আমি তোমার পূজা-পদ্ধতি বুঝি না, তোমাকে ডাকিবার ভাষা জানি না—তাই কি আসিলে না।"

ন-বৌ তারপর অনেকক্ষণ শয্যার উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তারপর ভাবনা-জর্জ্জরিত চিত্তে কেবলই উদয় হইতে লাগিল, সে পাপিষ্ঠ যাহা বলিয়াছে, যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ করিলে, আমার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। যদি হঠাৎ একদিন রাত্রে কতকগুলা চাষা লইয়া আসিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যায়, তবে কে আমায় রক্ষা করিবে? তখন আমার গতি কি হইবে? তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল। বসিয়াও শান্তি পাইল না, আবার শুইল, আবার উঠিল। তারপর স্থির করিল পলায়ন করিব।

একবার মনে হইল, তাহার শাশুড়ীর যে বড় জ্বর হইয়াছে—সে চলিয়া

গেলে কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবে? তাহার চক্ষু দিয়া দর-বিগলিত ধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। তারপর আবার ভাবিল—না পলাইলে যখন তাহার রক্ষা নাই, তখন শাশুড়ীর জ্বর বলিয়া আর কি হইবে? কিন্তু হায়! সে একবার ভাবিল না যে, পলাইয়া যাইবে কোথায়? তাহার আশ্রয় কোথায়? রোদন-লোহিত আঁখিদ্বয় আঁচলে মুছিয়া একবার তাহার অতি সাধের গৃহ-খানির দিকে চাহিল—তাহার সাজান জিনিসগুলার দিকে চাহিল, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"থাক তোমরা, তোমাদের অভাগিনী চির-বিদায় লইতেছে। যদি আসেন—বলিও—সে আমাদিগকে তোমারই জন্য রাখিয়া গিয়াছে।" তাহার চক্ষু দিয়া আবার জল গড়াইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই নিশীথে অন্ধকার পথে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—হতাশে, আতঙ্কে, সর্ব্বত্র বিভীষিকাময় মনে হইল, পত্রের মর্ম্মর-শব্দে কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে কে জানে, কিসের বলে তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তব্ধ হইয়া গেল, সে চেতনা হারাইল, আত্মজ্ঞান বিরহিত হইল। দীর্ণ-বিদীর্ণ বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে বিজন নিশীথে উদ্দেশ্যহীন অপরিচিত পথে কোথায় চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ন-বৌ বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা উন্মাদিনীর ন্যায় অন্ধকার-পথে সারা রাত্রি চলিয়া গেল। কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইবে, তাহা তাহার স্থির নাই—তখন তাহার কোন জ্ঞান নাই—চলিয়া যাইতে হয়, চলিয়াছে। যাইতে যাইতে এক নদী-তীরে গিয়া উপস্থিত হইল—নদী খরস্রোতা ও বিপুল জলশালিনী।

পথের শেষ হইল, নদীর দিকে চাহিয়া তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, নদী উত্তীর্ণ না হইলে আর এ পথে চলা যাইবে না। জ্ঞানের

সঙ্গে সঙ্গে ভয় আসিয়া পূর্ণ প্রতাপে তাহার হৃদয় অধিকার করিল। সে বিহ্বল হইয়া পা ছড়াইয়া একটা সিমূল গাছের তলায় বসিয়া পড়িল।

এতক্ষণে নিজ অবস্থা কৃত-কর্ম্মের কথা এবং সহস্র আকুল চিন্তা প্রবল বেগে উদ্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়কে বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। সে যায় কোথায়, করে কি? করিয়াছেই বা কি? তাহার কোমল পাদুখানি তৃণ-কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। দেহ পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে জ্ঞানশূন্য হইল। সহসা নদীকূলের একটা পাখী চীৎকার করিয়া নিশাবসান-বারতা ঘোষণা করিল। সে স্বরে ন-বৌএর আবার জ্ঞানোন্মেষ হইল, চমকচঞ্চলিত প্রাণে চারিদিকে চাহিল, দেখিল, পূর্ব্ব-গগনে উষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, অজ্ঞাত বিপদ-আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে ভাবিল, যখন দিনের আলো প্রকাশ পাইবে, তখন হতভাগিনীর উপায় কি হইবে!

এই সময় একটা জেলে নদী হইতে মাছ ধরিয়া তীরে উঠিল এবং মাছের ডালি ও জাল মস্তকে লইয়া সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের সেই চির-নূতন চির-মধুর গাথা গাহিতে গাহিতে চলিল—

"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥
মা'র সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা-তথা;
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা।
তুমি না করিলে দয়া, যাব মা বিমাতা যথা॥"

পুরাতন গানের এই চরণটুকু উষার বাতাস বুকে করিয়া আনিযা ন-বৌএর কাণে ঢালিয়া দিল। তাহার মনে বলের সঞ্চার হইল, সে স্থির করিল, ভয় কি? মরণ ত আমার হাতেই! ঐ ত শীতল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ বারি-

রাশি, উহাতে কি সকল বিপদের অবসান হয় না—উহার তলেও কি শান্তি নাই? প্রাণেশ্বর! এ অকূল-পাথারে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা!

মানবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ন-বৌ কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। মানব-দর্শন বিষে আবার হয় ত জর্জ্জরিত হইতে হইবে ভাবিয়া, সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যে দিক দিয়া স্বর আসিতেছিল, তাহার বিপরীত দিকের পথ ধরিয়া নদী তীর বাহিয়া চলিল।

কিয়ৎক্ষণ গমন করিয়া এক শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঊষার উদাস বাতাস—সম্মুখে নদীপ্রবাহ—ঊর্দ্ধ আকাশে জ্যোতিঃহীন তারকাপুঞ্জ—ন-বৌ তখন শ্মশান-ভূমে।

তাহার প্রাণ উদাস—শ্মশানে দাঁড়াইয়া সে শবভুক্ শৃগাল কুকুরের ধ্বনি শুনিল। একটা গলিত মৃত-দেহ লইয়া তাহারা কাড়াকাড়ি করিতেছিল। মাংস-চর্ম্মহীন নরমুণ্ডসকল ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহারা যেন মানবকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল—শোন, আমাদের রূপ ছিল, যৌবন ছিল, ধন, জন, কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়, মনোবৃত্তি সবই ছিল; এখন তাহার পরিণাম দেখ। সে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আবার চলিতে লাগিল। ক্রমে প্রভাত হইয়া উঠিল।

ভয়ে, ক্ষোভে, লজ্জায় এবং অত্যন্ত পরিশ্রমে কাতর হইয়া—"মা গো!" বলিয়া ন-বৌ নদীতীরের বালুকারাশির উপরে বসিয়া পড়িল।

তখন পশ্চাৎ হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে গো? রূপে যে ঘাট আলো করিয়াছ?"

আবার পোড়া রূপ! ন-বৌ চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল—মাটির কলসী কক্ষে করিয়া দুইটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেখিবামাত্র ন-বৌ উঠিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু পারিল না—তাহার অবসাদগ্রস্ত পা আর উঠিল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

একজন বলিল—"ভয় কি মা, আমরা মেয়েমানুষ, বল না, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

রুদ্ধ-কণ্ঠে জড়িতস্বরে ন-বৌ বলিল—"মা, আমি বড় অনাথা, কোথায় যাইব তাহার ঠিক নাই, যমের বাড়ীর পথ খুঁজিতেছি, পাইতেছি না !"

স্ত্রীলোক দুইটি স্থির করিল—শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় অথবা স্বামীর তাড়নায় গৃহ ছাড়িয়া বাপের বাড়ীর উদ্দেশে চলিয়াছে—হয় ত পথ হারাইয়া এদিকে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের করুণ-হৃদয় তাহাকে আশ্রয় দিতে আগ্রহ করিল। একজন বলিল—"তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে ? কোন ভয় নাই, আমরা টাকায় গরীব হইলেও বংশমর্য্যাদায় ভদ্র।"

ন-বৌ স্বীকৃত হইল। মনে ভাবিল—"দিবালোকে কোথায় যাইব—পথে বহু বিপদ্ ঘটিতে পারে। আপাততঃ উহাদের বাড়ী গিয়া আশ্রয় লই, তার পরে যাহা হয় একটা স্থির করিব ; বাপের বাড়ীর গ্রাম কোন্ দিকে, তাহাও জানি না ; সেখানে যাইতে পারিলেও কোন কুটুম্ব-সাক্ষাতের বাড়ী কাজ-কর্ম্ম করিয়া খাইতে পারিব !" সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমণীদ্বয় জল লইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

গ্রামের মহাজন শম্ভু রায় প্রভাত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শম্ভু রায়ের বয়স চল্লিশের কিছু উপর। জাতিতে তিনি ভুঁইহার, কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরিয়া বঙ্গদেশে বাস করিয়া, কনোজ-ব্রাহ্মণের দাবি করিয়া আছেন। গঙ্গারামপুর গ্রামখানির সমস্ত কৃষকের তিনি মহাজন—ধান ও টাকা তাঁহার অনেক মজুদ্।

কৃষক-কামিনীদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ ঊষাদেবী দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। এত রূপ—এমন সৌন্দর্য্য—এমন কুসুম-সুকুমার লাবণ্য কোথা হইতে আসিল !

শম্ভুচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"দে-বৌ ! এটি কে ?"

দে-বৌ একটু সম্ভ্রমের স্বরে বলিলেন—"জানি না। ঘাটের ধারে একলা বসিয়া কাঁদিতেছিল—ডাকিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছি।"

শম্ভুচন্দ্র পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ-নয়নে ন-বৌএর দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। তাহারাও বাড়ী গেল।

শম্ভুচন্দ্র কিন্তু ভুলিতে পারিলেন না। বাড়ী গিয়াও সে রূপ তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না, তাঁহারও চরিত্র সবিশেষ দুষ্ট না হইলেও, পবিত্র ছিল না, অধিকন্তু রূপ-মাদকের এমন নেশাও বুঝি কোন দিন লাগে নাই। বুঝি এতাধিক মত্ততা এতাবৎ কোন দিন জন্মে নাই। তিনি সুবলের মাতাকে গোপনে ডাকিয়া, এই সকল কথা বলিয়া, দে-দের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

সুবলের মা মাহিষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনটি কন্যা ও দুইটি পুত্র রাখিয়া পাড়ার নবীন-বাগ্দীর প্রেমে মজিয়া, তাহার সহিত ভেক লইয়া গৌরাঙ্গ-রসে মত্ত হন। সেই সাধন-ফলে সুবল-নামধেয় একটী পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হন। সুবল অল্প বয়সেই গৌরাঙ্গপুরে গমন করে। এখন বৈষ্ণব বাবাজীও কোথায় চলিয়া গিয়াছেন—বয়সও ফাঁকি দিয়াছে। অগত্যা এর ওর বাড়ী কাজকর্ম্ম করিয়া এবং সুবিধামতে চরিত্রহীন নরনারীর অবৈধ সংযোগবিধানে দু'পয়সা উপরি রোজগার করিয়া দিন কাটাইতেন।

তিনি দে-দের বাড়ী গিয়া দে-মহিষীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর বিচ্ছিন্ন লতার ন্যায় মলিন-শুষ্কদেহা ন-বৌএর নিকট গিয়া তাহার উপর রায়-মহাশয়ের আকস্মিক কৃপা, রায়-মহাশয়ের সুবিপুল সম্পত্তি ও ন-বৌএর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ন-বৌ তাহা শুনিয়া কাঁদিল এবং সুবলের মা ও রায়-মহাশয়ের নামে অভিসম্পাত করিল।

সুবলের মা ফিরিয়া গিয়া, সে সংবাদ রায়-মহাশয়কে নিবেদন করিল। সে সকল শুনিয়াও রায়-মহাশয়ের প্রলুব্ধ-হৃদয় প্রতিহত হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রায়-মহাশয় স্থির হইতে পারিলেন না—গোপাল দেকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। গোপাল দের গৃহিণীই ন-বৌকে আনিয়া বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছে।

মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোপাল দে, মহাজন রায়-মহাশয়ের চণ্ডী-মণ্ডপে উপস্থিত হইল। রায়-মহাশয় মহাসমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে তখন আরও কয়েকজন লোক থাকায় রায়-মহাশয় দে-মহাশয়কে লইয়া নির্জ্জনে গমন করিলেন—উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা—অনেক বাদানুবাদ হইল। তারপরে দে-মহাশয় বলিলেন—"তবে তাই। আপনি মহাজন—আমি খাতক, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারি, আমার এমন কি সাধ্য আছে!"

দে-মহাশয় চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখখানা নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে দে-মহাশয় ও তদীয় গৃহিণীতে কথোপকথন হইতেছিল; সেখানে আর কেহ ছিল না, কথাও খুব মৃদুস্বরে হইতেছিল। দে-গৃহিণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিস্বরে বলিলেন—"তা, কখনই হবে না।"

দে। দোষ কি, ও আমাদের কে?

দে-গৃহিণী। কেউ না, কিন্তু আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে।

দে। অত ধর্ম্মের থলি গলায় বাঁধিলে সংসারে কাজ চলে না।

দে-গৃহিণী। ছিঃ ছিঃ! তুমি বল কি? তোমার প্রাণে একটু দয়া-মায়াও নাই। আহা-হা, মেয়েটার মলিন মুখখানা দেখিয়াও কোন্ প্রাণে তুমি তারে বাঘের মুখে তুলিয়া দিতে চাহিতেছ? সতীর সতীত্বহানির সহায়তা—ওমা, আমি যাব কোথায়? তা হইলে আমার কি বংশ থাকিবে গা?

দে-মহাশয়ের অপ্রসন্ন মুখ আরও ম্লান হইল বলিলেন—"কি করি, গিন্নি ; মহাজন—"

অধিকতর বিরক্তি-স্বরে দে-গৃহিণী বলিলেন—"হোক্‌গে মহাজন। ধর্ম্মের চেয়ে কেহ বড় নয়।"

দে। বড় ত নয় গিন্নি ;—কিন্তু যখন দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব বেচিয়া কিনিয়া পথের ভিখারী করিবে ?

দে-গৃহিণী। রায়-মহাশয় বুড়ো মিন্সে—এখনও তার এই দুর্ম্মতি ? যাইতেছি আমি রায়-ঠাকৃরুণের কাছে। সতী, সতীর মর্য্যাদা বুঝিবে।

দে-মহাশয় চমকিয়া বলিলেন—"গিন্নি, ঘুমন্ত বাঘ জাগাইয়া কি সর্ব্বনাশ করিতে চাও ? তা হইলে আমার ভিটা মাটি উচ্ছন্ন যাইবে।"

দর্পিত বাহু-যুগল আন্দোলন করিয়া দে-গৃহিণী বলিলেন—"ইস্ তাই বলিয়া কি ধর্ম্ম বেচিয়া খাইব ? লয় বেচিয়া লইবে—না হয় ভিক্ষা করিয়া খাইব। না হয় এ গাঁ হইতে উঠিয়া যাইব।"

দে। আর এক ভয় আছে।

দে-গৃহিণী। কি ভয় ?

দে। তিনি বলিয়াছেন—সন্ধ্যার পরে চারিজন লোক আসিবে—

দে-মহাশয়ের কথা সমাপ্ত না হইতেই দে-গৃহিণী গর্ব্বিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ওরে আমার লোক আসা! এ মগের মুল্লুক কি না! আসুক ত লোক—দেখি, কার সাধ্য আমার বাড়ী থেকে সতী রমণীকে লইয়া যায়!"

দে-মহাশয় ক্ষীণ দীপালোকে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎপ্রভা ঝল্‌সিতেছে। তিনি আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না, উঠিয়া বাহিরে গমন করিলেন। কিন্তু মহাজন-ভয়ে তাঁহার হৃদয় বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িল। দে-গৃহিণী তখন রাগে ফুলিতে ফুলিতে রান্নাঘরে গমন করিলেন।

ন-বৌ সে সময় সেই ঘরেরই অপর পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিল। যখন স্বামী-স্ত্রীতে মৃদুমন্দ-স্বরে কথা আরম্ভ হইল, তখন সে কান পাতিয়া সে কথা শুনিতে লাগিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, ন-বৌ অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল। তারপর হৃদয় দৃঢ় করিয়া স্থির করিল—এখানে বসিয়া কাঁদিলে চলিবে না। যখন অবুদ্ধির কাজ করিয়াছি, শাশুড়ীকে না বলিয়া, পিতৃ-ভবনের স্বজনগণের আশ্রয়, পাড়ার পাঁচজনের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া, গৃহ-ত্যাগ করিয়া যখন মহাপাতক করিয়াছি, তখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সে প্রায়শ্চিত্ত জীবন আহুতি দিয়াই করিব।

তাহার মনে হইল, 'আমি এখানে থাকিলে আমার সর্ব্বনাশ হইতে পারে—একা রমণীর সাধ্য কি যে পাপিষ্ঠের পাইক পেয়াদার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে? আর যদি সাধ্য হয়, তবে তজ্জন্য তাহার ঘোর অনিষ্ট হইবে—আমার জন্য কেন ইহাদিগকে বিপন্ন করিব? এ জীবনের আহুতি ব্যতীত এ কর্ম্ম-হোমের যখন অবসান হইবে না, তখন ইহাদিগের সর্ব্বনাশ করি কেন? নিকটেই নদী—অতি সহজে আমার কার্য্য সমাধা হইবে।' তখন আর সে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অতি সন্তর্পণে সেখান হইতে নির্গত হইল।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। জ্যোৎস্নালোকে পথ বহিয়া চলিয়া গিয়া, ন-বৌ নদীতীরে দাঁড়াইল। ঊর্দ্ধ-নেত্র যুক্ত করে ডাকিল—"প্রভু! স্বামিন! চলিলাম! একবার দেখিবার বড় সাধ ছিল—অন্তিমে সে সাধ পূরাইলে কৈ?"

আর কিছু বলিল না! সেই উচ্চ তীর হইতে সবেগে জলতলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

অদূরে একখানা ছইঘেরা নৌকাতে আলো জ্বলিতেছিল—তাহার মধ্যস্থ আরোহী, মাঝিদিগকে বলিলেন—"শীঘ্র দেখ ত, জলে যেন একটা মানুষ পড়িল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ন-বৌ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—কলঙ্কে দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

লোকে বুঝিল অন্যরূপ—শুনিল অন্যরূপ। রামসেবক আর রামসেবকের মাতা, সমস্ত গ্রামে প্রচার করিয়া দিল ন-বৌএর বাপের বাড়ীর গ্রামের একটা ছোক্‌রা, রাত্রে লুকাইয়া লুকাইয়া মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। আগে বড় কেহ তাহার অনুসন্ধান লইত না, রামসেবক আসা পর্য্যন্ত হাদের বড় অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছিল; কেননা, রামসেবক অনেক রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরিত, তাই ন-বৌ তাহার সহিত পলায়ন করিয়াছে। দিনকতক সেই কথা লইয়া গ্রামের মধ্যে টি টি পড়িয়া গেল; মেয়ে-মহলে, স্নানের ঘাটে, গুড়ুক-ধূমাবদ্ধ চাষার চণ্ডীমণ্ডপে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, ভদ্রলোকের সমাজে কেবল ঐ কথারই আলোচনা, আন্দোলন চলিতে লাগিল; তিন-চারিদিন এইরূপ অবিচ্ছিন্ন অহর্নিশি আন্দোলনের পর, জটলাস্রোত অনেকটা নিবৃত্ত হইয়া আসিল।

পাড়ার বিষ্ণু সরকার ভাবিয়া চিন্তিয়াও আসল ব্যাপারটা নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন—ন-বৌএর মত লক্ষ্মী বৌ গ্রামে আর নাই। বিশেষতঃ ভদ্রকুল-বধূ ইন্দ্রিয়-তাড়নে কুলের বাহির হইবে, স্বামিভক্তি বিসর্জ্জন দিবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথাই নহে। তিনি সন্ধ্যার সময় আহ্নিক ক্রিয়া ও জলযোগ সমাপন করিয়া, একটী জ্বলন্ত লণ্ঠন ও একগাছি মোটা লাঠি লইয়া, ধীরে ধীরে যতীশচন্দ্রের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যতীশচন্দ্রের মাতা তখন আরোগ্য হইতেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শয্যাত্যাগ করেন নাই। তাঁহার কপালে যে এতও ছিল—তাহা তিনি জানিতেন না। শয্যায় পড়িয়া দিবারাত্রি কেবলই কাঁদিতেন।

বিষ্ণু সরকার বরাবর তাঁহার নিকটে গমন করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, কেমন আছ?"

যতীশের মা তাঁহাকে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিষ্ণু সরকার হাতের লাঠি ও লণ্ঠন সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া, একখানা আসন টানিয়া লইয়া বসিলেন। তৎপরে বলিলেন—"বৌ, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

ক্রন্দন-বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া যতীশের মা বলিলেন—"আমি ত কিছু জানি না, ঠাকুরপো।"

কিঞ্চিৎ বিরক্তি-স্বরে বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন—"তুমি কিছু জান না, ত' আমি জানি। তুমি কোন বিষয়েই লক্ষ্য রাখ না। কোন বিষয়েই ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া চল না, আবশ্যকমতে কাহাকেও উপযুক্তরূপে শাসন করিবার চেষ্টা কর না, তাই তোমার সংসার এমন করিয়া ছারে-খারে যাইতেছে। গোড়া হইতে যে গৃহিণী তাহার গৃহপানে না তাকায়, স্বীয় সংসারে শৃঙ্খল-বিধানে কৃতযত্ন না হয়, এমনি করিয়াই তাহার গৃহস্থালী বিনষ্ট হয়।"

গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন—"আমার বোধ হয়, এই কুকাণ্ডের মধ্যে রামসেবকের হাত আছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"যারই থাক্, আমি ত জন্মের মত গেলাম।"

বিষ্ণু। রামসেবককে একবার ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারিলে হইত।

গৃহিণী। না ঠাকুরপো, তেমন কাজ করিও না। তাহা হইলে এই জ্বালার উপর আবার জ্বালা পড়িবে—বাড়ীতে টিকিতে পারিব না।

বিষ্ণু। এইরূপ ভয় করিয়াই তুমি এতদূর করিয়াছ। যাহাই হোক্, কিছু না জিজ্ঞাসা করিলে, আসল কথা প্রকাশ পাইবে না। প্রকৃত ঘটনাটা না প্রকাশ পাইলে, সে ভদ্রলোকের মেয়ে যে প্রকৃতপক্ষে কৃতদূর

দোষী, ঠিক্ বুঝা যাইতেছে না; অথচ, বাস্তবিক যদি সে নির্দ্দোষ হয় এবং লোকের চক্রান্তে পড়িয়া যদি সে বিড়ম্বিত হইয়া থাকে, তবে প্রতিকারের আবশ্যক।

অতঃপর বিষ্ণু সরকার—"নিস্তার, নিস্তার" বলিয়া ডাক দিলেন। নিস্তার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণুচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামসেবক কোথায় রে?"

নিস্তার। জল খেয়ে পাড়ায় যাবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বিষ্ণু। ডাক ত।

নিস্তার গিয়া রামসেবককে সে কথা নিবেদন করিল। রামসেবক তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গর্ব্বিত পদক্ষেপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিষ্ণুচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বক্র-দৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদমস্তকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ব'স, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

রামসেবক বলিল—"বসিবার সময় আমার এখন নাই, যে কথা থাকে বলিতে পারেন।"

বিষ্ণু। ধরিতে গেলে এখন তুমিই এ বাড়ীর কর্ত্তা—সব বিষয়ে তোমাকেই সন্ধান রাখিতে হয়।

রাম। সে কথা বলিয়া আর জ্বালান কেন? আমি কোন্ বিষয়ে না সন্ধান রাখি? এই যে ন-বৌটা পলাইয়া গেল, আমার চোখে কি ধূলা দিতে পারিয়াছে?

বিষ্ণু। তা কি পারে গো! তবে আর ব্যাটাছেলে বলিয়াছে কেন? ভাল, সে কথাটা আমি তোমার মুখে কোন দিন শুনি নাই। ঘটনাটা কি বল ত বাপু?

রাম। শুনিবেন কি···বৌটা আদৎ ভাল নয়।

বিষ্ণু। তা ত নয়ই—কিন্তু ঘটনাটা কি?

রাম। ঘটনাটা কি জানেন—আমি পাড়া হইতে অনেক রাত্রি হইলে বাড়ী ফিরি—প্রায়ই আমার চোখে পড়ে—

ঠিক সেই সময়ে রামসেবকের মাতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু সরকার বড় দুঁদে লোক···পাছে তাঁহার সোণার বাছাকে কিছু বলে, এই ভয়ে আসিয়া তাহার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিষ্ণু। তোমার চোখে কি পড়ে ?

রামসেবকের মা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"ওগো, একা ওর কেন, আমিও কতদিন দেখিয়াছি গো—মনে হইলে এখনও গা শিহরিয়া উঠে।"

বিষ্ণু। কি দেখিতে রামসেবক ?

রাম। একটা ছোঁড়া—বয়স বেশী নয়, এই আমাদেরই মত।

বিষ্ণু। তারপর ?

রাম। আমি তাকে দু' একদিন তাড়াও করিয়াছি।

বিষ্ণু। সে যে ন-বৌএর জন্যই আসিত, তা বুঝিলে কেমন করিয়া ?

রাম-মাতা। ওগো, আমি দু'দিন দু'জনকে একত্রে দাঁড়িয়ে কথা বলিতে শুনিয়াছি।

বিষ্ণু। সে কথা বাড়ীর আর কাউকে বলিয়াছিলে ?

রামসেবক বলিল—"নিস্তারকে বলিয়াছি।"

বিষ্ণুচন্দ্র নিস্তারকে ডাকিলেন। নিস্তার আসিলে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, নিস্তার স্পষ্ট বলিল—"না, আমাকে কেউ এমন কথা কোন দিন বলে নাই।"

রামসেবকের মাতা সপ্তমে গলা তুলিয়া বলিলেন—"তবে রে হারামজাদি, মিথ্যে কথা ! ওর পিসীর খাইবি, আবার ওর সঙ্গে শত্রুতা ! কেন আমার মুকাবেলায় যে তোকে ওকথা বলিয়াছিল।"

নিস্তারও ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে নাকি সুর উচ্চগ্রামে তুলিয়া

বলিল—"তাই খাই বলিয়া কি মিথ্যা বলিব—বড় ত সুখে আছি, না হয়, আর না থাকিব ?"

রাম-মাতা। ওগো তোমরা থাকিবে না কেন, আমরাই তোমাদের চক্ষুঃশূল হইয়াছি, তা আর থাকিতেছি না, খাও তোমরাই লুটে-পুটে খাও।

বিষ্ণু। ঝগড়া করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তাই বল। ভাল, রামসেবক!—বাড়ীর চাকরাণীর সাক্ষাতে এই গুরুতর কথাটা বলিবার আগে, এ বাড়ীর আর কারও সাক্ষাতে বলিলে না কেন ?

রাম। না, তা বলি নাই।

রাম-মাতা। বলিবে কি ? আমরা পর ; যদি বলি, লোকে বলিবে শত্রুতা করিতেছে।

বিষ্ণু। রামসেবক, তুমি তোমার পিসীমার সাক্ষাতে এ কথা কোন দিন বলিয়াছিলে ? তিনি ত আর তোমাকে পর ভাবেন না ?

রাম। হ্যাঁ, বলিয়াছি বৈ কি।

বিষ্ণু। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

রাম। আপনার সঙ্গে তিনি কথা কহিবেন কেন ?

বিষ্ণু। আমার বধূমাতা—আমার সঙ্গে কথা কহিবেন বৈ কি।

রাম-মাতা। ও ত বলিয়াছিল, তবে ঠাকুরঝি সদাই পুত্রশোকে কাতর, সে কথা কানে করিয়াছে কি না, কে বলিতে পারে !

বিষ্ণু। সব বুঝিলাম, এখন রামসেবক, একটা কথা শোন।

রাম। কি ব'লুন।

বিষ্ণু। তুমিই এই ঘটনার মূল—

রাম। আমি ?

বিষ্ণু। হ্যাঁ,—তুমিই তাহার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলে তাই বালিকা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছে।

রাম। তবে তাই।

বিষ্ণু। তবে তাই! ভাবিও না যে, এইরূপেই তোমার দিন কাটিবে। ভগবানের চক্ষু জগৎব্যাপ্ত। পাপ করিয়া থাক, অচিরে শাস্তি পাইবে।

"তা যখন পাই পাইব"—এই কথা বলিয়া রামসেবক চলিয়া যাইতেছিল, বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন—"শোন রামসেবক, এখনও সত্য কথা বল, যদি ভয়ে সে বালিকা পলায়ন করিয়া থাকে, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।"

রামসেবক ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এ কেমন দেশের কেমন বিচার জানিনে। বেরিয়ে যাওয়া বৌকে আবার আনিতে চায়!"

সে চলিয়া গেল। তাহার মাতা সেই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র ম্লানমুখে চলিয়া গেলেন।

যতীশের মাতা তাঁহার বহুকালের মৃত স্বামী ও বড়-ছেলের এবং দানীশের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মেঘস্তর ভেদ করিয়া অপরাহ্ণের সূর্য্যকিরণ হঠাৎ মাঠের মধ্যে পুষ্পিত পাদপ শিরে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রোশের পর ক্রোশ, প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে—বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জনহীন, শস্যহীন;—কৃষকেরা অনেকদিন ধান্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে—ধানের মূলে মাঠ আচ্ছন্ন। দুই মাস পূর্ব্বের সজল মৃত্তিকা প্রখর রৌদ্রতাপে কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়াছে।

প্রান্তরের মধ্যে একটি বিল; বিলে কুমুদ কহ্লার প্রস্ফুটিত। জলচর পক্ষিগণ সেই নীল জলে সন্তরণ করিতেছিল।

বিলের পার্শ্ব দিয়া একজন ইংরাজ অতি বেগে দ্বিচক্র-যান হাঁকাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একটা উচ্চ আইলে বাধিয়া, গাড়ীখানি উল্টাইয়া গেল—সাহেব সেই কঠিন মৃত্তিকার উপর পড়িয়া গেলেন। একজন পথিক অদূরে এক বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সে সাহেবকে বিপন্ন দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। পথিক—ক্ষিতীশচন্দ্র।

ক্ষিতীশচন্দ্র সাহেবের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, আঘাত গুরুতর। মাথায় একটা চোট লাগিয়া ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে, সাহেব একরূপ অজ্ঞান, গাড়ীখানা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি নিজের উত্তরীয় ছিন্ন করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং বিল হইতে পদ্মপত্র করিয়া জল আনিয়া, সাহেবের মুখে, চোখে ও ক্ষতস্থানে সেচন করিলেন। অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর সাহেবের জ্ঞান হইল।

জ্ঞান হইবামাত্র সাহেব উঠিয়া বসিলেন। চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বোধ হয় ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবস্থাটা স্মরণ করিয়া লইলেন। অবশেষে মস্তকে হাত দিয়া দেখিয়া, ক্ষিতীশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি কে ?"

ক্ষিতীশ। আমি একজন দরিদ্র পথিক। ঐ গাছটার গোড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম, হঠাৎ আপনার বিপদ দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। আপনি কে এবং কোথায় যাইতেছেন ? আপনার গাড়ীখানা ত ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে ! এখন কি করিয়া কোথায় যাইবেন ?

সাহেব। আমি উড়িষ্যার পল্লী দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম, এ দেশে এখন বড় দুর্ভিক্ষ, উদ্দেশ্য—তাহার তথ্য লওয়া ; কলিকাতার একখানা খবরের কাগজে আমি কাজ করি। এখন পুরী অভিমুখে যাইতেছিলাম। তুমি কোথায় যাইবে ?

ক্ষিতীশ। আমার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সাহেব। আমি বড় দরিদ্র, কিছু রোজগারের প্রত্যাশায় বাহির হইয়াছিলাম।

সাহেব। তোমাকে বাঙালী বোধ হইতেছে, রোজগারের জন্য এদেশে কেন ? এ বড় দরিদ্র দেশ। কলিকাতায় গিয়াছিলে কি ? তথায় চাকুরী জুটিল না ?

ক্ষিতীশ। না সাহেব, কলিকাতায় অনেকদিন ঘুরিয়াছি; কিন্তু কিছুই সুবিধা করিতে পারি নাই। আত্মীয় মুরুব্বী না থাকিলে, তথায় চাকুরী জুটে না। কিন্তু সাহেব, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আপনার গাড়ীখানি ত ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। অনুমান করি, পুরী এখান হইতে সাত-আট ক্রোশ পথ হইতে পারে আপনি এখন কি প্রকারে যাইবেন?

সাহেব। তাইত বাবু, তুমি কোথায় যাইবে?

ক্ষিতীশ। আমিও এদেশের সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। তবে ঐ যে দূরে ঘন-সন্নিবিষ্ট নারিকেল গাছের শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে, সম্ভবতঃ ঐখানে একখানি গ্রাম আছে। আমি গ্রামে গিয়া রাত্রি কাটাইব ভাবিতেছি।

সাহেব। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই। আমার কথা এদেশের লোক প্রায়ই বোঝে না। এদেশে এখনও ইংরাজী-শিক্ষা খুব কম। তোমার সঙ্গে থাকিলে, আমার খুব সুবিধা হওয়া সম্ভব! ইহাতে বোধ হয়, তোমার কোন আপত্তি হইবে না?

ক্ষিতীশ। আপত্তি কি? আপনি চলুন। অনুমানে বোধ হয়, ঐ গ্রামখানি এখান থেকে এখনও এক ক্রোশ পথ দূরে। তবে সাহেব, আপনার গাড়ী লইবেন কি প্রকারে?

সাহেব। উপায় নাই। ঐ গ্রামে গিয়া একটা মজুর ডাকিয়া লইতে হইবে।

"তবে তাহাই হইবে; এখন চলুন।" এই কথা বলিয়া ক্ষিতীশ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; সাহেবও উঠিলেন। ক্ষিতীশ বুঝিতে পারিলেন, অনেকখানি রক্তস্রাব হওয়ায় এবং সর্ব্বাঙ্গে আঘাত লাগায়, সাহেব কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তখন ধীরে ধীরে উভয়ে নারিকেলবৃক্ষের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে তাঁহারা গ্রামে পৌছিলেন, সে একটা নিতান্ত গণ্ড

পল্লী। কতকগুলি কৃষক ও শ্রমজীবীমাত্র সে গ্রামে বাস করে। সাহেব দেখিয়া তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল। ক্ষিতীশ যদিও উড়িষ্যা-ভাষা ভাল জানেন না, তথাপি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা অতীব বিপন্ন এবং তাহাদের অতিথি—ভয়ের কোন কারণ নাই।

একখানা ভগ্ন-গৃহ-আঙিনায় তাঁহাদের বাসা হইল। ক্ষিতীশ সাহেবকে সেখানে রাখিয়া একটা মজুর লইয়া সাহেবের গাড়ী আনিতে সেই মাঠের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন এবং অনেক রাত্রে সেই গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপরে দুগ্ধ, পক্ক-রম্ভা ও অন্যান্য কিছু ফল আনিয়া সাহেবকে ভোজন করাইয়া নিজে 'মায়িচূড়া' খাইয়া রাত্রি কাটাইলেন। তার পরদিন একখানা শিবিকা আনাইয়া, সাহেবের পুরী যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। একটা মজুর ভগ্ন দ্বিচক্রযান-স্কন্ধে সঙ্গে গেল।

যাইবার সময় সাহেব বলিলেন—"বাবু, তোমার ভদ্রব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমিও আমার সঙ্গে পুরী চল।"

ক্ষিতীশ। সাহেব, আমি এদেশে কেবল চাকরীর চেষ্টায় আসি নাই। এদেশের জগন্নাথ আমাদের এক প্রধান দেবতা, তাঁহার দর্শন করিব, দেশটাও দেখিব; আর সেই সঙ্গে যদি কাজ-কর্ম্মের একটা যোগাড় হইয়া যায়, ভালই, নচেৎ পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।

সাহেব। কলিকাতায় গিয়া আমার সঙ্গে *** নং এস্প্লানেডে দেখা করিও। তোমার নাম কি এবং বঙ্গদেশে কোন্ গ্রামে বাড়ী আমাকে বল।

ক্ষিতীশ, নাম ও দেশের কথা বলিলেন—সাহেব তাহা পকেট-বহিতে লিখিয়া লইলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহুবাজার ষ্ট্রীটের একটি ত্রিতল বাড়ীর সম্মুখের মহলে একটি ঔষধালয় স্থাপিত। ঔষধালয়টি বেশ জম্‌কালো! পাঁচ-ছয় জন লোকে সর্ব্বদা কাজ-কর্ম্ম করে। দরজার সম্মুখে সাইনবোর্ড লেখা—'মিসেস্ জে, দাসের এলোপ্যাথিক্ ষ্টোর। ডাক্তার ডি, সি, রায় এল্, এম্, এস, সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ঔষধের তত্ত্বাবধান করেন এবং সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন।'

বাড়ীর মধ্যে দুইটি মহল, যে মহলটি বড়, তাহাতে একজন ধনী মাড়োয়ারী সপরিবারে বাস করেন—আর যেটি ছোট, তাহাতে যূথিকা দাস, ডাক্তার ডি, সি, রায় (ওরফে) দানীশচন্দ্রকে লইয়া বাস করেন। পাঁচকড়িও আসিয়া তাহাদের সেই মহলে আশ্রয় লইয়াছে।

বুভুক্ষিতা গৃধিনী যেমন মাংসখণ্ডের প্রতি লোলুপ বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, যূথিকাও তেমনি পাঁচকড়ির দিকে চাহিয়া থাকিত। সে বিপুল চিত্তবেগ দমন করিতে যূথিকা একান্ত অক্ষম।

সন্ধ্যার পরে, ত্রিতলের ছাদের উপর দুইখানি আরাম-চৌকিতে যূথিকা ও পাঁচকড়ি উপবিষ্ট।

যূথিকা সেদিন অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়াছিল। সেদিন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল—"আর সহ্য হয় না,—দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আর পুড়িয়া খাক্ হইতে পারি না। আজ শেষ,—হয় তাহাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইব—নয় পদতলে ফেলিয়া উৎসবান্তে ফুলমালার ন্যায় দলিত করিব।" তাই সে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই সকল আয়োজন

করিয়াছিল। অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া—অপূর্ব্ব সৌরভরাশিতে সুকুমার দেহ সুগন্ধিযুক্ত করিয়া, মস্তকের কেশদামে বিচিত্র বেণী বিনাইয়া, আরাম চৌকিতে উপবেশন করিয়াছে—আকাশের কৌমুদী ধরাতলে নামিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে পাঁচকড়ি। পাঁচকড়ি ধীর, স্থির, গম্ভীর। সে গাম্ভীর্য্য বড় পবিত্র, বড় মধুর, বড় কঠিন।

যূথিকা বলিল—"শোন পাঁচকড়ি, আমার হৃদয়পানে চাহিয়া দেখ, এর প্রত্যেক অণু-পরমাণু তোমাময় হইয়া গেছে। আমি তোমাকে চাই।"

পাঁচকড়ি গম্ভীরস্বরে বলিল—"কেন এ বাসনা ? আমি তোমার ছেলে।"

যূথিকা। ও পুরাতন কথা পরিত্যাগ কর। অনেক দিন বলিয়াছি—আমি বন্ধনমুক্ত কামিনী—কাহারও সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি স্বেচ্ছাচারিণী—স্বেচ্ছায় তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, তুমি আমার হও।

পাঁচ। তুমি আমার মা।

যূথিকা। আবার সেই কথা! মনে করিও না, তোমার দাদা জানিবে,—গোপনে আমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।

পাঁচ। আমাকে আর কুবাক্য বলিও না।

যূথিকা। শোন পাঁচকড়ি,—তুমি কি যে, তোমার পদতলে পড়িয়া এত করুণাভিক্ষা করিতেছি, এ জীবনে এমন নিষ্ফল রোদন কখনও করি নাই। ঈষন্মাত্র ইঙ্গিতে কত শত পতঙ্গ আসিয়া এ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। তাও বুঝি—তথাপি তোমাকে ভুলিতে পারিব না। তুমি অন্ততঃ একদিন—একবার মাত্র আমাকে "তোমায় ভালবাসি" বলিয়া আদর কর, আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব—চরিতার্থ হইব।

পাঁচ। আমি কি যূথিকা ? কেন আমার জন্যে তোমার এত লালসা ? ছি ছি ভুলিয়া যাও। আমার দেহ কাটিয়া দেখ—শৃগাল কুকুরের খাবার হইবে, কয়েক দণ্ড ফেলিয়া রাখিলে, পূতিগন্ধে এখানে তিষ্ঠিতে পারিবে না।

যূথিকা। পাষাণ! তবু শঠতা, তবু প্রবঞ্চনা!

পাঁচ। আমি তোমাকে মাতৃমূর্ত্তি বলিয়া জানি; আবার বলিতেছি, মা! আমায় ক্ষমা কর—রক্ষা কর!

যূথিকার নয়নে অনল জ্বলিয়া উঠিল। গভীর তীব্র উত্তেজনাপূর্ণস্বরে বলিল—"আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—আকুল প্রার্থনা—ঐকান্তিক মিনতি রক্ষা করিবে না?"

স্থিরভাবে দৃঢ়স্বরে পাঁচকড়ি বলিল—"না।"

যূথিকা উন্মাদিনীর বেশে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহুযুগল আন্দোলন করিয়া তীব্রস্বরে বলিল—"তবে প্রস্তুত হও; মনে করিও না যে, আমাকে জ্বালাইয়া তুমি সুখে থাকিবে! এই দেখ, তোমাকেও জ্বলিতে হইবে।"

যূথিকা পার্শ্বের কৌচের নিম্ন হইতে কি একটা পদার্থ বাহির করিয়া পাঁচকড়িকে দেখাইয়া বলিল—"চেন?"

পাঁচ। চিনি।

যূথিকা। অবস্থা শুনিয়াছ?

পাঁচ। শুনিয়াছি।

যূথিকা। তোমাকেই দোষী বলিয়া ধরাইয়া দিব।

পাঁচ। আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

যূথিকা। যূথিকার সারা প্রাণখানিকে পদতলে ফেলিয়া, দলিত নিষ্পিষ্ট চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছ। দেখিব, কি করিয়া সুখে থাকিবে। দেখিব, কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে! এখনও বল, আমার হইবে কি না? এখনও সময় আছে, এর পর আর এ সবয়, এ অবকাশ পাইবে না। তখন আমার আয়ত্তাতীত হইয়াও পড়িবে। বল, প্রিয়তম! আমার হবে?

অবিকম্পিতকণ্ঠে পাঁচকড়ি বলিল—"না।"

যূথিকা দন্ত-নিষ্পেষণ করিয়া বলিল—"এখনও না?'

পাঁচ। মায়ের সহিত পুত্রের ব্যবহার সব সময়ে,সব অবস্থাতেই সমান

যূথিকা আর সেখানে মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। দানবী-দীপ্তির উন্মাদ-গমনে চলিয়া গেল। পাঁচকড়িকে যাহা দেখাইয়াছিল, যাইবার সময় তাহাও লইয়া গেল।

পাঁচকড়ি বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপর মধুরকণ্ঠে একটি গানের কিয়দংশ পুনঃ পুনঃ গাহিতে গাহিতে নীচে নামিয়া গেল। সে গাহিতেছিল—

"কালভয়হরা কালি! দিস্ না কালের কোলে ফেলে।
মায়ের কেন হবে গো রাগ, হইলে অকৃতী ছেলে?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যূথিকা ত্রিতল হইতে নামিয়া গিয়া একখানা সোফায় বসিয়া পড়িল এবং একটা বেহারাকে ডাকিয়া বলিল—"ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আন্।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। গৃহমধ্যে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছিল। যূথিকা উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেওয়াল লম্বিত একখানি প্রকাণ্ড আয়নার নিকটে গিয়া আপনার ছবি নিরীক্ষণ করিল। তারপর সোফায় আসিয়া বসিল, অতি মৃদুস্বরে মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল দর্পান্ধ! দেখিব, তোমার কত দর্প—তোমার চরণপ্রান্তে এই চারিমাস সাধিয়া যাচিয়া কাঁদিয়া দেখিলাম; কিন্তু তোমার এত গর্ব্ব! এত অহঙ্কার! তুমি কিছুতেই স্বীকৃত হইলে না? সেই জন্যই ত এত ষড়যন্ত্র করিয়া আজ শেষ জবাব লইলাম। পাষাণ! এখন তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে থাক। পাঁচকড়ি থাকিলে যূথিকার প্রাণ স্থির হইবে না;—যাহাতে তোমার শেষ হয়, যাহাতে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়, এখন আমার একমাত্র তাহাই লক্ষ্য, তাহাই উদ্দেশ্য!"

এই সময়ে সেইস্থানে ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দৃপ্তা দানবীর বেশে যূথিকাকে অতি উৎকট সুন্দর দেখাইতেছিল। দানীশ, সে

গরলে মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এত সজ্জা কেন?"

যূথিকা। এক কথা শুনিয়াছ?

দানীশ। অনেক কথা ত বাহির হইতে শুনিয়া আসিলাম, এখন তোমার কথা তুমি না বলিলে অন্যত্র শুনিব কি প্রকারে?

যূথিকা। তোমার রসিকতা রাখ, ব্যাপার বড়ই গুরুতর।

দানীশ। কি?

যূথিকা। ত্রিতল হইতে আনীত সেই দ্রব্যটা বাহির করিয়া দেখাইল। দানীশ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"উহা এ বাড়ীতে আসিল কি প্রকারে?"

যূথিকা। তোমার ভ্রাতার কীর্ত্তি!

দানীশ। সর্ব্বনাশ! কেমন করিয়া কি করিল?

যূথিকা। আমি জানিতে পারিয়াছি—তাহারাও জানিয়াছে!

দানীশ। এখন কি করিতেছ?

যূথিকা। পুলিসে যাইবে—ধরাইয়া দিবে।

দানীশ। উপায়?—তুমিই যত আপদ টানিয়া আনিতে পার। আমি উহাকে জানি, সেই জন্য মজঃফরপুর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম—তুমিই আবার টানিয়া আনিলে। এখন মান যায়—জাত যায়; যাহা হয় কর।

যূথিকা। তাহা করিতে হইবে বৈ কি! আমি এখনই মাড়োয়ারীর মায়ের কাছে যাইব, তুমি মাড়োয়ারীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া দাও এবং লিখিয়া দাও, পাঁচকড়িকে সত্বরেই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব। তাহা হইলে আমি সকল গোল মিটাইয়া আসিতে পারিব।

দানীশ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন—"আমি আগেই লিখিয়া স্বীকার করিব?"

যূথিকা। তাহারা জানিতে পারিয়াছে—এখন পাঁচকড়ি ও হারছড়া, এই-দুই যদি সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহারা মোকদ্দমা

করিবে। আমাকে সাক্ষী মানিবে। আমি প্রাণ থাকিতেও মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের রাজ্য, পাঁচকড়ি কোথায় পলায়ন করিবে?

দানীশ। তবে এমন ভাবে চিঠি লিখিয়া দেই যে, ধরা ছুঁয়া না পায়।

যূথিকা তাহাতে সম্মতি দিল। দানীশ লিখিল,—

"আমার মুখ চাহিয়া দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। তাহাকে শীঘ্রই এখান হইতে তাড়াইয়া দিব এবং যে কয়দিন এখানে থাকে, দৃষ্টির উপরে রাখিব। আপনার জিনিস পাঠাইলাম।

শ্রীদানীশ।"

যূথিকা সেই পত্র ও হার লইয়া উঠিয়া গেল। দানীশ পাঁচকড়িকে ডাকাইলেন।

আসল কথা এই যে, সেই বাড়ীর অপর মহলবাসী মাড়োয়ারীর স্ত্রীর একছড়া কণ্ঠমালা ও একটি অঙ্গুরীয় হারাইয়াছিল। মাড়োয়ারী মহিষী ভয়ে সে কথা স্বামীকে বলেন নাই। পরে যখন মাড়োয়ারী স্বয়ং সন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর সেই দুইখানি অলঙ্কার নাই, তখন পীড়াপীড়ি করিলেন। স্ত্রী বলিলেন—"হারাইয়াছে, আমি জানিতাম না।" মাড়োয়ারী মহাশয় তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রে বড় বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার সন্দিগ্ধচিত্ত বলিয়াই এ অবিশ্বাস—নতুবা তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীরূপিণী। স্বামী এ ব্যাপারে অনেকরূপ সন্দেহ করিলেন, তারপরে পুলিসে অপহৃত দ্রব্যের তালিকা দিয়া আসিলেন। সে আজ তিন দিবসের কথা। এক বাড়ীতে বাস, সুতরাং এ সমস্ত কথা এ বাড়ীর সকলে জানিত।

এই কুকার্য্য যূথিকার। যূথিকা, পাঁচকড়ির নিকট নিজ অভিলাষ পূরণে অসমর্থ হইয়া শেষে চরম চেষ্টা করিয়া দেখিল। মাড়োয়ারী মহলে যূথিকা যাইত—সে-ই অলঙ্কার চুরি করিয়া আনিয়াছিল। দানবীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রতিকূলবৃত্তি প্রতিহিংসার অনলে জ্বলিয়া

উঠিয়াছে। তাই সে পূর্ব্বাহ্ণেই পাঁচকড়ির সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিল।

বেহারার সহিত পাঁচকড়ি আসিয়া তাহার দাদার নিকট দাঁড়াইল। বেহারাকে বিদায় দিয়া দানীশ ক্রোধ-কর্কশকণ্ঠে বিরক্তভাবে বলিলেন— "আমার মাথা খাইতে এখানে কেন আসিলে?"

পাঁচ। কেন? কি করিয়াছি?

দানীশ। এখনও কি করিয়াছি? পাজি! তোর জন্যে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। হারচুরি করিয়াছিস কার?

পাঁচ। আমি চুরি করি নাই।

দানীশ। তবে রে মূর্খ, আমি চুরি করিয়াছি?

পাঁচ। আপনার পা ছুঁইয়া বলিতে পারি, আমি চুরি করি নাই। সে হার সর্ব্বপ্রথমে আমি যূথিকার হাতে দেখিয়াছি।

দানীশ। তবে যূথিকা চুরি করিয়াছে?

পাঁচ। আমি জানি না।

দানীশ। নেমকহারাম! যূথিকা তোর জন্য এত চেষ্টা করে, সে তোকে পুত্রাধিক স্নেহ করে, সে তোর জন্য পরের পা ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে গেল আর তুই বলিতেছিস্ কি না যে তার হাতেই তুই প্রথমে হার দেখিয়াছিস্! নেমকহারাম!—কুকুর! আমার এখান থেকে দূর হ!

ছল-ছল-নেত্রে পাঁচকড়ি বলিল—"যূথিকা আমার মা, কেন আমাকে স্নেহ করিবেন না? আমি কাল সকালের গাড়ীতেই চলিয়া যাইব। কিন্তু দাদা, অভয় দিন। একটা কথা বলিব—আপনি জ্যেষ্ঠ সহোদর—আপনার মঙ্গলে আমার মঙ্গল, তাই বলিব। আপনি উহার সঙ্গ ছাড়ুন। ঘরের লক্ষ্মী অন্নাভাবে, যত্নাভাবে দিবানিশি হাহাকার করিতেছেন, আর আপনি বিষধরীর বিষে জর্জ্জরিত হইতেছেন।"

দানীশ সে কথার কোন উত্তর না করিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। পাঁচকাড় বাড়ী যাইবার জন্য তাহার কাপড়-চোপড় গুছাইতে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাড়োয়ারী মহাশয়ের নাম যাহাই হউক, সকলে তাঁহাকে রাজাসাহেব বলিত। এ খেতাব তাঁহার কেন হইল, তাহার সবিশেষ কারণ কেহ অবগত না থাকিলেও, সকলেই তাঁহাকে রাজাসাহেব বলিত—আমরাও তাহাই বলিব।

রাজাসাহেবের ধরণ-চলন বসন সবই আধুনিক ভাবস্পৃষ্ট হইলেও জাতীয়তা বিসর্জ্জিত নহে। তাঁহার পিতা স্বদেশ হইতে রিক্তহস্তে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে বস্ত্রের পশরা লইয়া পথে পথে ফেরী করিয়া, কালে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরলোক গমন করেন। রাজাসাহেবের কলিকাতাতেই জন্ম—কলিকাতার ইংরাজি বিদ্যালয়েই তাঁহার শিক্ষালাভ ঘটিয়াছে।

তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করেন না। পিতৃ উপার্জ্জিত অর্থ, ব্যবসায়ীদিগকে কর্জ্জ দিয়া সুদ আদায় করেন। বাড়ীখানা তাঁহার নিজের;—দুইটি মহল ভাড়া দিয়া, একটীতে আপনারা বসবাস করিতেন। যূথিকার উপরে তাঁহার একটু অনুগ্রহদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, কিন্তু যূথিকা আর সে যূথিকা নাই, সে স্বাধীনপ্রাণে মুক্ত গগনে ফিরে না—তাহার হৃদয়ে বেদনা জাগিয়াছে, একজনকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তবে সূর্য্যকিরণ যেমন পাত্রভেদে রূপভেদ হয়, ভালবাসাও তেমনি হয়। রাজাসাহেবের অনুগ্রহদৃষ্টি যূথিকার উপরে পড়িয়াছিল যূথিকা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু সে কোন দিন তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে চাহে নাই।

আজ যূথিকা স্বেচ্ছায় রাজাসাহেবের দুয়ারে গিয়া উপস্থিত হইল;

রাজাসাহেবকে ডাকিয়া নিভৃতে লইয়া তুইখানি আসনে মুখোমুখি হইয়া তুইজনে বসিল।

রাজাসাহেব বলিলেন—"ডাক্তারসাহেবা! কি জন্য আজ আমার গৃহ পবিত্র করিলেন? আমার পরম সৌভাগ্য!"

যূথিকা। সৌভাগ্য কি তুর্ভাগ্য বুঝি না। রাজাসাহেব, আমি আপনাকে ভালবাসি—আপনার অনিষ্ট, প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না—তাই আসিয়াছি।

রাজাসাহেব। ভালবাসেন!—কি মধুর অমৃতধারা আমার চিত্ত-ভূমি পবিত্র করিল। কি অনিষ্ট ডাক্তারসাহেবা?

যূথিকা। সে কথা বলিলে আপনার অতি পবিত্র কোমল-হৃদয়ে ব্যথা লাগিতে পারে।

রাজাসাহেব। এমন কি সংবাদ?—আমি প্রস্তুত হইলাম, আপনি বলুন।

যূথিকা। আপনাকে খুব ভালবাসি, তাই বলিতে আসিয়াছি;—নতুবা আপনাদের অনিষ্ট, আপনাদের কলঙ্ক, কে কোথায় ব্যক্ত করিয়া থাকে? কে সাধ করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে?

রাজাসাহেব। কি হইয়াছে আপনি বলুন। আপনার কথায় আমি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।

যূথিকা। আপনার স্ত্রী পবিত্র রমণী, কিন্তু তথাপি তাঁহার যৌবনের উদ্দাম লালসা, ডাক্তারসাহেবের ভাই পাঁচকড়ির উপরে পতিত হইয়াছে।

সাহেব লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কপালের শিরা সকল কুঞ্চিত হইয়া গেল। উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"সে কি! এ কথা আপনাকে কে বলিল?"

যূথিকা। শুনুন রাজাসাহেব! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আপনাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—এত ভালবাসি বলিয়াই, আপনাকে এই সকল

গোপনীয় সংবাদ দিতে আসিয়াছি। অস্থির হইবেন না—পুরুষোচিত ধৈর্য্যসহকারে সকল কথা শুনুন।

রাজাসাহেব। শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, বলুন, খুব অল্পের মধ্যে বলুন। প্রমাণসহ বলিতে হইবে—বলুন—বলুন, আর দেরি করিবেন না।

যূথিকা। আপনার স্ত্রীর হার ও অঙ্গুরী, আপনার স্ত্রী পাঁচকড়িকে দিয়াছিলেন।

অধিকতর উত্তেজিতস্বরে রাজাসাহেব বলিলেন—"মিথ্যা কথা! সেগুলি যে হারাইয়া গিয়াছে! আপনাকে এ মিথ্যা-সংবাদ কে দিয়াছে?"

যূথিকা। হারাইলে আপনাকে অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই আপনার স্ত্রী সে কথা আপনাকে জানাইতেন। এই দেখুন, সেই হার আর অঙ্গুরী।

রাজাসাহেবের চক্ষু দিয়া অনল ছুটিল, মস্তক ঘুরিয়া গেল, হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন—"এমন!"

যূথিকা। উতলা হইবেন না, আপনি পুরুষ মানুষ—সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় সামান্য-ব্যাপারে অস্থির হইবেন না! শুনুন,—সব কথা শুনুন।

রাজাসাহেব। আর শুনিতে চাহি না—আচ্ছা বলুন।

যূথিকা। এর জন্য ডাক্তারসাহেব আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছেন—এই দেখুন! ক্ষমা করিতে হইবে, দয়া করিতে হইবে।

যূথিকা রাজাসাহেবের হস্তে পত্র প্রদান করিল। রাজাসাহেব আলোকতলে সে পত্র পাঠ করিয়া শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্কশকণ্ঠে কহিলেন—"ক্ষমা! পাঁচকড়ির রক্তে ইহার ক্ষমা! আপনি যান।"

যূথিকা। আপনি এত উতলা হইলেন কেন? আবার বলিতেছি—রাজাসাহেব, প্রাণাধিক! আমি আপনাকে ভালবাসি—বড় ভালবাসি বলিয়াই এ সব কথা বলিয়াছি, কিন্তু সাবধান হউন—সহ্য করুন। আপনাকে ব্যথিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

রাজাসাহেব। কুকুর—উচ্ছিষ্টভোজী, তাহার বিনাশে কোন পাপ নাই।

যূথিকা। আপনার বিপদ আছে।

রাজাসাহেব। আমার বিপদ্?—যাহার স্ত্রী অপরে আসক্ত, তাহার আবার বিপদ্ সম্পদ্ কি ডাক্তারসাহেবা?

যূথিকা। কুসংস্কার—আপনাদের কুসংস্কার। ভালবাসা জোর করিয়া হয় না। ডাক্তারসাহেব আমাকে এত যত্ন করেন, কিন্তু আমার প্রাণ কেন আপনার চরণ-তলে লুটিয়া বেড়ায়?

রাজাসাহেব। জানি না ডাক্তারসাহেবা, কোন কথা ভাবিবার অবকাশ নাই—সমস্ত হৃদয় ছাইয়া আগুন জ্বলিয়াছে—পাঁচকড়ির রক্ত বিনা বুঝি ইহা নির্ব্বাপিত হইবে না।

যূথিকা বুঝিল, তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই! বিষ-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি করিতে চান?"

রাজাসাহেব। পাঁচকড়ির বুকের রক্তপান।

যূথিকা। সামান্য কারণে নিজের জীবনকে কেন বিপন্ন করিতে চাহেন? ইংরাজ রাজত্ব,—ইংরেজ-প্রজার খুনের জন্য খুন হইতে হয়।

রাজাসাহেব। সেও স্বীকার।

যূথিকা। না, আপনার অনিষ্ট হয়—ইহা অসহ্য। আপনি উহাকে জেলে পাঠান।

রাজাসাহেব। আমাদের রক্ত এখনও বাঙালীর রক্তের মত শীতল হয় নাই।

যূথিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষুতে অনল জ্বলিয়া উঠিল। বলিল—"তবে তাই। আজই কর্ম্মসাধন করিতে হইবে। শুনুন রাজা-সাহেব! পাঁচকড়ি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—বলপ্রকাশে আমার

সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। আমার কতকগুলি অর্থ ছিল, চুরি করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে—তাহার মৃত্যুতে আমার সুখ—তাহার রক্তে আমার শান্তি! তুমি একজন গুপ্তঘাতক দিবে!—সে নিশ্চয়ই কল্য সকালে বাড়ী যাইবে। কাজেই, আজই ডাক্তারখানার মধ্যে গিয়া তাহাকে হত্যা করিযা আসা চাই। সে ডাক্তারখানায় শোয়, আমি ডাক্তারখানার দরজা খুলিয়া রাখিব।

রাজাসাহেব কিছু বুঝিলেন না, কোন কথা ভাবিয়া দেখিলেন না, কুচক্রী রাক্ষসীর কুটিল-মন্ত্রণায় তিনি অবাধে স্বীকৃত হইলেন। উদ্দেশ্য-সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া যূথিকা চলিয়া গেল।

রাজাসাহেব তাঁহার অতি বিশ্বাসী পাচকব্রাহ্মণকে ডাকিয়া, পাঁচকড়িকে হত্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। সে পাঁচকড়িকে চিনিত। রাজাসাহেব এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে দুই সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিতে চাহিলেন এবং বলিলেন—"কার্য্য সমাধা করিয়া, টাকা লইয়া সে যেন প্রভাতের পূর্ব্বেই দেশে চলিয়া যায়।"

পাচক ব্রাহ্মণ দুই সহস্র মুদ্রার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিল। তারপর স্বীকৃত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাক্তারখানার ভৃত্য আসিয়া প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে দরজায় আঘাত করিয়া পাঁচকড়িকে জাগাইত এবং পাঁচকড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলে সে গৃহে প্রবেশ করিয়া গ্যাস নিবাইত ও গৃহ মার্জ্জনা করিত।

সেইদিনও সেইরূপ প্রত্যূষে আসিল। দরজায় আঘাত করিবামাত্র দরজা ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া গেল। সে বিস্মিত হইয়া গৃহপ্রবেশ করিল এবং শয্যার নিকটে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

পাঁচকড়ি শয্যায় নাই। রক্তে তাহার সমস্ত বিছানা প্লাবিত—শয্যা

হইতে রক্তধারা কক্ষতল পর্য্যন্ত গড়াইয়া চলিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিয়া ভৃত্য "খুন হইয়াছে" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল।

দানীশের কাণে সে রব প্রবেশ করিল। তিনি ভিতর মহলে দ্বিতলে শয়ন করিতেন। তথা হইতে ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া সে দৃশ্য দেখিয়া তিনিও চীৎকার করিতে লাগিলেন। পথের পাহারাওয়ালা চীৎকার শুনিয়া সেখানে আসিল। বাড়ীর মধ্য হইতে রাজাসাহেব, যূথিকা দাস প্রভৃতি সকলেই সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঁচকড়ির বুকের রক্ত ভাবিয়া রাজাসাহেব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। যূথিকার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। প্রাণের মধ্য হইতে করুণ বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল। দীর্ণ-বিদীর্ণ হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল—"পাঁচকড়ি নাই!"

সে আগে বুঝে নাই, পাঁচকড়ি মরিলে—পাঁচকড়ি নিহত হইলে, তাহার জ্বালা এত বাড়িবে! প্রবৃত্তি-অনুশাসিতা কামনার ক্রীতদাসী সে। আদৌ মনে ভাবে নাই যে, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার উপর অভিমান পর্য্যন্ত খাটে না। সে পূর্ব্বে কখন ভালবাসে নাই—লোকের হৃদয়-মন-প্রাণ লইয়া খেলা করিয়া—ভালবাসা চরণে দলিত করিয়া হাসিয়া কাটাইয়াছে। কিন্তু পাঁচকড়িকে সে যথার্থ ভালবাসিয়াছিল—অজ্ঞাতে তাহার চরণে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিল। এতদিনে সে বুঝিল—পাঁচকড়ি তাহার অজ্ঞাতসারে অলক্ষ্যে সর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়, এ কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! প্রাণ লইয়া খেলা কারতে করিতে এক প্রাণঘাতী ব্যাপার ঘটিয়াছে! সে নিজের বুক নিজে কাটিয়াছে। রক্ত—রক্ত—কার রক্ত—উঃ কি ভীষণ! সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, বসিতে পারিল না—জগৎ যেন হঠাৎ ভীষণ নরকাগ্নিময় হইয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দানীশ কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, রাজা-

সাহেবের কোন লোক তাঁহার স্নেহ-মায়ার আধার কনিষ্ঠ সহোদর পাঁচ-কড়িকে তাহার এই নবীন যৌবনে নিহত করিয়া গিয়াছে।

কাঁদিতে কাঁদিতে—ভৃত্যকে থানায় যাইয়া দারোগাবাবুকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সদলবলে পুলিসের ইন্স্পেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া ঘটনাস্থলে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া একখানি রক্তাক্ত ছোরা বাহির করিলেন। তারপর ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কখন আসিয়া দরজা খোলা পাইলে ?"

ভৃত্য। ভোর পাঁচটা হইবে। আমি রোজই ঐ সময় আসিয়া বাবুকে ডাকিতাম, তিনি দরজা খুলিয়া দিতেন।

ইন্। দরজা প্রত্যহই ভিতর হইতে বন্ধ থাকিত ?

ভৃত্য। হাঁ, কাল আমি রাত্রে যখন যাই, তখন বাবু দরজা বন্ধ করিলেন, ইহা আমি বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম।

ইন্স্পেক্টর দানীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হয় ঘাতক বাড়ীর মধ্যের কেহ, নয় বাড়ীর মধ্য দিয়া আসিয়া ঐ ছোরা দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে এবং অনুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় শবদেহ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তবে সংখ্যায় তাহারা একাধিক, একজনে এরূপ করিতে পারে না।"

"তবে আর কি তাহাকে পাইব না ?" এই কথা বলিয়া দানীশ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। এ উক্তি বিষাদোদ্বেলিত হৃদয়ের তীব্র উচ্ছ্বাস।

ইন্স্পেক্টর সাহেব তাঁহার অভিপ্রায়মতে অনুসন্ধান-কার্য্য সম্পাদন করিয়া বেলা দশটার সময় চলিয়া গেলেন।

দানীশ তখনও সেইখানে বসিয়াছিলেন। ভৃত্য পুলিসের অনুমতি পাইয়া গৃহতলের রক্ত ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। রক্তাক্ত বিছানা বালিশ পুলিশ থানায় লইয়া গিয়াছিল।

দানীশ তখন সেখানে একা কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য শোকে মোহে, মুহ্যমান—হৃদয়-বেলায় পড়িয়া প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। এত দীর্ঘ দিনের পরে জন্মপল্লীর কথা মনে পড়িল, সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িতেই বালকের ন্যায়, কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা, মা,—তোমার কোলের ছেলে পাঁচু আর নাই মা;—এ সংবাদ যখন পাইবে, তখন তোমার দশা কি হইবে মা? মা, মা, আমারই অসাবধানতায় তোমার নয়নমণি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে!"

এই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া দানীশের সম্মুখে দুইখানি পত্র রাখিয়া গেল! একখানি বাড়ী হইতে আসিয়াছে, অপরখানি তাঁহার পরিচিত কামারহাটীর জমিদার রামপ্রাণ বসু লিখিয়াছেন—সেখানা পোষ্টকার্ড, কাজেই আগেই সেখানা পড়িলেন।

তৎপরে খামে আঁটা বাড়ীর চিঠিখানা খুলিলেন।

পত্র, বিষ্ণু সরকার লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"দানীশ, তোমাদের বংশে তুমি লেখাপড়া ভালরূপ শিখিয়াছিলে,—আত্মীয় স্বজনে তোমার নিকট অনেক আশা করিয়াছিল; কিন্তু তুমি একেবারে অধঃপাতে গেলে! তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সকলই ফুরাইল! সে সব কথা যাক্—সর্ব্বোপরি বিপদ্; ন-বধূমাতা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে বাজে লোকে অনেক কথা বলিতেছে; কিন্তু আমরা জানিতেছি—সে নিষ্পাপ প্রাণ, অত্যাচারের বিষম দহনে অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাই না বুঝিয়া, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, শান্তি-সোয়াস্তি লাভাশায়, কোথায় উধাও হইয়া ছুটিয়াছে! তোমার মায়ের অবস্থা অতি শোচনীয়। পত্রপাঠ বাড়ী আসিবে, আসিবার সময় পাঁচকড়িকে সঙ্গে আনিবে।"

"ন-বৌ—ন-বৌ, তুমি কি অসতী! হা, হতভাগ্য দানীশ! এতদিন পরে কোন্ মুখে ন-বৌএর নাম উচ্চারণ করিতে সাহসী হইতেছ?"

দানীশ নিজে নিজে এই কথা বলিলেন, তারপরে মনে হইল, পাঁচ-কড়িকে সঙ্গে লইয়া যাইব? হায় পাঁচকড়ি, তুমি কোথায়!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় দানীশ, নিথর নিশ্চলভাবে অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া আত্মীয়-স্বজন, দেশ-বিদেশ, আকাশ-পাতাল, স্বর্গ, নরক কত কি চিন্তা করিলেন। তারপরে আপন মনে বলিলেন—অসহ্য তাপ! কি করি—কোথায় যাই? কোথায় যাইলে প্রাণের এ ভীষণ জ্বালা শীতল হয়? রামপ্রাণবাবুর বাড়ী যাই! রেলে ভ্রমণ—বাহিরের লোকের সহিত সাক্ষাতে যদি ক্ষণেক কতকটা ভুলিয়া থাকিতে পারি—এ আগুনের জ্বালা যদি একটু শীতল হয়।

দানীশ উঠিয়া বাড়ার মধ্যে গমন করিলেন। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যূথিকা স্নান-আহার করিয়াছে?"

ভৃত্য বলিল—"না! তাঁহার গতিক বড় মন্দ! তিনি পাঁচুবাবুর জন্য কেবল হাহাকার করিতেছেন—যেন পাগলের মত হইয়াছেন।"

দানীশ। কোথায় আছে?

ভৃত্য। শোবার ঘরে।

দানীশ মফঃস্বলে যাইবার পোযাক পরিধান করিয়া যূথিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে গেলেন।

যূথিকার মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী—মস্তকের চুল আলুলায়িত—বসন স্খলিত—চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। প্রকৃতই সে উন্মাদিনী হইয়াছে। সে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না, দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

দানীশ যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। উন্মাদের বিকট শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"কি! ডাক্তারবাবু যে? কনিষ্ঠ ভ্রাতার রক্তপান করিয়া পেট ভরে নাই, আবার

পেটের জন্য টাকা আনিতে যাইতেছ ?—হাঃ—হাঃ—পাঁচকড়ি—হিঃ, হিঃ আমি তাহার নাম করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত !"

দানীশ তাহার অবস্থা দেখিয়া ব্যথার উপর ব্যথা পাইলেন। বলিলেন —"যূথিকা তুমি কি পাঁচকড়িকে ভালবাসিতে ?"

যূথিকা, উন্মাদ-তীব্র-কঠোর গম্ভীর-স্বরে বলিল—"ভালবাসা ? কার ভালবাসা—ও ! পাঁচকড়িকে ভালবাসিতাম ? দূর—তুমি পাগল ! আমি হীন—সে মহৎ। আমি পাপী—সে পুণ্যাত্মা। তাহাকে কি ভালবাসিতে পারি ? তাহাকে ভালবাসিতে হইলে স্বর্গের পবিত্র প্রাণ চাই। এত যে অত্যাচার করিলাম—তাহাকে আমার করিবার জন্য তাহার পায়ে যে এত চক্ষুর জল ফেলিলাম, তবু সে ত আমার হইল না ! হবে কেন ? সে মহৎ—সে পবিত্র ! আমি তাহাকে স্বহস্তে বলি দিলাম, কিন্তু আমার কলঙ্ক-কাহিনী সে ত কোন দিন কাহারও নিকটে প্রকাশ করে নাই—ঘৃণাক্ষরে বলে নাই।"

দানীশ পড়িয়া যাইতেছিলেন। সামলাইয়া বলিলেন—"যূথিকা ! তুমি ?" সেইরূপ দানবী-দীপ্তিময়ী বিকট তীব্র-চাহনীতে দানীশের মুখের দিকে চাহিয়া, সেইরূপ উন্মত্ত-প্রলাপ স্বরে যূথিকা বলিয়া গেল—"না না, আমি নই। সব ভুল বলিয়াছি। কিন্তু জানি সব, অপেক্ষা কর। ভাবিতে দাও—পাঁচকড়িকে ভাবিতে দাও, তারপর সব বলিব।"

ঠিক এই সময়ে রাজাসাহেবের মহলে মহা গোলযোগ উত্থিত হইল। একজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে টিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আপনি শীঘ্র আসুন। আমাদের মনিব-পত্নী গলায় দড়ী দিয়াছেন। অনেকক্ষণ গো—অনেকক্ষণ, বোধ হয় প্রাণ নাই !"

দানীশচন্দ্র, রাজাসাহেবের মহলে ছুটিয়া গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, অনেক লোক জুটিয়াছে—শবদেহ মাটিতে নামান হইয়াছে। দেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে।

পুলিস আসিয়া দানীশকে জিজ্ঞাসা করিল—“ডাক্তারবাবু, লক্ষণ দেখিয়া কি উদ্বন্ধনে মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান হইতেছে? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। একই দিনে একই বাড়ীতে, একটি যুবক ও একটি যুবতী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অনুমান হয়, এই দুটি হত্যার মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে।”

দানীশ দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা বলিয়াই ধারণা হয়। করোণারের বিশেষ পরীক্ষায় সব বিষয় যথাযথ প্রকাশ পাইবে।”

পুলিস, মৃতদেহ যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পাঁচকড়ির হত্যার সহিত উদ্বন্ধনের যে সম্বন্ধ আছে, এ ধারণা পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষগণের মনে দৃঢ়ভাবেই জন্মিয়াছিল। এই সূত্র লইয়াই যে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, তাহাও পুলিসকর্ম্মচারিগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন।

রাজাসাহেব হঠাৎ বড় ভাঙিয়া পড়িলেন। তিনি দানীশকে মফঃস্বলে যাইতে দিলেন না। বলিলেন—“ডাক্তারবাবু, অপেক্ষা করুন। হাঙ্গামাটা মিটিয়া যাক্—করোণারের রিপোর্ট দেখিয়া তবে আপনি বাড়ী হইতে যাই-বেন। উপর্য্যুপরি দুইটা খুন, আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।”

পুলিস ইন্‌স্পেক্টার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজাসাহেব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন,—এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আতঙ্কের একটা ঘন আভা বিকাশ পাইতেছে। তাঁহার সন্দেহ হইল। মনে করিলেন, হয় ত পাঁচকড়ির সহিত রাজাসাহেবের যুবতী-স্ত্রীর অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার ফলে পাঁচকড়ি, রাজসাহেব বা তাঁহার কোন অনুরক্ত লোকের দ্বারা নিহত হইয়াছে এবং স্ত্রীকেও নিহত করিয়া কণ্ঠে রজ্জু আবদ্ধ করিয়া টাঙাইয়া দিয়াছে। করোণারের পরীক্ষার পর তদন্ত আরম্ভ করিবেন মনে করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু দুই তিন জন গোয়েন্দাকে বাড়ীর চারিধারে রাখিয়া গেলেন।

দানীশের প্রাণে ঘোর অশান্তি, কিন্তু তথাপি তিনি যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় রাজাসাহেবকে সঙ্গে লইয়া করোণারের পরীক্ষার ফল জানিতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, উদ্বন্ধনে মৃত্যুই ঠিক্। রাজাসাহেবকে বিদায় দিয়া তিনি কামারহাটীর রামপ্রাণবাবুর বাড়ী যাইবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করিলেন।

তখন অপরাহ্ণ চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে—দানীশ ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ীর মধ্যে দানীশ একা, সহস্র সহস্র চিন্তা তাহাদের লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া, দানীশকে ক্লান্ত, ব্যথিত ও মর্ম্মাহত করিয়া তুলিয়াছিল।

যূথিকা কি উন্মাদ হইয়া গেল! যূথিকা কি বলিতেছিল—পাঁচকড়িকে পাপ-প্রস্তাবে সম্মত করাইতে না পারিয়া হত্যা করিয়াছে? উঃ, কি সর্ব্বনাশ! তবে কি পুণ্যহৃদয় ভাই আমার ঘৃণিত বেশ্যার হস্তে নিহত হইয়াছে! আমি নরাধম, সব ভুলিয়া, গণিকার মোহে মজিয়া আছি! উঃ কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি, আমারই দোষে আমার স্ত্রী নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সময় গাড়ী কামারহাটী ষ্টেশনে দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুলীর চীৎকারে দানীশের চৈতন্য হইল। চঞ্চল, কাতর ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া দানীশ নামিয়া পড়িলেন! ষ্টেশনে তাঁহার জন্য শিবিকা ছিল—তাহাতে আরোহণ করিয়া কামারহাটী চলিলেন—ষ্টেশন হইতে কামারহাটী গ্রাম এক মাইলেরও কম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রামপ্রাণবাবুর আর্থিক অবস্থা ভাল। অনেক টাকা আয়ের জমিদারী আছে, নগদ টাকার কারবারও আছে। জমিদারীর আয় বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার কম নহে। তদ্ভিন্ন মহাজনীর আয়ও আছে। পল্লীগ্রামে রাজা মহারাজার হালে চলিবার উপযুক্ত আয়।

পল্লীগ্রামের বাড়ী বহুদূরব্যাপী। তিন চারিটী পুষ্করিণী—পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান। গোয়ালবাড়ী, গোলাবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, স্কুলবাড়ী প্রভৃতিতে অর্দ্ধেক গ্রাম তাঁহারই বাড়ী।

রামপ্রাণবাবু কৃতবিদ্য ও ধার্ম্মিক। বয়স পঁচাত্তর বৎসরের কম নহে। তাঁহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। পুত্রটি হাইকোর্টের উকীল, কন্যা দুইটি পরিণীতা ও সন্তানবতী।

দানীশের পাল্কী রামপ্রাণবাবুর বৈঠকখানার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দানীশ পাল্কী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। রামপ্রাণবাবু ডাক্তারের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন—"আশা ছিল, আপনি দুপুরের গাড়ীতেই আসিবেন; বোধ হয়, বিশেষ কাজের জন্য আসিতে পারেন নাই। যাই হোক্, আগে রোগী দেখিয়া তবে বসিবেন।"

রামপ্রাণবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একজন ভৃত্যকে আলো লইয়া আগে আগে যাইতে আজ্ঞা করিলেন! ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া অন্দরাভিমুখে চলিলেন।

দানীশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"রোগীর কি রোগ? ইতিপূর্ব্বে কি কোনও চিকিৎসক দেখিয়াছেন?"

রামপ্রাণ। রোগী নহে—রোগিণী। দেখিয়াছেন।

দানীশ। রোগ কি?

রামপ্রাণ। ভারি জ্বর—বুকে বেদনা।

দানীশ। কে দেখিতেছেন?

রামপ্রাণ। ষষ্ঠি ডাক্তার।

দানীশ। তিনি রোগের নাম কিছু বলিয়াছেন?

রামপ্রাণ। হাঁ, আগে তিনি বলিয়াছিলেন, নিউমোনিয়া; কিন্তু—কা'ল সন্ধ্যার সময় বলিলেন—আমি রোগ ঠিক ঠাওরাইতে পারিতেছি না—তাহাতেই আপনাকে চিঠি লিখিয়াছি।

দানীশ। রোগিণীর জ্ঞান আছে?

রামপ্রাণ। জ্বরের সময় থাকে না—কমের সময় ডাকিলে সাড়া মিলে।

রোগিণী-সম্বন্ধে এই সকল লক্ষণবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, তাঁহারা বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন এবং যে সুপরিস্কৃত কক্ষমধ্যে রোগিণী শায়িতা ছিল, তথায় গমন করিলেন।

রোগিণীর নিকট রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; তদ্ভিন্ন অপরাপর তিন চারিজন স্ত্রীলোকও ছিল। রকে উঠিয়া রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"তোমরা একটু সরিয়া যাও, ডাক্তারবাবু ঘরে যাইবেন।"

রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী ও আর সকলে উঠিয়া অপর একটি কক্ষের দরজার পার্শ্বে গিয়া, ডাক্তারের পরীক্ষার ফল অবগত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

রোগিণীর সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল—গৃহমধ্যে কাচাধারে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল—রামপ্রাণবাবু ডাকিলেন—"মা, এখন কি জ্ঞান হইয়াছে?"

কেহ কথা কহিল না। যে কক্ষে স্ত্রীলোকেরা ছিলেন, সেইদিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"আজ এখনও জ্ঞান হয়নাই না কি?"

রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী, অপর জনৈক স্ত্রীলোককে অবলম্বন করিয়া মৃদুস্বরে

বলিলেন—"বল্, সন্ধ্যার পর জ্ঞান হইয়াছিল, তারপর ঔষধ পথ্য খাইয়া আবার নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে ;—বোধ হয় ঘুমাইয়াছে।"

দানীশ বলিলেন—"তবে আপনারা একজন আসিয়া রোগীর নিকট বসুন। আমি হাত দেখিব—বুকটা পরীক্ষা করিব।"

একটি বিধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া রোগিণীর নিকট বসিলেন। দানীশও গিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রমণী, রোগিণীর মুখের বসন উন্মুক্ত করিল।

সেই প্রোজ্জ্বল আলোকে সান্ধ্য-কমলের সেই ব্যাধি-বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ডাক্তারবাবু চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইতেছিল, বিশেষ সতর্কতার সহিত সামলাইয়া গেলেন।

প্রৌঢ়া, রোগিণীকে ডাকিলেন। বলিলেন—"হ্যাঁগা মেয়ে, তোমার কি ঘুম আসিয়াছে ?"

রোগিণী ঘুমাইয়াছিল। প্রৌঢ়ার আহ্বানে সে চক্ষু মেলিল।

চাহিয়া কি দেখিল ? সম্মুখে তাহার জন্মজন্মান্তরের আরাধ্য-মূর্ত্তি, দীর্ঘদিবসের ধ্যানের দেবতা দানীশচন্দ্র ! এ কি অলীক স্বপ্নের অরূপ ছায়া, না প্রকৃত সশরীরী জীবন্ত মূর্ত্তি !

রোগিণী—ন-বৌ।

দানীশচন্দ্র রামপ্রাণবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মহাশয়, একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, একটু পরে না লইলে আমি রোগ পরীক্ষা করিতে পারিব না। আমার ভয়ানক মাথা ঘুরিতেছে।"

ন-বৌ জোর করিয়া উঠিয়া বসিতে যাইতেছিল—পারিল না ; গড়াইয়া পড়িয়া গেল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। ন-বৌ উন্মাদিনার ন্যায় বলিয়া উঠিল—"আমার শেষ আশা পূর্ণ হইয়াছে ; এখন সুখে মরিতে পারিব। আর একবার দেখিতে দাও—আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না।"

অনেকে ভাবিল, মেয়েটার রোগ আজ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই ভুল

বকুনিটা বাড়িয়াছে। উঠিতে যাইতেছিল, তাহাও বুঝি বিকারের ধমকে। কিন্তু সংসার রস-অভিজ্ঞ রামপ্রাণবাবু বুঝিলেন, ভগবানের এই খেলার ঘরে কোথা দিয়া কি খেলার সংঘটন হয়, কেহ বুঝিতে পারে না। এই যুবক-যুবতীর মধ্যে একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল। ডাক্তারবাবু ততক্ষণ গৃহের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন।

রামপ্রাণবাবু ডাকিয়া বলিলেন—"ডাক্তারবাবু, ফিরিয়া আসুন, রোগিণীর অবস্থা ভাল নয়। ঔষধ দিতে বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ডাক্তারবাবু কিন্তু ফিরিলেন না। তিনি উদ্বেলিত, বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল ও পীড়িত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু পুনরপি বাড়ীর মধ্যে গিয়া রোগিণীকে দেখিয়া আসিয়া, বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন। রামপ্রাণবাবুও তথায় আসিলেন। উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল।

রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"রোগিণীকে আরোগ্যের পথে না আনিয়া আপনি যাইতে পারিবেন না।"

দানাশ। আমার অধিকক্ষণ থাকিবার উপায় নাই, কলিকাতায় গুটীকয়েক কঠিন রোগী আমার হাতে আছে; অদ্যই যাইতে হইবে। কোন ভয় নাই, আপনাদের রোগিণী অচিরে আরোগ্য হইবে। জলে ডুবিয়া অনেকখানি জল খাইয়াছিল, সে জল কতক বাহির হইয়াছিল, কতক ফুস্‌ফুসে সঞ্চয় হইয়াছিল—আনুষঙ্গিক জ্বরও কিছু অধিক হইয়াছিল, কাজেই অবস্থা মন্দ ঘটিয়া গিয়াছিল। যে ব্যবস্থা করিলাম, তাহাতেই বিশেষ উপকার দর্শিবে—রোগ প্রশমিত হইবে।

রামপ্রাণ। ডাক্তারবাবু, সত্য কথা বলিবেন কি? এ রোগিণী আপনার কে?

দানীশ। আমার?—আমার কেহ—ন—য়।

রামপ্রাণবাবু। নিশ্চয়ই কেহ। বোধ হয়, আপনার স্ত্রী।

দানীশ। আমার স্ত্রী?—আপনি কোথায় পাইলেন?

রামপ্রাণ। বলিয়াছি ত, মফঃস্বল হইতে নৌকায় বাড়ী ফিরিতেছিলাম, হঠাৎ রাত্রে নদীতে মানুষের পতনশব্দ হইল, নৌকা ফিরাইয়া, যে স্থানটায় শব্দ হইয়াছিল, মাঝিদিগকে সেইখানটা খুঁজিতে বলিলাম—ক্ষণপরেই তাহারা মৃতপ্রায় এই রমণীদেহ পাইয়া নৌকায় উঠাইল।

একান্ত শুশ্রূষা-যত্নে মুমূর্ষু-দেহে প্রাণ আসিল। তৎপরে, মায়ের মত—কন্যার মত যত্ন করিয়া বাড়ী আনিয়াছি। মা আমার সেই পর্য্যন্তই অজ্ঞান, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। তবে জ্বরের জ্বালায়—ব্যাধির তাড়নায় যে সকল ভুল বকিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিয়াছি, রমণী অপাপবিদ্ধা, সংসার-জ্বালায় বিদগ্ধা।

দানীশের নয়ন হইতে অগ্নি ছুটিল। বুকের মধ্যে সহস্র সহস্র বৃশ্চিক-দংশনজ্বালা অনুভূত হইল। বলিলেন,—"না, রমণী আমার কেহ নহে।"

এই সময়ে দাসী আসিয়া বলিল—"বাবু, আপনি একবার বাড়ীর মধ্যে আসুন।"

রামপ্রাণবাবু দানীশকে বলিলেন—"ডাক্তারবাবু, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ফিরিয়া আসিয়া আপনার ষ্টেশনে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

এই বলিয়া রামপ্রাণবাবু বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন।

রোগিণীর শিয়রদেশে বসিয়া রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, আর রোগিণীর ললাটে হাত বুলাইতেছিলেন। রামপ্রাণবাবু তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"কেন ডাকিয়াছ? তোমাকে কিঞ্চিৎ আনন্দিতা বলিয়া বোধ হইতেছে। রোগিণীর অবস্থা বোধ হয় ভাল—কেমন

গৃহিণী বলিলেন—"খুব ভাল! ডাক্তারবাবুর ঔষধে যত না হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া তত হইয়াছে। এ মেয়েটি কে জান?"

রাম। কি করিয়া জানিব?

গৃহিণী। আমার দিদির মেয়ে—"শান্তি"

রাম। তোমার কোন্ দিদির মেয়ে?

গৃহিণী। আমার আবার কয় দিদি? আমরা দুই বোন্—

রাম। সাগরমণি আর নয়নমণি।

গৃহিণী। আমার মার ছেলে হয় নাই,—সবে মাত্র দুই মণি। দিদির বিবাহ হইয়াছিল শম্ভুনগরে। তাঁর স্বামী অল্প বয়সে মারা যান, তখন দিদির মাত্র একটি মেয়ে। দিদিও কিছুকাল পরে মারা পড়েন। সেই মেয়ে এই শান্তি। আমি এর নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র—কখনও চোখে দেখি নাই, তোমার প্রসাদে ঝি জামাই এতদিনে চিনিলাম—একত্রে পাইলাম—এখন বুঝিলে, শান্তি আমার বোন্‌-ঝি, ডাক্তারবাবু আমার জামাই।

রাম। শান্তির কি বেশ জ্ঞান হইয়াছে?

গৃহিণী। হ্যাঁ—আমি ওকে ওর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করায় ও বলিল, শম্ভুনগরে আমার বাপের বাড়ী ছিল, আর শ্বশুরবাড়ী—শোনপুরগ্রামে। আমি যদিও কখন শান্তিকে দেখি নাই, জামাইকে দেখি নাই, কিন্তু ওর-নাম ওর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম শুনিয়াছিলাম। হতভাগিনী আমি—আমার বাপের কুলেও কেহ নাই—দিদিও নাই। কি করিয়া ওদের দেখিব!

রাম। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কেন উনি জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। যে গ্রামের নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সে গ্রামের নাম শুনিয়াছিলাম গঙ্গারামপুর, সেখানে উনি কি করিতে আসিয়াছিলেন?

শান্তি এই সময় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, বোধ হয়, রামপ্রাণবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিবে বলিয়াই উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু

গৃহিণী উঠিতে দিলেন না ; "এখন তত কথা বলিতে গেলে অসুখ বাড়িবে ও-সকল কাল শুনিলেই হইবে।"

শান্তি আর উঠিল না বা কোন কথা কহিল না।

রামপ্রাণবাবু বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, "বড় সুখী হইলাম। কিন্তু—"

উৎকণ্ঠিতভাবে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু আবার কি ?"

রাম। ডাক্তারবাবুর মনে যেন একটা কিসের উষ্ণ দাগ লাগিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমাদের মেয়ে শান্তি পবিত্র। দয়াময় যখন এরূপ সংঘটন ঘটাইয়াছেন, তখন অবশ্য শুভফলই ফলিবে। যাহা হউক, কোন ভয় নাই ! এখন চলিলাম।

গৃহিণী কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু বলা হইল না ; রামপ্রাণবাবু তখন চলিয়া গিয়াছেন।

রামপ্রাণবাবু যদিও বৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি তাঁহার শরীরে সামর্থ্য যথেষ্ট। তিনি দ্রুতপদে বৈঠকখানার অভিমুখে গমন করিলেন।

দানীশ তখন সেখানে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তা সীমাহারা। ভ্রাতৃশোক—নিজের নিষ্ফল অপবিত্র প্রণয়-কুহকের তীব্র বেদনা, আর না-বৌএর কথা মনে হইতেছিল। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন—"শান্তি, তুমি মরিলে না কেন ? আবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম কেন ? পেঁচো মরিয়াছে, তুমি মরিলে না কেন ? আমিও সুখে মরিতে পারিতাম ! শান্তি, তুমি কি যথার্থ-ই কলঙ্কিনী ? না না, আমার শান্তি অপবিত্র হইবে কেন ? আমি অপবিত্র, শান্তি পবিত্র, সতীসাধ্বী ! কিন্তু—কিন্তু সে ঘরের বাহির হইল কেন ? ঘরে তাহার কি জ্বালা হইয়াছিল ?

ঠিক এই সময়েই হাসিতে হাসিতে রামপ্রাণবাবু সেখানে উপস্থিত।

দানীশ। তাঁহাকে দেখিয়া যেন একটু চমকিত হইলেন। ঘড়ী দেখিয়া

বলিলেন—"আমাকে এই বেলা ষ্টেশনে যাইতে হইবে; এর পরে গেলে ট্রেণ পাওয়া যাইবে না।"

রামপ্রাণবাবু অবিচলিতস্বরে বলিলেন "রাত্রে তোমার যাওয়া হইবে না।"

"তোমার!" যদিও রামপ্রাণবাবু বয়সে বড়, যদিও রামপ্রাণবাবু সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি, তথাপি তিনি কখনও কোন দিন দানীশের প্রতি 'তোমার' 'তুমি' প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। হঠাৎ এরূপ বলিলেন কেন? দানীশ যেন একটু বিরক্তিস্বরে বলিলেন—"না মহাশয়, আমাকে যাইতেই হইবে।"

রামপ্রাণবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমার স্ত্রী তোমাকে ছাড়িতে চাহেন না, আমি কি করিব বাপু; যাও তুমি তাঁর কাছে—পার তাঁর হাত এড়াইতে, যাইও। আর আমাকে কেন?"

দানীশ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"তুমি আশ্চর্য্য হইতেছ? হইবার কথা!—তুমি যে এখনও সকল কথা জান না! যাই হউক, মাত্র এইটুকু জানিয়া রাখ—তুমি আমাদের জামাই! এখনি গৃহিণীর কাছে মেয়ের ও তোমার সবিশেষ পরিচয় শুনিয়া আসিলাম।"

অনন্তর গৃহিণী মুখশ্রুত সমস্ত কথা বিস্তারিত ব্যক্ত করিলেন।

দানীশ বলিলেন—"আজ্ঞে আমিও শুনিয়াছিলাম, শ্বশুরকুলে, আমার এক মা'স শাশুড়ী আছেন, কিন্তু তাঁহার অন্য কোন সংবাদই অবগত ছিলাম না।"

রামপ্রাণবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমরাও তোমার পরিচয় জানিতাম না। তুমি কলিকাতার ডাক্তার তো কলিকাতার ডাক্তার। কোন দেশে বাড়ী, কাহার কে, সে সকল পরিচয় ত লওয়া হয় নাই। এখন বাড়ীর মধ্যে চল।"

দানীশ। আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি এই ট্রেণেই কলিকাতায় যাইব। এখন আমি আপনার সন্তান, আপনি আজ্ঞা করিলে আমাকে থাকিতেই হয়, কিন্তু—

বাধা দিয়া রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"মনে কোন সন্দেহ করিও না। আমাদের মেয়ের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক—তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কলঙ্কিনী জীবন ত্যাগ করিতে সাহস করে না। তারপরে নৌকার মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় কেবল স্বামী দেবতাকে ডাকিয়াছে, এমন সতীমেয়ে কি বৃথা-সন্দেহযোগ্য ?"

দানীশচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"সে যাহা হয় পরে বিবেচনা করা যাইবে। আমার আর এক সাংঘাতিক বিপদ ঘটিয়া গিয়াছে।"

রামপ্রাণ। কি বিপদ ?

দানীশ। আমার সব-ছোট ভাইটি আমার কাছে থাকিত। সে ডাক্তারখানাতেই শয়ন করিত। আজ সকালে ডাক্তারখানার ভৃত্য ভোরে দরজা খুলিয়া দেখে—ভাইটি খুন হইয়াছে।

রামপ্রাণবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"খুন ?"

দানীশ। আজ্ঞে, হাঁ।

রামপ্রাণ। বড়ই দুঃখিত হইলাম।

দানীশ। এখনও পুলিশের হাঙ্গামা মেটে নাই—কাজেই আমাকে যাইতে হইবে।

রামপ্রাণ। তবে আর আমি বাধা দিতে পারি না। তোমার শাশুড়ীকে এ কথা বলিব কি ?

দানীশ। গোপনে বলিবেন, রোগিণী শুনিলে শোকার্ত্ত হইবে, তাহা হইলে রোগ সারিতে দেরী হইবে।

রামপ্রাণ। হাঁ, তাহাও ঠিক।

তারপর তিনি সরকারকে ডাকিয়া, দানীশের ভিজিট্ একশত টাকা আনিয়া দিতে বলিলেন, পাল্কীও প্রস্তুত হইয়া আসিল। দানীশ বলিলেন —"টাকা এখন থাক্—একদিনেই লইব।"

রামপ্রাণবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"মেয়ে তার বাপের বাড়ী থাকিয়া অসুস্থ হইলে, ডাক্তার-জামাই ভিজিট্ লয়েন, এ প্রথা ত কলিকাতার ডাক্তারদিগের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই আছে?"

দানীশ, তদুত্তরে কিছু না বলিয়া, একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া প্রণাম করতঃ পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। বাহকগণ পাল্কী তুলিয়া ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রামসেবকের মাতা তখন গৃহকর্ত্রী, রামসেবক বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। মেজ-বৌ আগেও যাহা ছিল, এখনও তাহা আছে। মেজ-বৌএর শাশুড়ী উন্মাদিনীর মত হইয়া গিয়াছেন।

সেদিন বেলা প্রায় দশটার সময় রামসেবকের মাতা রন্ধন করিতে ছিলেন। রামসেবক সেই গৃহের দাবায় দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া, মাতার সহিত গল্প করিতেছিল। কথায় কথায় রামসেবক বলিল—"বুঝিলে মা, যার যখন উন্নতির সময় আসে, তার তখন এমনই হয়।"

মাতা গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন—"তুমি আমার কত ঠাকুরের দোরধরা ধন, এখন বেঁচে থেকে, বংশের মুখ উজ্জ্বল কর—আমি তোমাকে রাখিয়া যাই, এই প্রার্থনা।"

রাম। আমি মিথ্যে বলিতেছি না মা, এখন আমার উন্নতির মুখ! মা দেখ, এই অল্পদিন চিকিৎসা কাজে কেমন যশ হইয়া পড়িল—একমাসে প্রায় তিন-চারিটাকা রোজগার করিয়া ফেলিয়াছি! আর চাষারা আমার সব শিষ্য—যারে যা বলি,—ঘাড় হেঁট করিয়া শোনে। আর একটা খবর বলিব?

মাতা। কি বাবা ?

রাম। বদ্দিনাথপুরে মিত্তীরদের একটা মেয়ে আছে, পরীর বাচ্চার মত সুন্দরী। মেয়েটার বাবা, কোথাকার হাকিম, আমার সঙ্গে সেই মেয়েটার বিয়ে দিবার জন্য নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়াছে।

মাতা। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে বাবা! কিন্তু গহনা-গাঁটী খরচপত্র কোথায় পাইব ?

রাম। আচ্ছা মা,—সে কি আর আমাদের দিতে হইবে! মেয়ের সর্ব্বাঙ্গে সোনা আর হাজার টাকা নগদ লইয়া তবে সে কাজ করিব।

মাতা। ভগবান্ তাঁদের সুমতি দিন—গোমর করিয়া বলিতে পারি, এমন বংশ আর এমন জামাই, গঙ্গার এপারে আর কেউ পাইবে না।

ঠিক এই সময়ে গ্রামের চৌকিদার হরাবুনো তাহার পোষাক পরিয়া, পাগ্ড়ি আঁটিয়া, প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া বলিল—“কর মণ্ডশয়, বাবুবাড়ী আসুন,—দারোগাবাবু আপনাকে ডাকচেন।”

দারোগার নাম শুনিয়া রামসেবকের হৃৎপিণ্ডটা কাঁপিয়া উঠিল। রামসেবক দাবা হইতে নামিয়া যখন চৌকিদারের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, তখন মাতা গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া বলিলেন—“রাম, জামাটা গায়ে দিয়ে যা। আয়না চিরুণী বার করিয়া দেই, চুলটা একটু আঁচড়াইয়া যা—তোর চুলের মত আর চুল দেখি নাই!”

হরাবুনো হাসিয়া বলিল—“কেন মা-ঠাকরুণ, চুল আঁচ্ড়ে কি হবে ?”

রামসেবকের মাতা বলিলেন—“আমার আইবুড়ো ছেলে, নামডাকও হইয়াছে—তার উপরে যখন হাকিম হুকুমের নজর পড়িয়াছে!—”

“দারোগাবাবু বিয়ে দিতেই এসেছে।” চৌকিদার এই কথা বলিয়া হাসিল। রামসেবকের মা বলিলেন—“তবে ফিরিয়া আয়, যদিও তোর রূপের তুলনা নাই, তবু একটু যুত করিয়া যা!”

হরা বলিল—"যুত যাত সেখানে গিয়াই হইবে! আর দেরা করিও না। হাকিম বাহিরে দাঁড়িয়ে।"

রামসেবকের গতি ক্রমেই মন্থর হইয়া আসিতেছিল, হরা তখন দু-একটা ধাক্কা দিয়া গতির বেগ একটু বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, বহির্ব্বাটিতে পুলিসের দারোগার সম্মুখে হাজির করিল।

হাকিমের ভাবী জামাতার উপরে হঠাৎ হরাবুনোর এরূপ অসদ্ব্যবহার রামসেবকের মাতার চক্ষে অতি বিসদৃশ ঠেকিল। তিনি দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

দারোগার নিকটে রামসেবক পৌছিবামাত্র, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বক্র-কঠোর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দারোগা বলিলেন—"তোমার নাম কি?"

রামসেবক কাঁপিতেছিল। বলিল—"রামসেবক কর।"

দারোগা একজন কনেষ্টবলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হাতকড়ি লাগাও।"

পশ্চিমদেশীয় পাঁড়েঠাকুর তাহার পৃষ্ঠ বিলম্বিত ঝোলার মধ্য হইতে দুইটা হাতকড়ি বাহির করিয়া, একজন চৌকীদারকে বলিলেন—"পাকড়ো।"

দুইজন চৌকিদার রামসেবকের হাত চাপিয়া ধরিল, পাঁড়েঠাকুর রামসেবকের হাতে হাতকড়ি, লাগাইয়া, গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিলেন। ইহাই নাকি গ্রেপ্তারের প্রথা।

ব্যাপার-দৃষ্টে রামসেবক ও দরজার নিকট রামসেবকের মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দূরে—রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া, বিষ্ণু সরকার মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। আর একজন চৌকিদার গ্রামের ভদ্রলোক ডাকিতে গিয়াছিল, সে এই সময় কয়েকজন ভদ্রলোক ও চারি-পাঁচজন 'মোড়ল' ডাকিয়া লইয়া আসিল।

জগৎ মুখুয্যে, বিষ্ণু সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ?"

বিষ্ণু সরকার হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"ব্যাপার অপর কিছু নহে! এদের ন-বৌ বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে, শুনিয়াছ। আমার বিশ্বাস ঐ হতভাগা কর্ত্তৃকই কোন একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, উহার নিকট হইতে আসল কথা বাহির করিতে পারি নাই। তাই দারোগাবাবুকে ধরিয়াছি। তোমরা সকলে উপস্থিত থাক—আজ যদি আসল কথা বলে, সকলে শুনিতে পাইব।"

"এত ফন্দিও তোমার আসে! এই কথা বলিয়া জগৎ মুখুয্যেও হাসিলেন। তখন বিষ্ণু সরকার তাঁহাদিগকে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে চলিলেন এবং দারোগাবাবুকে বলিলেন—"মহাশয়, এ বেচারাকে মারিতেছেন কেন ? এ নেহাৎ ভালমানুষ।"

দারোগাবাবু কথা কহিতে, না কহিতে, রামসেবক কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আপনারা ত জানেন, আমি নেহাৎ গো-বেচারী—আমাকে ধরেন কেন ?"

দরজা হইতে আরো খানিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া, রামসেবকের মাতা বলিলেন—"দোহাই দারোগাসাহেব, ওকে ছাড়িয়া দাও—ও আমার নেহাৎ ভালমানুষ।"

দারোগাবাবু বলিলেন—"ভালমানুষ—গো-বেচারী বলিয়া ত আর মানুষ খুন করা চলে না ?"

রামসেবক ভীত কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"আমি খুন করিয়াছি ?"

রামসেবকের মাতা বলিলেন—"ও খুন করিয়াছে ?"

বিষ্ণু সরকার মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"খুন! রামসেবক কাহাকে খুন করিয়াছে দারোগাবাবু!"

দারোগা। কেন, এই বাড়ীর ন-বউকে।

রাম। অ্যাঁ, সে কি গো? সে গেল বেরিয়ে, আমি তাকে কেমন করিয়া খুন করিলাম?

দারোগা। চুপ্ কর্ পাজি—যখন ফাঁসিকাঠে ঝুলিবি, তখন সব জানিতে পারিবি।

"ওগো! আমার কি হবে গো—কেন ম'র্‌তে এ বাড়ীতে এসেছিলাম গো, আমার যে ঐ সবেধন নীলমণি গো—আমার যে আর কেউ নাই গো।" এই কথা বলিয়া রামসেবকের মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে রামসেবক আরও অস্থির হইয়া পড়িল। সেও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কেন ম'র্‌তে এ বাড়ীতে এসেছিলাম গো—আমার কেউ নেই গো!"

বিষ্ণু সরকার দারোগাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"সত্যই রামসেবকের কেউ নাই। ভাল, ও যদি সত্যকথা বলে তবে কি ওর ফাঁসিটা মাফ্ করাইয়া দিতে পারেন?"

দারোগাও হাসিলেন। বলিলেন—"হাঁ, সত্য কথা বলিলে তা' পারি। কিন্তু ও ভারী পাজী—ভারি বদমাইস্—কখনই সত্য কথা বলিবে না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রামসেবকের মাতা বলিলেন—"ও-বংশে কখনও পাজী বদ্‌মাইস্ জন্মে নাই গো—সেই বউটাই পাজী বদ্‌মাইস্ ছিল গো। তারই জন্যে এত কাণ্ড ঘটেছে গো!

বিষ্ণু সরকার রামসেবকের মাতাকে ধম্‌কাইলেন। বলিলেন—তুমিই তোমার গোপালকে এতদূর বদ্‌মাইস করিয়া তুলিয়াছ। তোমারই আদরে রামসেবক অধঃপাতে গিয়াছে। এখনও যদি সত্য কথা বলিতে না দাও, তাহা হইলে আর কিছুতেই রক্ষা হইবে না। এখনও সত্য বলুক—তাহা হইলে দারোগাবাবু বে-কসুর খালাস দিবেন। উনি সব জানিতে পারিয়াছেন।"

রামসেবক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি বলিতেছি গো, সব সত্য

বলিতেছি—মা ত আর ফাঁসি যেতে যাইবেন না, ফাঁসি যেতে আমিই যাইব ; মার কথায় আমি কি আর মিথ্যে বলিব ? বিশেষ আমার গলায় ত্রিকণ্ঠি মালা।”

দারোগা। বল্ ;—সত্য বল্, ন-বউ কোথায় গেল ?

রাম। সত্য বলিতেছি হুজুর, সে যে কোথায় গেল, তার খোঁজ আমি পাই নাই। লোক দ্বারায় খুঁজিয়াছিলাম—সন্ধান পাই নাই।

দারোগা। এক বর্ণও মিথ্যা বলিও না—তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে ছাড়িয়া দিব। আচ্ছা, বল ত, গেল কেন ?

রাম। আমি তামাসা করিয়া একটা কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া।

দারোগা পুনরায় রামসেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তামাসা করিয়া তাঁকে কি বলিয়াছিলে ?”

রাম। আমার সঙ্গে কথা-টথা কহিতেন না, তাই কথা কহাবার জন্য আমি মধ্যে মধ্যে জিদ্ করিতাম।

দারোগা। তাতে তিনি কি করিতেন ?

রাম। আমার পিসীর সাক্ষাতে সব বলিয়া দিতেন। কোন দিন পিসী আমাকে সামান্য কিছু বলিতেন—কোনদিন কিছু বলিতেন না। তাতে ন-বৌ প্রায়ই কাঁদিতেন।

দারোগা। তারপর ?

রাম। সেদিন কিছু বেশী কান্না-কাটি করায় আমি বলিয়াছিলাম তোমার সতীগিরি আমি বার করিয়া দিব,—একদিন রাত্তিরে জনকয়েক চাষা ডাকিয়া আনিব, তারপর তোমাকে একদিকে নিয়াই যাইব, কেহ রাখিতে পারিবে না। সে বেটী এমনি বোকা আমার ঐ ফাঁকা কথাতেই ভয় পাইয়া সেদিন রাত্তিরেই পলাইয়া গিয়াছে।

দারোগাবাবু, বিষ্ণু সরকারের মুখের দিকে চাহিলেন। বিষ্ণু সরকার ক্রোধ কর্কশ-স্বরে বলিলেন—“শোন রামসেবক, তুমি এতদিন গ্রামের মধ্যে কি কথা বলিয়া বেড়াইয়াছ, মনে আছে কি ?”

রামসেবক বলিলেন—"আজ্ঞে, আছে বৈকি। আমি বলিয়াছি, একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পলাইয়াছে।"

বিষ্ণু। সে কি, মিথ্যা কথা?

রাম। হাঁ মিথ্যা কথা।

বিষ্ণু। আগেকার কথা মিথ্যা, কি পাছেকার কথা মিথ্যা—তার প্রমাণ কি?

রাম। প্রমাণ আমার পিসীমা—যে রাত্রে আমি তাকে কথা কহাইবার জন্য জিদ্ করি, সে রাত্রে সে আমার পিসীমার নিকটে গিয়া আমার নামে নালিশ করে—কত কাঁদে। পিসামা তার প্রতিকার করেন নাই। আমারও তখন ভারি লোভ জন্মে—তার পরে আমি—

"ব্যস্, আর বলিতে হইবে না।"—এই কথা বলিয়া বিষ্ণু সরকার একটী ছেলেকে বাটীর মধ্যে যাইয়া নিস্তারকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। নিস্তার দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। সে হাজির হইল। বিষ্ণু সরকার বলিলেন—"তুই কি এখানেই ছিলি?"

নিস্তার। হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি।

বিষ্ণু। মেজ-বউমাকে তবে কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আয়, রামসেবক সত্য কথা বলিতেছে কি না?

নিস্তার চলিয়া গেল, সকলেই তাহার আগমন-কাল প্রতীক্ষায় উদ্-গ্রীব হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিস্তার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মেজঠাকরুণ বলিলেন—আমি জানি, ন-বউএর কোন দোষ নাই। রাম-সেবকের অত্যাচার ভয়েই সে গৃহত্যাগ করিয়াছে। আমি সময়ে সাবধান হইলে, এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না।"

তখন বিষ্ণু সরকার সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা জানেন, সতী-লক্ষ্মীর নামে কলঙ্ক রটিয়াছে; তিনি জীবিত থাকুন, আর অমূল্য নিধি সতীত্ব-রক্ষার জন্য জীবন নষ্ট করিয়াই থাকুন, আপনারা

সকলে জানুন, সকলে ভাল করিয়া শুনুন—তিনি সতী। শাশুড়ীকে বলিয়া, মেজ-যাকে বলিয়া, যখন তিনি প্রতিকার পান নাই—স্বামীকে জানাইবার উপায় করিতে পারেন নাই, তখন নিরাশ্রয়া হতভাগিনী অমূল্য-ধন হারাইবার ভয়ে, অগত্যা গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া, স্বীয় সতীত্বরক্ষা করিয়াছেন।”

কথা শুনিয়া সকলের চক্ষু-কোণে জল আসিল। দারোগাবাবুর আদেশে একজন চৌকিদার, রামসেবকের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। সকলেই রামসেবকের নামে অভিসম্পাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

রামসেবক সজলনয়নে হাতকড়ির দাগ দেখিতে দেখিতে কোঁচার কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ও-পাড়ার রায়েদের মেয়ে সারদা আসিয়া সেজ-বৌকে ডাকিল—“শিবু কোথায় আছিস্? কতদিন দেখা হয় নাই; আমি কাল শ্বশুরবাড়ী যাইব, তাই একবার দেখিতে এলাম।”

সেজ-বৌ তখন সন্ধ্যার প্রদীপ গুছাইতেছিল। সে বলিল—“আয় ভাই—কতদিন তোকে দেখি নাই! শ্বশুরবাড়ী যাইবি?—রমণীর মহাতীর্থ শ্বশুরবাড়ী?—তোকে দেখিলেও পুণ্য আছে।”

সেজ-বৌএর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। আগে হইতেই তাহার মুখ ম্লান, চক্ষু জলভারাক্রান্ত, প্রাণ বিষাদিত ছিল।

সারদা বলিল—“তুই আবার শ্বশুরবাড়ীর এত ভক্ত কবে হইলি? চির-কালটা যে, সে নামেতে চটা ছিলি? তোর দেহ অত রোগা হইল কেন?”

সেজ-বৌ। চল্ ঘরে চল্—কতদিন তোর দেখা পাই নাই। এ প্রাণে কত জ্বালা, তুইও শুনিস নাই—যদি এলি, তবে একটু শুনিবি চল্।

সারদারও মুখখানা একটু ম্লান হইল, বলিল—"চল্ ভাই! তোর ভাব দেখে আমারও ভয় হ'চ্চে! ব্যাপার কি খুলে ব'ল্বি চল্ দেখি।"

সেজ-বৌ তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করিয়া, সারদাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিল।

সারদা বলিল—"তোমার দিদি এসেছে না? প্রায় একমাস এসেছেন শুনেছি;—তা' একবার এসে দেখা কর্‌তেও পারিনি।"

সেজ-বৌ। হ্যাঁ, দিদি প্রসব হইতে আসিয়াছেন। তিনি বড় চাকুরের বৌ—নড়িয়াও বসেন না। আমি হতভাগিনী—আমার স্বামী গরীব—তাঁর কাজ, তাঁর ছেলে-মেয়ের কাজ, সবই আমাকে করিতে হয়। একটু না পারিলে তিনি রাগ করেন, মা কত অবজ্ঞা বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করেন। সারদা রে! আগে জানিতাম না, পতি-দেবতার চরণ-পার্শ্বেই রমণীর সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে! সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিয়া মরি—কেহ একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করেন না—একটু জল খাইলাম কি না খোঁজ করে না। তখন বুঝি নাই যে, স্বামীর মানে রমণীর মান, স্বামীর খাতিরে রমণীর খাতির। সেবার আমার অসুখ হইলে, প্রাণ দিয়া চিকিৎসা শুশ্রূষা করিয়াছেন—কিন্তু আমি হতভাগিনী, তখন তাঁহার গৌরব বুঝি নাই! এখন বুঝিয়াছি! সেদিন ভারি জ্বর হইয়াছিল—দশ দিন ভুগিলাম, উপবাস দিলাম—জল আর কয়েক টুক্‌রা মিছরী, তাহাও কেহ ঠিক সময়ে দিত না!—বাস্তবিক ভাই, আর সহ্য হয় না—আর কি তাঁহার দেখা পাইব না?"

তাহার দুই চক্ষু হইতে জল ঝরিয়া পড়িয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"শোন্ সারদা, আমি হতভাগিনী—বড় পাপিনী—পাপের জ্বালায় বড় জ্বলিতেছি। আমার অবস্থা মনে রাখিও—স্বামী আর শ্বশুরবাড়ী, ইহাই রমণীর ইহসংসারের সুখসম্পদের আগার! স্বামী ও তৎসংস্পৃষ্ট যাহা কিছু—যে কেহ, সকলের যত্নব্রতী ও

ভক্তিমতী হইও—সে সকলের উপর প্রাণ ঢালিয়া দিও, তাঁহা হইলেই সকল ব্রতের—সকল তীর্থের ফল পাইবে।”

সারদারও চক্ষুকোণে জল আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—“রায়-মহাশয়ের কি কোন খবর পাস্‌নি?”

সেজ-বৌ। না। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন। আমাকে তিনি প্রাণ হইতেও ভালবাসিতেন। কিন্তু আমি হতভাগিনী—আমার ভাগ্যে অত সহিবে কেন? আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছি তিনি তাহাই করিয়াছেন—আমার সুখের জন্য বর্ষার ধারা নিদারুণ রৌদ্র তাপ, সমস্তই অকাতরে সহ্য করিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম বলিয়া, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া সব পরিত্যাগ করিয়া, আমার বাপের বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমি সুখে আছি ভাবিয়া তিনি কত অপমান, কত অবহেলা, কত ঘৃণা সহ্য করিয়াছেন। তারপর আমি কি করিয়াছি? তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করা—তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা—দূরের কথা—আমি যাহা করিয়াছি, তাহা আর তোকে বলিব না সারদা! তবে এই বলি, যাহা করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই অবজ্ঞা, আর অসহ্য প্রাণের জ্বালা! সারদা,—আর দেখা পাইব না—আর তেমন করিয়া কেহ স্নেহ করুণা করিবে না। সে যাক্—কিন্তু তাঁহার একটি খবর পাইলেও সুখী হইতাম—সেই যে ছল-ছল-নেত্রে বিদায় হইয়াছেন—আর আসিলেন না। আমি হতভাগিনী যে, সে সময়ও একবার কথা কহি নাই।

সেজ-বৌ আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সারদা সমবেদনার স্বরে বলিল—“এ সময় তুই শ্বশুরবাড়ী যা! সেখানে গেলে কতকটা শান্তি পাইবি।”

গলা ঝাড়িয়া সেজ-বৌ বলিল—“সারদা, আমারই পাপে সে সুখের সংসার পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে, নন্দনকানন মরুভূমে পরিণত হইয়াছে। সেখানে এখন গিয়া কি করিব?”

সারদা বলিল—"এত উতলা হ'স না। ভগবানকে ডাক্—তিনি সদয় হইবেন। আবার রায় মহাশয় বাড়ী আসিবেন। তুই যা—শ্বশুরবাড়ী যা।"

সেজ-বৌ। ভগবান্‌কে ডাকিবার আমার অধিকার নাই। যে পাপিনী স্বামীকে অভক্তি, অশ্রদ্ধা করিয়া [illegible] পাপিনী স্বামীকে অনন্ত জ্বালায় জ্বালাতন করিয়াছে, সে ভগবান্‌কে ডাকিবার অধিকারী নয়। যাক্, আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফলভোগ করিয়াছি—করিতেছি—আরও না জানি কতই করিব।

এই সময় হরিচরণ একখানা পত্র হ'তে করিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। মাতা ও ভগিনী শিবুকে ডাকিলেন; তাঁহারা আসিলেন এবং মাতার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, শিবমোহিনীর সঙ্গে সারদা প্রভৃতিও সেখানে উপস্থিত হইল।

হরিচরণ সেইরূপ হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন—"ভাগ্যি ফিরেছে মা, তোমার ছোট মেয়েকে নিতে ওর শাশুড়ী গাড়ী আর পত্র পাঠিয়েছেন।"

হরিচরণের মাতা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আমার ভাগ্যি! কেন মানীলোকের বেটা বাড়ী এসেছেন না কি?"

"না। এই পত্র শোন।"—এই কথা বলিয়া হরিচরণ পাঠ করিলেন—

"হরিচরণ, বাবা, আমার অদৃষ্ট ও দুর্ঘটনার কথা বোধ হয় সমস্তই শুনিয়াছ। রামসেবক রামসেবকের মাতা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। রামসেবকের মাতা ইদানীং দুটো রাঁধিয়া দিতেছিল। এখন একমুঠা ভাত রাঁধিয়া দেয়, এমন লোক নাই। যে কয়দিন যন্ত্রণা আছে—যে কয়দিন পাপের ভোগ আছে—যে কয়দিন জীবিত আছি—সে কয়দিন পোড়া উদরে দুটো দিতেই হবে!—কিন্তু করে কে?—মেজ-বৌমা শোকাতুরা। তাই গাড়ী পাঠাইলাম, সেজ-বৌমাকে এই গাড়ীতে অবশ্য অবশ্য পাঠাইবে। নিস্তারও সঙ্গে গেল; যতীশের সংবাদ পাইয়াছি—সে প্রাণে

আছে মাত্র। ক্ষিতীশ, দানীশ ও পেঁচোর কোন সংবাদ নাই। আমি কিরূপ অবস্থায় আছি, ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ!

চির-আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার মাউই মাতা"

হরিচরণের মাতা গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"যাচ্ছে, আমার মেয়ে তাঁর রাঁধুনিবৃত্তি দাসীপনা ক'রতে। কৈ, নিস্তার কৈ—তাকে ভাল ক'রে একবার দশকথা শুনিয়ে দিই,ঝেড়ে কাপড়পরিয়ে দিই দাঁড়াও ত!"

সারদা বলিল—"না খুড়ীমা, পাঠিয়ে দেবে বৈ কি! শাশুড়ী—গুরুলোক,—তাঁর সেবা কর্‌তে যাবে বৈ কি!"

উচ্চগ্রামে স্বর তুলিয়া হরিচরণের মাতা বলিলেন—"ওরে আমার গুরুলোকের সেবা!—এতদিন ছিলেন কোথায়? এখন আমার বড় মেয়েটা এসেছে—আজ বাদে কাল সে প্রসব হবে, এখন কি না আমি ওকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দি। ও গেলে, কে কি ক'র্‌বে?"

নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে সেজ-বৌ বলিল—"আমি যাব।"

মা। যাবি—তা যা, কিন্তু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আবার ছুটে তখন যে আস্‌বি, তা আর হ'চ্চে না! এ বাটীতে আবার তোমার স্থান হবে না মা!—তা বেশ মনে জেনো!

সেজ-বৌ সে কথার কোন উত্তর করিল না। মনে মনে বলিল—"তাই হবে মা! যদি সেখানে—সেই পবিত্র-তীর্থে স্থান না হয়, নদীতে স্থান হবে।"

নিস্তারিণী পুকুরে হাত-মুখ প্রক্ষালন করিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া সারদা বলিল—"শিবু,তবে যাই?"

সেজ বৌ ছলছল নেত্রে তাহার দিকে চাহিল। সে নয়নেঙ্গিতে জানাইল—"যাস্‌, কিছুতেই বারণ শুনিস্‌ না।"

সপ্তম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ দিবসের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং নিষ্ফল প্রয়াস ক্লেশ, যূথিকার হৃদয়ে যে বেদনা জাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে পাঁচকড়ির বক্ষ-রক্ত পতিত হইয়া তাহা একেবারে অসহ্য—সুতীক্ষ্ণ—ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে।

যূথিকা কিছুতেই হৃদয় স্থির করিতে পারিতেছে না। ভৃত্য স্নান করিতে অনুরোধ করিল, পাচক আহার্য্য লইয়া সাধিল, সে স্নান বা আহার করিল না। তাহার চক্ষু তখন র্দ্ধে উঠিয়াছে; বেশ আলুথালু—কেশপাশ অযত্ন-বিন্যস্ত।

দানীশ চলিয়া গেলে, ভৃত্যকে রাজাসাহেবের বাড়ীর সংবাদ জানিতে পাঠাইল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"রাজসাহেবের স্ত্রী গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছেন।"

যূথিকার উদ্বেলিত হৃদয় আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় ভৃত্যের অনেক সাধাসাধি ও সবিশেষ চেষ্টায়, সামান্য আহারীয় দ্রব্য ও একগ্লাস জল তাহার উদরস্থ হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; ভৃত্যকে থানায় পাঠাইয়া দিল। বলিয়া দিল,—"এখনই যেন ইন্‌স্পেক্টরবাবু এখানে আসেন। খুনের বিষয়ে আমি অনেক কথা জানি, তাঁহাকে বলিব।"

সংবাদ পাইবামাত্র পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যূথিকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মূর্ত্তি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর বুঝিলেন—এ রমণী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নাই। হয়, এ নিজেই খুন করিয়া এখন হৃদয়ের অশান্তিতে খুন স্বীকারে উদ্যত হইয়াছে, নয় খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

যূথিকা গম্ভীর-মুখে উদাস-স্বরে বলিল—"দারোগাবাবু, সে নাই—

আর আসিবে না—যাহাতে তাহার হত্যাকারী ধৃত হয়, দণ্ড পায়, ইহাই আমার ইচ্ছা।”

ইন্‌স্পেক্টর। আমাদেরও সেই ইচ্ছা। তবে কোনরূপ সূত্র না পাইলে হত্যাকারীকে ধৃত করা কঠিন।

যূথিকা। সূত্র কেন? আমি হত্যাকারীর সংবাদ পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারি!

ইন্‌স্পেক্টর। বলুন না। এখনই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইব। কে সে?

যূথিকা। রাজাসাহেব।

ইন্‌স্পেক্টর। মাড়োয়ারী?

যূথিকা। হাঁ।

ইন্‌স্পেক্টর। নিজে?

যূথিকা। হয় নিজে—নয় কোন লোক দ্বারা। তাঁহাকে ধৃত করিলেই সকল কথা প্রকাশ পাইবে।

ইন্‌স্পেক্টর। ঘটনাটা কি বলুন দেখি।

যূথিকা। রাজাসাহেবের স্ত্রীর সহিত পাঁচকড়ির ভালবাসা ছিল, রাজাসাহেব তাহা জানিতে পারিয়া পাঁচকড়িকে খুন করেন এবং স্ত্রীকে অত্যন্ত প্রহার ও তাড়না করায় অভিমানে, রোষে, ক্ষোভে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ইন্‌স্পেক্টর। আমরাও তাহাই অনুমান করিয়াছি। কিন্তু প্রমাণ ব্যতীত মোকদ্দমা রুজু বা গ্রেপ্তার করা চলে না।

যূথিকা। প্রমাণ!—যথেষ্ট আছে।

ইন্‌স্পেক্টর। কি কি বলুন?

তখন যূথিকা ইন্‌স্পেক্টরের নিকট প্রমাণসম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। যূথিকার হৃদয়ে যেন নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই; এই সমস্ত মিথ্যা-কথা সেই নরকের সুতীব্র উচ্ছ্বাস।

সকল কথা মনঃসংযোগে শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন—"আমি আপনার কথিত সূত্রগুলি ধরিয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলাম। অনুসন্ধান-ফল যথাকালে জানাইব।" তাহার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দানীশচন্দ্র শেষ-রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। যূথিকা যে গৃহে শয়ন করিত, সেই গৃহে গিয়া দেখিলেন, যূথিকা উন্মাদিনীর বেশে একখানা সোফার উপরে পড়িয়া আছে। তখন সে নিদ্রিতা! কিন্তু সে নিদ্রা সুখনিদ্রা নহে। দানীশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, বিবিধ স্বপ্ন দেখিতেছে—সে স্বপ্ন যন্ত্রণাদায়ক। তাহার মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে, শিরা-প্রশিরা অস্বাভাবিকরূপ স্ফীত, কুঞ্চিত ও বক্র হইয়া উঠিতেছে। দানীশ বুঝিলেন—পাপ-চিন্তার স্রোত স্বপ্নরূপে বিকাশ পাইয়া যূথিকাকে দহন করিতেছে।

দানীশচন্দ্র যূথিকাকে ডাকিলেন। সে জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; উদাস উন্মাদ-নয়নে চারিদিকে চাহিল। বক্র-কঠিন দৃষ্টিতে দানীশের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"তুমি ত পাঁচু নও। তবে কেন আসিয়াছ? যূথিকার ভালবাসা লইতে? হাঃ হাঃ, ভালবাসা—মিছে কথা! ইন্দ্রিয় সংগ্রামের বাদ্যকর তোমরা—তোমরা ভালবাসার কি ধার ধারো? পাঁচু জানে—জীবনের ধ্রুবতারায় লক্ষ্য রাখিয়া কেমন করিয়া মরিতে হয়। সে জানে—তাই ত সে মহৎ, সে পবিত্র! তুমি যাও—আর আসিও না। আমার সাধের ধ্যান ভাঙিলে কেন?"

দানীশ। যূথিকা, তুমি কি যথার্থই পাগল হইলে?

যূথিকা। হাঃ হাঃ—পাগল হইলাম?—না, এতকাল পাগল ছিলাম, এতদিনে প্রকৃতিস্থ হইলাম; যে স্বরূপ বুঝিতে পারে না, সেই পাগল! তুমি এখনও পাগল আছ। পোষা কুকুরের মত এখনও তাই আমার পিছু পিছু ছুটিতেছ। কেন ছুটিতেছ? ভালবাসার লোভে? বলিয়াছি

ত ভালবাসিতে জানিতাম না! পাঁচুর কাছে শিখিয়াছি, কিন্তু সে শিখাইয়াই তার মূলশুদ্ধ কাটিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন তার ভালবাসা গোপনে হৃদয়মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছিলাম, তুমি অজ্ঞান-অন্ধ, তাই দেখিতে পাও নাই! সে মহৎ—পবিত্র—শুদ্ধ; সে এ অপবিত্র হৃদয় লইবে কেন? তোমার মত লোকে ভুলে!—সে ভুলিবে কেন? মহৎ শোণিতে হৃদয়ের ক্লেদ ধুইয়াছি—আর তোমাকে ছুঁইব না। তুমি পিশাচ, তাই পিশাচীর প্রেমের লোভে পিছু পিছু ঘুরিতেছিলে।

বলিতে বলিতে যূথিকার নয়নদ্বয়ে জ্বলন্ত বহ্নিতেজ বিনির্গত হইল। সে দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

এতদিনে দানীশের প্রাণে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, "যথার্থই আমি পিশাচ! যথার্থ-ই আমি যাহা পবিত্র, যাহা শান্ত, যাহা সুশীতল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নরকের পিছু পিছু ছুটিতেছি, তাই বুঝি ভগবান্ ইহার শাস্তি দিয়াছেন।—তাই বুঝি আমার শান্তি, আমার বুকে অশান্তির নরকাগ্নি জ্বালাইবার জন্য কুলত্যাগ করিয়াছে! সত্যই কি সে কলঙ্কিনী?—না না, সে অত্যাচার-বিষে অস্থির হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। রামপ্রাণবাবু বলিয়াছেন—'পাপী মরিতে সাহস করে না।' সে কথা সত্য! অজ্ঞান অবস্থাতেও শান্তি আমাকে ডাকিয়াছে। রামপ্রাণ-বাবু শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, বহুদর্শী; তিনি মিথ্যা কথা বলিবেন না, তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন না। তবে ত আমার শান্তি আমারই আছে।"

তখন যূথিকা? যূথিকা আমাকে ছলনায় ভুলাইয়া রাখিত। ইন্দ্রিয়-দাস আমি—আমি তাহার হৃদয় বুঝি নাই। পাপিষ্ঠা, তাহার ছলনা কুহকের সহায়তায় আমারই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বশ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিল,—সে বুদ্ধিমান্, বুঝিয়াছিল, ইহা পাপ—ইহা প্রতারণা। আহা-হা। সে এই পাপ-প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়াতেই, তাহার অমূল্য-জীবন হারাইয়াছে!

যূথিকা তাঁহার রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"কি ভাবিতেছ? আমার কথা? মনে কর, যূথিকা মরিয়াছে! আমার কাছে আর আসিও না। শুনিয়াছি তোমার স্ত্রী আছে, তার কাছে যাও! ডাক্তারখানা আমি চাহি না—তুমি যত্ন করিয়া করিয়াছ, উহা তুমি নাও। আমার যে টাকা আছে, তাহা হইতেই জীবনের বাকি দিনকয়টা কাটাইয়া দিব। স্পষ্ট বলিতেছি, আর আসিও না। হতভাগীর জ্বলন্ত-হৃদয়ের আছে আর আসিও না। আমি নিশ্চিন্তমনে সেই পবিত্র চরিত্র চিন্তা করিব। আসিলে তোমার ভাল হইবে না।"

দানীশের হৃদয় তখন অনুতাপের ভীম-বহ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল! সে মুহূর্ত্ত বড় জ্বালাময়!

দানীশের জীবনের সেই শুভ-মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। সে, সেই দিব্যবহ্নিতে পুড়িয়া পবিত্র হইল; দানীশের চক্ষে তখন যূথিকা, রাক্ষসী বলিয়া প্রতীয়-মান হইল। দীর্ঘদিনের সাজানো বাসনা বিদগ্ধ বিধ্বস্ত করিয়া দানীশচন্দ্র ডাক্তারখানায় চলিয়া গেলেন। সেখানে বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিয়া ভোরের গাড়ীতে কামারহাটি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামারহাটী পঁহুছিতে বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। সেখানে গিয়া শুনিলেন, শান্তির অবস্থা খুব ভাল। অন্যদিন সে সময়ে জ্বর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সেদিন আর তাহা হয় নাই। রোগিণী বসিয়া সকলের সহিত গল্প-গুজব করিতেছে।

সেদিন সে বাড়ীতে দানীশের "জামাই আদর"। দানীশের শাশুড়ী (তাঁহার স্ত্রীর মাসী) জামাতাকে কত যত্ন আদর, মিষ্টভাষ, আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়া, আর কখনও যাহাতে মেয়ে জামাই বিচ্ছিন্ন না হন, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

রামপ্রাণবাবু সংসারে থাকিয়া গলিতকেশ হইয়াছেন; সুতরাং দানীশের মনোভাব বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। আহারাদির পরে দানীশকে বলিলেন—“বাবাজী, এখন একটা কাজ করিতে হইবে।”

দানীশ। কি?

রামপ্রাণ। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র। এখানে বিশ্বাস অতিশয় দৃঢ় থাকা চাই—অবিশ্বাসের বা সন্দেহের লেশমাত্র থাকিলেও একান্ত অসুখের কারণ হয়। অতএব আমি একটা প্রস্তাব করিতেছি।

দানীশ। আজ্ঞা করুন।

রামপ্রাণ। শান্তির চরিত্র পবিত্র, সে তাহার অমূল্য নারী-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিল। তথাপি তোমার মনে সন্দেহ হইতে পারে, সেই সন্দেহের পরিণাম মনঃকষ্ট—অশান্তি।

দানীশ। আপনি জ্ঞানী, আপনার অনুমান অসত্য হইতে পারে না।

রামপ্রাণ। এখন তোমাদের হিতৈষিগণের কর্ত্তব্য—তোমাকে শান্তির পবিত্র চরিত্রের প্রমাণ দেওয়া। তজ্জন্য আমি তোমাকে লইয়া অদ্যই গঙ্গারামপুরে যাইতে চাহিতেছি।

দানীশ। সেখানে গেলে কি হইবে?

রামপ্রাণ। শান্তি তাহার মাসীর নিকট যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সমস্ত সত্য কি না, আমাদিগকে তাহার অনুসন্ধান লইতে হইবে।

দানীশ। আপনি পরমাত্মীয়, উভয়েরই হিতৈষী। এস্থলে আপনি যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন। বলা বাহুল্য, ভ্রাতৃশোকের বিষম আগুনে আমার অন্তর নিরন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। অধিকন্তু, এ জ্বালাও নিতান্ত সামান্য বা উপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং আমার মাথার বড় স্থিরতা নাই।

নদীতে রামপ্রাণবাবুর নৌকা সজ্জিত ছিল—আজ্ঞামাত্র ভৃত্যগণ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া আসিল। পরে নিমুর অঙ্গরাখা গায়ে

আঁটিয়া, চারিজন পশ্চিমদেশীয় বলবান্ বরকন্দাজ এবং একজন পাচক ও একজন ভৃত্য নৌকায় উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই রামপ্রাণবাবু ও দানীশচন্দ্র নৌকায় আরোহণ করিলেন। দাঁড়িগণ নৌকা খুলিয়া দিল।

দানীশচন্দ্র,এবার আসিয়া পর্য্যন্ত একবারও শান্তির সহিত দেখা করেন নাই। রামপ্রাণবাবু বা রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী, সেজন্য চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা যুক্তি করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যখন দানীশ প্রমাণ পাইয়া শান্তির চরিত্রে শ্রদ্ধাবান্ নিঃসন্দেহ হইবেন, তখন দেখাশুনা করা ভাল। সন্দেহবোধে যে উচ্ছ্বসিত আবেগ রুদ্ধ আছে, সে বাঁধ ভাঙিয়া গেলে অদম্য বেগে তাহা উদ্বেলিত হইয়া প্রবাহিত হইবে। চিকিৎসার ভার—রামপ্রাণবাবুর নির্দ্দেশমতে দানীশের সহিত পরামর্শ করিয়া, স্থানীয় ষষ্ঠী-ডাক্তারই লইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কামারগাটী হইতে গঙ্গারামপুর নৌকাপথে যাইতে হইলে, সে প্রায় তিন দিনের পথ। দুই দিনরাত্রি অবিরাম নৌকা চালিয়া, তিন দিনের দিন বিকালবেলা গঙ্গারামপুরে পঁহুছিল।

রামপ্রাণবাবু দানীশচন্দ্রকে লইয়া তীরে উঠিলেন। দুবে ও চোবে দুই ঠাকুর লাঠি ঘাড়ে করিয়া তাঁহাদের অগ্র-পশ্চাতে গমন করিল। অপরেরা নৌকায় রহিল।

তাঁহারা গোপাল দের বাড়ীর সন্ধান করিয়া উপস্থিত হইলেন। দে-মহাশয় তখন একটা থেলো হুঁকায় তামাক সাজিয়া ধূমপানে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ লালপাগড়ী আঁটা বৃহৎ যষ্টিস্কন্ধে দুইজন বরকন্দাজ ও দুইজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইতে দেখিয়া, ভীত হইয়া হাতের হুঁকা মাটিতে ফেলিয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

রামপ্রাণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি বাপু?"

ঢোঁক গিলিয়া দে মহাশয় বলিল—"আজ্ঞে, গোপালচন্দ্র দে।"

রাম। আজ কয়েকদিন হইল একটি মেয়ে তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিল?

গোপাল। আজ্ঞে না, না, আমরা গরীব।

রাম। মিথ্যা বলিও না। কোন ভয় নাই। কিন্তু মিথ্যা বলিলে বিপদে পড়িবে।

গোপালচন্দ্র প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"মহাশয়, সেই মেয়েটির জন্যই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।"

রাম। কি হইয়াছে?

গোপাল। তবে শুনুন, আমি ত যাইতেই বসিয়াছি। রায় মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমার ভিটেমাটি চাটি করিয়া, জানবাচ্চা একগাড়ে না পুঁতিয়া ছাড়িবেন না!

রাম। ভয় কি তোমার? বল না।

গোপাল। সেই মেয়েটি একদিন খুব ভোরের বেলা নদীর কিনারায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, আমার স্ত্রী আর মণ্ডলদের মেজবৌ জল আনিতে গিয়া তাহাকে দেখিতে পান, আমার স্ত্রী সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনেন। পথে রায়-মহাশয় মেয়েটিকে দেখেন। তাঁহার স্বভাব ভাল নয়; তিনি এক বিধবাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠান। আমার স্ত্রী সেই কথা শুনিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠে। মেয়েটা খুব ভাল, সতীলক্ষ্মী! সে শুনিয়া হাপুস্‌নয়নে কাঁদিতে লাগিল, আর ভগবান্‌কে ডাকিয়া রায়-মহাশয়ের নামে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

দানীশ একটি উষ্ণ রুদ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, একটু সরিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

গোপাল। বষ্ঠী মী ফিরিয়া গিয়া সে কথা রায়-মহাশয়কে বলিলে, রায়-

মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠান। আমি গেলে আমাকে বলেন, মেয়েটিকে আমায় দাও, আমি তোমায় পুরস্কার দিব। আর যদি না দাও, তোমার বিশেষ অনিষ্ট করিব। তা ছাড়া, এ কথাও বলিলেন যে, তুমি না দিলেও আমি লোক পাঠাইয়া জোর করিয়া আনিব। আমি বাড়ী আসিয়া সে কথা বলি। সেই সতীলক্ষ্মীর কান্না দেখিয়া আমার স্ত্রী প্রাণ পণ করে। তখন রাত্রি ছয়দণ্ড কিন্তু তারপরে আর আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

রামপ্রাণ। তুমি বলিতেছিলে, সেই মেয়েটার জন্য তোমার সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে—সেটা কি ব্যাপার ?

গোপাল। তার পরদিন রায়-মহাশয় বলিলেন—আমি তাহাকে কোথায় সরাইয়া দিয়াছি। সেই রাগে তিনি আমার নামে কতকগুলি টাকার মিথ্যা দাবী দিয়া এক নালিশ রুজু করিয়া দিয়াছেন।

রামপ্রাণ। তোমার ভয় নাই, আমি কামারহাটীর রামপ্রাণ চৌধুরী। সে পাপাত্মার সহিত এখন সাক্ষাৎ করিব না, তোমাদের মোকদ্দমার আমি তদ্বির করিয়া দিব এবং যাহাতে পাষণ্ড উপযুক্ত শাস্তি পায় তাহা করিব।

যদিও গঙ্গারামপুর হইতে কামারহাটী তিন দিনের পথ, কিন্তু রামপ্রাণ-বাবুর ন্যায়নিষ্ঠা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ না জানিত কে ? গোপালচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং বসাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল ; কিন্তু তিনি বসিলেন না। তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়া রামপ্রাণবাবু দানীশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুমি আইস, কখন গঙ্গারামপুরের নাম শুনিয়াছিলে কি ? আমার বোধ হইতেছে এ গ্রাম হইতে তোমাদের গ্রাম বড় অধিক দূর নহে। শান্তি একরাত্রে কত পথই বা আসিতে পারিয়াছিল ?"

দানীশ। একরাত্রে কি প্রকারে জানিলেন ?

রামপ্রাণ। শান্তি বলিয়াছে।

দানীশ। আমি ছোটকাল হইতে কলিকাতায়; এদেশের গ্রাম বড় চিনি না।

তখন রামপ্রাণবাবু দুবে ঠাকুরকে গোপালচন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইয়া, সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দুবে ঠাকুর দে-মহাশয়কে আনিয়া হাজির করিল। রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"এখান হইতে শোণপুর কত দূর জান?"

গোপাল। শোণপুর এই ত নিকটেই; বড় জোর তিন ক্রোশ পথ হইবে।

রামপ্রাণ। নৌকায় যাইতে হইলে কতক্ষণ লাগিবে?

গোপাল। এই একই নদী, নৌকা এখন ছাড়িলে সন্ধ্যার কিছু পরেই পঁহুছিবে।

শেষে তাহার মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে সবিশেষ আশ্বাস দিয়া রামপ্রাণবাবু নৌকায় আরোহণ করিলেন; এবং দাঁড়ি-মাঝিকে শোণপুর যাইতে আদেশ করিয়া, দানীশের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। শোণপুর-পল্লী সুপ্ত।

ঘাটে নৌকা লাগিলে দানীশ ও রামপ্রাণবাবু তীরে অবতরণ করিলেন। পাচক-ব্রাহ্মণ ও একজন বরকন্দাজ নৌকায় থাকিল। অপর সকলে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

নিশীথ নিস্তব্ধ পল্লী-পথ দিয়া তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাহারও সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল না, কচিৎ কোন গৃহস্থের দরজায় শায়িত কুকুর তাঁহাদের সাড়া পাইয়া, সন্ত্রস্তভাবে দুই একবার ডাকিয়া আবার নিস্তব্ধ হইল।

বহুদিন পরে দানীশ তাঁহাদের পৈতৃক জীর্ণ দীর্ণ অবসন্ন আলয়-চত্বরে উপস্থিত হইল। সঙ্গে রামপ্রাণবাবু ও অপর লোকজন।

সদর-দরজা বন্ধ ছিল, আঘাত করিয়া সচীৎকারে দানীশ ডাকিল—"মা।" নৈশ-সমীরণে সে মধুর ধ্বনি, সমস্ত বাড়ীটি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

বাড়ীর মধ্যে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। দানীশের মাতা, বড়-বৌ মেজ-বৌ, সেজ-বৌ, নিস্তার সকলেই তখনও জাগ্রত ছিল, তাহারা দশহরার গঙ্গাস্নানে যাইবে বলিয়া উদ্যোগ করিতেছিল। শোকে তাপে সকলেই জর্জ্জরিত; বিষ্ণু সরকার তাঁহার স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীকে গঙ্গাস্নান করাইতে লইয়া যাইবেন, সেই সঙ্গে ইহারাও যাইবে। এতকালের পর যতীশচন্দ্র সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছেন, গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতে তিনিও অমত করিলেন না; এবং তিনিও সেই সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাদের সুখের সংসার ভাঙিয়া চূরমার হইয়া গিয়াছে; মনে আশা, তাঁহারা এই ভগীরথ-দশহরার যোগে গঙ্গাস্নান করিয়া জন্মজন্মার্জিত পাতক ক্ষয় করিয়া আসিবেন। ইহকালে ত এই সুখ, এখন পরকালের কাজটা ত চাই। তাঁহারা নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইবেন। শেষরাত্রে বিষ্ণু সরকার আসিয়া ডাকিবেন। সেই কারণে, তাহারা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জাগিয়াই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। যতীশ তখনও নিদ্রিত।

সহসা সেই চিরপরিচিত মধুর-স্বরে "মা" শব্দ গৃহিণীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দানীশের মাতা একবারমাত্র সে শব্দ শুনিয়া উৎকর্ণ হইলেন। অশ্রুরুদ্ধ নয়নে নিস্তারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখ ত নিস্তার, আমার দানীশ বুঝি আসিয়াছে। তারই মত গলায় আমায় যেন 'মা' বলিয়া কে ডাকিল।"

সেই সময় দানীশ আবার ডাকিল—"মা।"

বড়-বৌ বলিলেন—"ন-ঠাকুরপোই ত বটে!" নিস্তার ছুটিয়া গিয়া দরজা

খুলিয়া দিল। দানীশ সকলকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিস্তার যথাযোগ্য স্থানে বসিবার জন্য বিছানাদি বিস্তারিত করিয়া দিল। দানীশ গিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। মাতা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দানীশও কাঁদিলেন। মাতা কাঁদিলেন শচী ও ন-বৌএর জন্য। দানীশ কাঁদিলেন পাঁচকড়ির জন্য। কিন্তু দানীশ মাতাকে তাহা জানিতে দিলেন না। মাতা ভাবিলেন, শচী ও ন-বৌএর জন্যই দানীশ কাঁদিতেছে। শেষে পাঁচকড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দানীশ কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন —"ভাল আছে।"

গোলযোগে জাগরিত হইয়া, যতীশচন্দ্র উঠিয়া আসিলেন। রামপ্রাণ-বাবুর পরিচয় পাইয়া, যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও আপ্যায়নাদি করিলেন। তাঁহাদের সংসারের অবস্থাও আভাসে সমস্ত জানাইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"এই বিশৃঙ্খলা, এই অশান্তির উদ্ভবের, এই সাজান সংসার বিধ্বংস হইবার মূল কারণ—স্বয়ং তোমরাই। সংসারে ধৈর্য্য, বিবেচনা ও দৃঢ়তার সহিত কার্য্য না করিলে এইরূপ বিষম ফল ফলে। যাহা হউক, অতঃপর সাবধান হও।"

যতীশচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"নির্ব্বাপিত দীপে তৈলদানে আর ফল কি?"

এই সময় বিষ্ণু সরকার একজন মাঝি সঙ্গে করিয়া, সে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সহিত দানীশকে বাটী প্রত্যাগত দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, বাড়ীতে চাবিবন্ধ করিয়া গঙ্গাস্নান যাওয়া ইহাদের ঘটিল না।

বিষ্ণু সরকারকে দেখিয়াই যতীশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—"খুড়ো মহাশয়, ইনি কামারহাটীর জমিদার, বাবু রামপ্রাণ চৌধুরী!"

নাম শুনিয়া বিষ্ণু সরকার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন—"উনি এখানে?"

যতীশ। উনি যে দানীশের মা'স্ শ্বশুর।

বিষ্ণু। বটে! কৈ, এ সংবাদ ত আমরা আগে জানিতাম না! আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য—আমাদের গ্রামের সৌভাগ্য যে, উঁহার আগমন হইয়াছে। তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়—

বাধা দিয়া রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"আমাদের মেয়ে আমার বাড়ী গিয়াছে সেজন্য পরিতাপ করিতে হইবে না। আমি ঐ জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই পুলকিত হইলেন। রামপ্রাণবাবু আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া বিষ্ণু সরকার আনন্দে করতালি দিয়া বলিলেন—"যে ধর্ম্ম রাখে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। জগৎ শিখুক যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে কখনই পরিত্যাগ করেন না।"

তারপর রামসেবকের সমস্ত কুক্রিয়ার কথা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"দানীশ, শুন্‌লে?"

সকল কথা শুনিয়া দানীশ মস্তক অবনত করিলেন, কোন কথা কহিলেন না। দানীশের মাতা ও বড়-বৌ প্রভৃতি সকলেই সে কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলেন। নিস্তার এই দুর্ঘটনার মূল রামসেবককে উদ্দেশ করিয়া শত সহস্র অভিসম্পাত করিল।

বিষ্ণু সরকার, যতীশচন্দ্রকে বলিলেন—"গঙ্গাস্নানে তবে কেবল তোমার মা আমাদের সঙ্গে চলুন, তোমাদের আর যাওয়া হইবে না।"

রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"সকলেরই যাওয়া হইবে। এই ত উত্তম সুযোগ উপস্থিত। নৌকাপথে কলিকাতায় যাইতে হইলে, কামারহাটীর নীচে দিয়াই যাইতে হয়। আমরাও নৌকায় আসিয়াছি,এই রাত্রেই সকলে রওনা হইব। শান্তির এখনও অসুখ সারে নাই, সেজন্য বিলম্ব করিতে

পারিব না। বাড়ীতে গিয়া সকলে একদিন আনন্দ করিব, তারপরে আপনারা কলিকাতায় যাইতে হয় যাইবেন। কামারহাটীর নীচেও গঙ্গা আছে ত, দশহরা-স্নান সেখানেও হইতে পারিবে।” তখন সেই যুক্তিই স্থির হইয়া গেল।

তখনকার মত কিছু জলযোগ করিয়া, রাত্রিশেষে সকলে নৌকারোহণ করিলেন। অগ্রপশ্চাৎ হইয়া দুইখানি নৌকা চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সে বড় আনন্দের দিন। নৌকা দুইখানি যখন আসিয়া কামারহাটীর ঘাটে পঁহুছিল, তখন নিদাঘ নিশা অবসানপ্রায়। সকলে উঠিয়া রামপ্রাণ-বাবুর বাটীতে গমন করিলেন।

শান্তির তখন জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল—সে পথ্য করিয়াছিল। সকলের আগমন-সংবাদ শুনিয়া, উদ্দাম আকুল-হৃদয়ে তাঁহাদিগের নিকটে ছুটিয়া, একে-একে সকলের চরণ বন্দনা করিয়া, বড়-বৌ-এর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ভাসাইল। বড়-বৌও চক্ষুর জল ধারণ করিতে পারিলেন না। তারপরে শাশুড়ী, মেজ-বৌ, সেজ-বৌ ও বিষ্ণু-সরকারের স্ত্রী প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে সকলের সহিত নানা কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইল। রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পরম-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সকলের নিকটে বসিয়া, বিবিধ গল্প-গুজব করিয়া বাকি রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিলেন।

দানীশের প্রাণে তখনও আনন্দ স্থান পায় নাই, পাঁচকড়ির শোক তিনি সাম্‌লাইতে পারেন নাই। অধিকন্তু, যখন তাঁহার মা এই নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইবেন, তখন না জানি কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হইবে। দানীশচন্দ্র এই চিন্তায় আকুল।

দানীশ তাঁহাদের নিকট হইতে বহির্ব্বাটীতে যাইতেছিলেন ; মাতা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখান হইতে কলিকাতা কত দূর ?"

দানীশ। বড় বেশী নয়। কেন ?

মাতা। পেঁচোকে একবার খবর দিতাম। কতদিন দেখিনি।

দানীশ। দিব।

মাতা। আচ্ছা তোর সেজ-দাদার কোন খোঁজ খবর পাস্‌নি।

দানীশ। না। কলিকাতার মধ্যে যেখানে যেখানে আমাদের দেশের লোক বা আত্মীয়-স্বজন আছেন, সে সকল জায়গায় খবর লইয়াছি। কোথাও তিনি আসেন নাই—বোধ হয়, কলিকাতাতেই আসেন নাই।

মাতার নয়নদ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা আমার আছে কি না, তাই বা ঠিক কি ?"

অদূরে থাকিয়া সেজ-বৌ সে কথা শুনিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। দানীশ বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

সেখানে গিয়া অনেকক্ষণ চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না।

ক্ষিতীশের কথা মনে উঠিল—"হায়! তিনি কি আর জীবিত নাই ? কিন্তু পাঁচকড়ির কথা মা শুনিলে যে কি করিবেন, মায়ের বুকে যে কি আগুন জ্বলিবে, ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়।"

রামপ্রাণবাবুর এই কয়দিনের দৈনিক ইংরাজী খবরের কাগজগুলা আসিয়া জমা হইয়া পড়িয়াছিল। ভৃত্যের নিকটে সেগুলা চাহিয়া লইয়া দানীশচন্দ্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

নৈদাঘী প্রভাত। ঘরের ছায়াকে অবাধ প্রচুর আকাশের আলো আসিয়া যেন ভাসাইয়া ধুইয়া মগ্ন করিয়া দিতেছিল ; সে গৃহ তখন জনশূন্য এবং একটি ঘড়ি কেবল টিক্ টিক্ করিয়া শব্দ করিতেছিল।

দানীশচন্দ্র একখানা কাগজ খুলিয়া, তাহার সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ

করিতেছিলেন; সহসা একস্থানে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার তাহা পাঠ করিলেন। তৎপরে কাগজখানা হাতে করিয়া, বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানার প্রধান গৃহে গমন করিলেন। সেখানে রামপ্রাণবাবু, যতীশচন্দ্র, বিষ্ণু সরকার প্রভৃতি সকলে বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিলেন।

দানীশ কাগজখানা রামপ্রাণবাবুর সম্মুখে ধরিয়া, সেই প্যারাটিতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"একটী আশ্চর্য্য সংবাদ দেখুন!"

রামপ্রাণবাবু উত্তেজিত হইয়া তাহা পাঠ করিলেন। দানীশের মুখের দিকে আনন্দ সস্মিত নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"ক্ষিতীশচন্দ্র তোমার কে?"

দানীশ। আমার তৃতীয় অগ্রজ।

যতীশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্রের নাম শুনিয়া, কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বিবেচনা করিয়া, দানীশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্ষিতীশের কি হইয়াছে রে?"

দানীশ। তাঁহার কোন সাংবাদ পাই নাই; তবে ইহা তাঁহারই সম্বন্ধে ঘটনা—শুনুন।

দানীশ সেটুকু পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

"আমরা গভীর দুঃখের সহিত গতসংখ্যক কাগজে আমাদের সহকারী সম্পাদক মিঃ জনষ্টোন্ সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ জানাইয়াছি! তিনি এযাবৎ বিবাহ করেন নাই—কর্ম্মবীর, জগতের কর্ম্ম লইয়া থাকিতেন। দরিদ্রের সেবা করিয়া তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে—আশী হাজার টাকা। মৃত্যুকালে তিনি একখানি উইল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত টাকা ও উইলখানি তাঁহার এটর্ণিগণের নিকটে আছে। আশী হাজারের মধ্যে চল্লিশ হাজার তাঁহার জন্মভূমি লণ্ডনের দরিদ্রাবাসের অধ্যক্ষকে দরিদ্র-পোষণের জন্য দিয়া

গিয়াছেন এবং তিনি যখন উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাগণকে দেখিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে একদিন এক পল্লীর মাঠের মধ্যে সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়া সাংঘাতিক আঘাত পান। সেই সময়ে নিঃস্বার্থভাবে একটি বাঙালীবাবু তাঁহাকে শুশ্রূষা করেন, তাঁহারই যত্ন-চেষ্টায় তিনি সে ক্ষেত্রে জীবন প্রাপ্ত হয়েন। সেই বাঙালীবাবুকে বিংশ সহস্র মুদ্রা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সেই বাঙালীবাবুর নাম ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, নিবাস বঙ্গ-দেশের শোণপুর। আর বক্রী কুড়ি হাজারের মধ্যে, দশ হাজার দুর্ভিক্ষ-সমিতির হস্তে ও দশ হাজার মিশনারী ফণ্ডে দান করিয়া গিয়াছেন।"

পাঠ সমাপ্ত হইলে যতীশচন্দ্র বলিলেন—"ক্ষিতীশ কোথায়? সে কি টাকা লইয়া গিয়াছে।"

দানীশ। ইহা পাঠে সে সকল বুঝিবার কোন উপায় নাই। আমি দুপুরের গাড়ীতে কলিকাতায় যাই, এই কাগজের অফিসে যাইলে, তিনি আসিয়াছিলেন কি না, যদি আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ঠিকানা কোথায় এ সকল সহজে জানিতে পারিব।

যতীশ। তবে আর বিলম্ব করিস্ না। না হয় আমিও তোর সঙ্গে যাই চল্।

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল—"একটি ভদ্রলোক বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি ডাক্তারবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

রামপ্রাণবাবু বলিলেন—"বিদেশী?"

ভৃত্য। হবে—আমি চিনি না।

রাম। ভিতরে ডাক।

ভৃত্য। আমি ভিতরে আসিতে বলিয়াছিলাম, তিনি আসিলেন না। বলিলেন—"দেখা করিয়া এখনই যাইব।"

দানীশচন্দ্র উঠিয়া ভৃত্যের সহিত গমন করিলেন। সদর দরজার নিকট একজন ভদ্রলোক ডাক্তারবাবুর আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া

সিংহদরজার কারুকার্য্য দর্শন করিতেছিলেন। দানীশ নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে মহাশয় ?"

ভদ্রলোকটী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। নিমেষমধ্যে দানীশচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "সেজদাদা, সেজদাদা, আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় ছিলেন ?"

ক্ষিতীশচন্দ্রের চক্ষুও জলভারাকীর্ণ হইল। গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন—"অনেক দূর ঘুরিয়াছি। অর্থ কোথায় আছে, তাহার অনুসন্ধানই এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, বহুবাজার ষ্ট্রীটের উপরে তোমার নামযুক্ত সাইনবোর্ড দেখিয়া মনে কৌতূহল হইল—তুমি কি না। ভিতরে গিয়া সন্ধান করিয়া জানিলাম, তুমিই বটে। কিন্তু সেখানে এক ভীষণ সংবাদ শুনিলাম ! হাঁ রে, আমাদের স্নেহ মমতার আধার পেঁচো নাই ? আহা-হা, কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে !"

দানীশ। সেজদাদা, চুপ করুন। মা, বড়-বৌ, মেজদাদা সকলেই এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলে এককালে, অধীর শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন। বিশেষ, সে মায়ের কোলের ছেলে, মাকে বাঁচান দুর্ঘট হইবে।

ক্ষিতীশ। সে কি ? মা প্রভৃতি এখানে কেন ?

দানীশ। এই বাড়ীর অধিস্বামী রামপ্রাণবাবু আমার মা'স্ শ্বশুর—ব্যাপার ঘটিয়াছে অনেক,—ক্রমে সব শুনিতে পাইবেন। বাড়ীর মধ্যে চ'লুন ! আপনি এখানকার সন্ধান আমার বাসাতেই পাইয়াছিলেন বুঝি ?

ক্ষিতীশ। হাঁ। আমি গত-পরশু প্রথমে তোর বাসায় যাই—আবার কাল যাই। একজন কম্পাউণ্ডার বলিল—'ডাক্তারবাবু কয়েকদিন হইল, কামারহাটির রামপ্রাণবাবুর বাড়ী রোগী দেখিতে গিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই।' নূতন কোন বিপদের আশঙ্কা করিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছি।

দানীশ। সেজদাদা, আপনি কি উড়িষ্যার দিকে গিয়াছিলেন?

ক্ষিতীশ। কেবল উড়িষ্যা কেন, ভারতের অনেক স্থানেই ঘুরিয়াছি।

দানীশ। উড়িষ্যার কোন পল্লীর মাঠে কোন সাহেব সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, আপনি জানেন।

ক্ষিতীশ। জানি—আমিই তাঁহাকে তুলি। তারপর দুজনে সে রাত্রে এক পল্লীতে গিয়া থাকি। সকালে পুরীতে পাঠাইয়া দিই।

দানীশ। সে সাহেব হঠাৎ মারা পড়িয়াছেন।

ক্ষিতীশ। আহা, তিনি বড় ভদ্রলোক! মারা পড়িয়াছেন—আমারই অদৃষ্ট-দোষ! তিনি আমার দরিদ্র অবস্থার কথা শুনিয়া কলিকাতায় আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। বোধ হয় একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া দিতেন! কিন্তু আমি ভাবিলাম, কিছুদিন তীর্থ-দর্শন করিয়া মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলে, তারপরে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কলিকাতায় আসিয়াই তোর বাসার সন্ধান পাইয়াছি, সাহেবের নিকট "যাব যাচ্চি" করিয়া আর যাওয়া ঘটে নাই। এখন বুঝিলাম, সে আশাও শেষ হইয়াছে। কিন্তু দানীশ, তুই কি করিয়া উড়িষ্যার সংবাদ সব জানিতে পারিলি? সাহেবের সঙ্গে বুঝি তোর আলাপ ছিল? সাহেব বুঝি তোর কাছে কথায় কথায় আমার নাম করায় বুঝিতে পারিয়াছিলি?"

দানীশ। আজ্ঞে না। তিনি মৃত্যুকালে কুড়িহাজার টাকা আপনার নামে উইল করিয়া গিয়াছেন; এইমাত্র আমরা তাহা কাগজে পড়িতেছিলাম। তাহাতেই আপনার নাম ও উড়িষ্যার ঘটনা লেখা আছে।

ক্ষিতীশ। ধন্য হৃদয়! এই সামান্য দরিদ্রের কথা—সেই সামান্য উপকারের কথা মৃত্যুকালেও তাঁহার স্মরণ ছিল! এমন না হইলে এ জাতি কখন জগতের মধ্যে এত উচ্চ উন্নত—এত সম্মানিত হয়?

দানীশ। আপনি আসুন—মেজদাদা, বিষ্ণু খুড়া সবাই বৈঠকখানায়

আছেন, দেখা করুন। মাকে দেখা দিন্—তিনি আপনাদের জন্ম বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর আহারাদি অন্তে আপনি ও আমি দুপুরের গাড়ীতে কলিকাতায় যাইয়া, আপনার সেই কুড়িহাজার টাকা বাহির করিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করিব।

ক্ষিতীশচন্দ্র দানীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈঠকখানায় গমন করিলেন। দানীশ দরজার কাছে পৌছিয়াই বাষ্পাকুল লোচনে ডাকিয়া বলিল—"মেজদাদা, দেখুন—সেজদাদা আসিয়াছেন!"

"ক্ষিতীশ!"—এই কথা বলিয়াই যতীশচন্দ্র লম্ফ দিয়া উঠিতেছিলেন, ক্ষিতীশ গিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। উভয় ভ্রাতা উভয় ভ্রাতাকে স্নেহ-ভক্তির বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। সেস্থান তখন আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া উঠিল! রামপ্রাণবাবু ও বিষ্ণু সরকার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

তারপরে ক্ষিতীশ বাড়ীর মধ্যে গিয়া মার চরণে প্রণাম করিলেন। মাতার রুদ্ধ অশ্রুজলে দৃষ্টিরোধ হইল—বহুদিবসের সঞ্চিতশোক-বারি-প্রবাহ আসিয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল! অবশেষে ক্ষিতীশের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রামপ্রাণবাবু যেমন বিচক্ষণ ও সদ্বিবেচক, তাঁহার স্ত্রীও তদ্রূপ। তিনি বুঝিলেন, এই দীর্ঘ দিবসের বিরহের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনাকাঙ্ক্ষা সম্ভবতঃ প্রবল। তাঁহার বাড়ী—বিরহ-ব্যথিত দম্পতির পক্ষে পরের বাড়ী; এখানে সে সুযোগ তাঁহাকেই করিতে হইবে।

ক্ষিতীশ যখন মাতৃচরণে, দানীশের শাশুড়ীর চরণে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ-দ্বয়ের চরণে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন এক দাসী আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"আপনাকে একবার আসিতে হইবে।"

ক্ষিতীশ। আমাকে ডাকিতেছ?—তোমার বোধ হয় ভুল হইয়া থাকিবে।

দাসী। বড়লোকের বাড়ী চাকরী করি, ভুলের দণ্ড আর জানি না? আপনি আসুন, আপনাকে ডাকা হইতেছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। উন্মাদিনীর মত সেজ-বৌ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল। পদদ্বয় ধরিয়া সরোদনে আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"আমায় ক্ষমা করিবে কি?"

ক্ষিতীশ। সেজ-বউ! তুমি? আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছ কেন? তোমার দাদার অবস্থা ভাল, আমি দরিদ্র, বোধ হয় আমার নিকট আসিতে তোমার কুণ্ঠা, ঘৃণা, অপমান বোধ হয়!

সেজ-বউ। আমি স্ত্রীলোক, বুদ্ধিহীনা—আমি আগে অত বুঝি নাই। তখন বুঝি নাই যে, স্বামীর পদছায়ায় রমণীর সকল সুখ রক্ষিত, স্বামীর অনুগ্রহদৃষ্টির উপর রমণীর ইহজগতের ও পরজন্মের যাহা কিছু ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে। আমি তোমার আশ্রিতা সেবিকা। আমি জ্ঞানহীনা, আমায় ক্ষমা কর। আবার সেইরূপ স্বরে বল—'সেজ-বউ, ক্ষমা করিলাম।'

ক্ষিতীশ। এ সকল তোমাকে কে মুখস্থ করাইল?

সেজ-বউ। না দেব, এ সকল মুখস্থ করা কথা নহে। এ সকল আমার প্রাণের কথা। আমি তোমার অভাব বুঝিয়াছি, শ্বশুরবাড়ীর মাহাত্ম্য বুঝিয়াছি—তাই বাপের বাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছি। তাহার ফলে আজ তোমার দেখা পাইলাম।

ক্ষিতীশ। কিন্তু আমি সেই গরীব!

সেজ-বউ। তুমি আমার রাজরাজেশ্বর। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া দুইজনে পরিব; এক বেলা রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলে মিলিয়া আহার করিব; তাহাও সুখের—তাহাও মানের। রমণীর শ্বশুরবাড়ী আর স্বামী—ইহাই মান ও সুখের আস্পদ—প্রীতিপ্রেমের আগার—পুণ্যপবিত্রতার তীর্থক্ষেত্র।

ক্ষিতীশচন্দ্র বহুদিনের বিরহ-বিকার বিদীর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—পত্নীকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া, তাহার গোলাপ-কুসুম-গণ্ডে দাম্পত্যের মিলন-চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দানীশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র সেই দিনই দিবা দুইটার সময় সেই খবরের কাগজের অফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষিতীশের পরিচয় দিয়া, এটর্ণির অফিসের ঠিকানা জানিয়া, তথায় গমন করিলেন। টাকা, সাহেবের এটর্ণির নিকট গচ্ছিত ছিল।

সেখানে গিয়া ক্ষিতীশের পরিচয় ও কলিকাতাবাসী একজন ভদ্রলোক দ্বারা সনাক্ত করাইয়া, ব্যাঙ্কের উপর কুড়িহাজার টাকার চেক লইয়া ফিরিলেন।

দানীশের ইচ্ছা হইতেছিল, একবার ডাক্তারখানার অবস্থাটা দেখিয়া যান। আবার ভাবিলেন, সেখানে গেলে দাদার সম্মুখে আসিয়া হতভাগিনী যূথিকা যদি সেই সকল কথার আলোচনা করে, তবে বড়ই লজ্জা পাইতে হইবে। তখন স্থির করিলেন, পরদিন একাকী আসিবেন; সেদিন কামারহাটী যাইবেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে দুই ভ্রাতায় আরোহণ করিলেন। গাড়ী যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন—আকাশে ভয়ঙ্কর মেঘের উদয় হইয়াছে। দিগন্ত মেঘান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আসিবেন বলিয়া রামপ্রাণবাবু ষ্টেশনে দুইটি অশ্ব রাখিয়াছিলেন। দুইভাই অশ্বে আরোহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিলেন। বলবান্ অশ্ব দুইটি কশাঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া, বাতাসের সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিলেন না।

যখন তাঁহারা কামারহাটী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন মেঘ ডাকিল জল আসিল !—আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জন প্রবল হইতে প্রবলতর হইল, বায়ুপ্রবাহ ভীষণাকার ধারণ করিল, বৃষ্টিও মুষলধারে পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এইরূপ দৈব-দুর্য্যোগের পর, প্রকৃতি আবার স্থির-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ; কিন্তু আকাশের মেঘ তখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, বৃষ্টি বিন্দু বিন্দু পতিত হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ বিদ্যুৎ-বিকাশ হইতেছিল।

ক্ষিতীশচন্দ্র ও দানীশচন্দ্র তখনও ঠাকুরবাড়ীর একটা গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া, অন্যান্য কথার পরে পাঁচকড়ির মৃত্যু-প্রসঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করিতে ছিলেন। সহসা বাহির হইতে কে ডাকিয়া বলিল—"ঘরে কে আছেন মহাশয় ? একবার দরজা খুলুন, আমি বড়ই বিপন্ন !" সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া, ক্ষিতীশচন্দ্র অতি বিস্মিত চকিত নয়নে দানীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন ! বিপন্ন চকিত-স্বরে বলিলেন—"দানীশ, দানীশ, পেঁচোর গলা না ?"

দানীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। গৃহের আলো বাহিরে পড়িল। দরজার নিকটে অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয় দৃশ্য ! ভয়ে বিস্ময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট—অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন, দরজার নিকটে পাঁচকড়ি—তাহার বক্ষদেশে শচী ! উভয়েই জলে ভিজিয়াছে।

দানীশচন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"পাঁচকড়ি, আমরা কি তোমাদের প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি ? তোমরা কি পরলোকের রাজ্য হইতে আমাদিগকে দেখা দিতে বা ছলনা করিতে আসিয়াছ ?"

পাঁচকড়ি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"ন-দাদা, আপনি এই

গ্রামে আছেন শুনিয়া, কলিকাতা হইতে দেখা করিতে আসিয়াছি। বুকে হারাধন শচী। সব কথা বলিতেছি—সমস্ত বৃষ্টিটা আমাদের মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। আপনাদের শুক্‌নো কাপড় দিয়া শচীর গা-টা মুছাইয়া উহার গায়ে শুক্‌নো কাপড় দিন।"

পাঁচকড়ি গৃহপ্রবেশ করিল। শচীকে কোল হইতে নামাইল। দানীশের কম্পিত হস্ত শচীর গাত্রস্পর্শ করিল, শচী ছুটিয়া গিয়া সেজ-কাকার কোলে উঠিল; ন-কাকাকে বড় চিনিত না।

তখন ক্ষিতীশ ও দানীশ বুঝিতে পারিলেন, আগন্তুকদ্বয়ের রক্তমেদ-অস্থি-মাংসসমন্বিত পার্থিব দেহ, তাহারা ছায়াশরীরের প্রেত-মূর্ত্তি নহে।

দানীশ বলিলেন—"পাঁচকড়ি, প্রাণাধিক,আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

পাঁচ। না দাদা, স্বপ্ন নহে। আমি মরি নাই। ঘটনা শুনুন; যূথিকা আমাকে হত্যা করাইবার ষড়যন্ত্র করে। রাজাসাহেব তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণকে দুইহাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া, আমার হত্যার ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। সে ব্রাহ্মণ, দুই হাজার টাকাও লইবে,অথচ নরহত্যার পাতকীও হইবে না, এই স্থির করিয়া, গভীর নিশীথে আমার গৃহে প্রবেশ করে। আমাকে জাগাইয়া কিছুদিন গোপনে থাকিতে বলে। আরও বুঝাইয়া দেয় যে, এখন কিছুদিন গোপনভাবে না থাকিলে,যূথিকার হাতে আমার নিস্তার নাই; আমি সব বুঝিয়া দেখিয়া তাহার কথায় স্বীকৃত হই। কেন হই জানেন? আমার জন্য পাছে আপনার কোন অনিষ্ট ঘটে। সে আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া একটা ছাগল কাটিয়া আমার শয্যায় ও গৃহতলে রক্ত ঢালিয়া ছাগদেহ লইয়া চলিয়া যায়।

দানীশ। কি সর্ব্বনাশ! সে ব্রাহ্মণ এখন কোথায়?

পাঁচ। সে তৎপরদিবস প্রাতঃকালেই রাজাসাহেবের নিকট অর্থ লইয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে।

দানীশ। যাক ও-সকল কথা পরে শুনিব। শচীকে কোথায়

পাইলি'? আমি শুনিয়াছি, শচীর মৃতদেহ শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া আসা হইয়াছিল।

পাঁচ। হাঁ, সেই কথাই বলিতেছি; আমি সেই শেষরাত্রে রাস্তা বাহিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেলাম, একবার ভাবিলাম, বাড়ী যাই, আবার ভাবিলাম বাড়ী গেলেও নানা অশান্তি। দিনকতক দেশভ্রমণ করিয়া আসি। কিন্তু কোথায় যাইব? ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া বেলেঘাটার দিকে গেলাম। খালধারে গিয়া বেড়াইতেছি, সেই সময় একটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল, তিনি বাদা অঞ্চলে যাইবেন—নৌকা ভাড়া করিবার জন্য ঘুরিতেছিলেন। আমিও তাঁহার সহিত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া, দুইজনে তাহাতে আরোহণ করিলাম। নৌকা বাদা অভিমুখে চলিল।

আমরা যেদিন সংগ্রামপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, সেইদিন রাত্রে আজিকার মত দুর্য্যোগ ঘটিয়াছিল। সেই দুর্য্যোগে আমাদের নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায়, সেই ভদ্রলোকটি, দাঁড়ি, মাঝি ভাসিয়া কোথায় গেল, জানি না। আমি সাঁতরাইয়া কূলে উঠিলাম—যেখানে উঠিলাম, সে স্থানটায় অতি ভীষণ জঙ্গল! চারিদিকে বন্যপশুচর ভীষণ রব করিতেছে—দেখিয়া শুনিয়া আমি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম। অদূরে একটা আলোকরশ্মি দেখিতে পাইয়া মনে একটু আশা জন্মিল। পরক্ষণেই মৃদু ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল; বুঝিলাম, ঐ স্থানে মানুষ আছে।

তখন সেই আলোক-রশ্মি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। নিকটে যাইয়া দেখি, সে একটা দেবমন্দির। মন্দিরের অর্গল উন্মুক্ত—মুক্তদ্বার-পথে দেখিলাম, মন্দির আলো করিয়া কালীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন; সম্মুখে পদ্মাসন করিয়া একটি সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। ধুনাচি হইতে ধুনার ধুম উঠিয়া দিগন্ত সুগন্ধীকৃত করিতেছে। আমি ভক্তিভরে মাতৃচরণে প্রণাম করিলাম।

দানীশ। শচীকে কোথায় এবং কি প্রকারে পেলি, তা'ত ব'ল্‌ছিস্‌ না!

পাঁচু। তাই বলিতেছি। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর সমাধি ভঙ্গ হইল। আমি আর্দ্রবস্ত্রে দরজার সম্মুখেই বসিয়াছিলাম, সন্ন্যাসী পূজা সমাপন করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত কথা বলিলাম। মন্দিরের পার্শ্বে আর একটি গৃহ; সন্ন্যাসী ডাকিবামাত্র তথা হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিলে, তাহাকে একখানি শুষ্কবস্ত্র আনিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য বস্ত্র আনিয়া দিল, আমি পরিধান করিলাম। সন্ন্যাসী প্রসাদ দিলেন, আমি আহার করিলাম; তারপর সে রাত্রি সেই স্থানেই নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম। পরদিন উঠিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় লইতে গিয়া দেখি, তাঁহার নিকট শচী। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল—এ কি শচী? জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না।—"ঐ আমার ছোট-কাকা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া, শচী আমার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং "বাড়ী চল" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই ঘটনা কি বিস্ময়কর,তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। যে শচীর মৃতদেহ নিজ-হস্তে শ্মশান-ভূমে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম,—সে 'আমার ছোট-কাকা' বলিয়া গলা জড়াইয়া বাড়ী যাইবার জন্য কাঁদিতেছে। এই সুদূর বিজন বনে—মায়ের মন্দিরে, সন্ন্যাসীর পার্শ্বে সে কোথা হইতে আসিল?

আমি বিস্ময়-গদ্গদকণ্ঠে সন্ন্যাসীর চরণে পতিত হইয়া, সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—"ইচ্ছাময়ী মা, কোন্‌ ইচ্ছায় কি কার্য্য করেন, কিছুই বলা যায় না। তোমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে যেদিন তোমরা শ্মশানে ফেলিয়া যাও, আমি সেদিন সেই শ্মশানে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন অমাবস্যা-রজনী, দেশভ্রমণ করিতে করিতে তোমাদের

দেশে গিয়া পড়িয়াছিলাম ;—অমাবস্যা-সাধনা জন্য সেদিন ঐ শ্মশানেই আসন করিয়াছিলাম।

"একটি শবের প্রয়োজন ছিল ; তোমরা যেই চলিয়া গেলে, আমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের শবদেহ তুলিয়া আনিতে গেলাম। তুলিয়াই দেখি, অপান বায়ু সেই দেহে অবিকৃতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। সর্প দংশনের রোগী বিষে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—অপানপ্রাণ রহিয়াছে, প্রাণ গিয়াছে। আমি সর্প-বিষয়ে ঔষধ জানিতাম ; তখনই সে ঔষধ ইহার শরীরে প্রবিষ্ট করাইলাম এবং জল-চিকিৎসা করিতে লাগিলাম, রোগীর প্রাণ আসিল, সে জীবিত হইল। একবার ভাবিলাম, অনুসন্ধান করিয়া যাহাদের ছেলে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া যাই, আবার ভাবিলাম, তাহারা ইহার মায়া কাটাইয়াছে, অথচ আমারও একটি ছেলের প্রয়োজন। আমি মায়ের সেবক, আমার দেহত্যাগের পর, আর একজন সেবকের প্রয়োজন, এই ছেলেটীকে পালন করিয়া, কালে ইহাকে তন্ত্র-দীক্ষা দিয়া, মায়ের সেবক করিয়া রাখিয়া যাই, এই ভাবিয়া ইহাকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম।"

আমি পুনঃ পুনঃ তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম—"প্রভো ! যদি শচীর জীবন দিয়াছেন, আমাদের জীবন দিন্—ইহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করুন। শচী আমাদের বাড়ীর সকলের জীবন-সর্ব্বস্ব।"

সন্ন্যাসী অশান্ত-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"শচীকে লইয়া যাও ; আমার আপত্তি নাই। আমিও যাইব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় প্রভু ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"পরলোকে। আজ রাত্রে আমি এই নরদেহ ত্যাগ করিব। আমার এ জন্মের পরমায়ু ফুরাইয়াছে। শচীকে পালন করিয়াছি, তাহাকে কিছু অর্থ দিতে ইচ্ছা করি।"

আমি। শচী আপনার দাস, যাহা ইচ্ছা হয় করুন। কিন্তু আমি

বড় ব্যথিত হইলাম, আপনার দেহত্যাগের কথা শুনিয়া আমার প্রাণ বিচলিত হইতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, আপনার চরণযুগলে তান্ত্রিক-যোগের উপদেশ লইব।

সন্ন্যাসী। আমি তোমাকে অদ্যই দীক্ষিত করিব, আর এই মায়ের কাজ তোমাকেই দিয়া যাইব। বুঝি মায়েরও ইচ্ছা তাই। তাই তুমি আজ অভাবনীয়রূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।

আমি। আপনার কথায় পুলকিত হইলাম। কিন্তু আমার দুইটি মাত্র কথা আছে।

সন্ন্যাসী। কি বল?

আমি। প্রথম কথা, আপনার কথায় বুঝিতে পারিতেছি, মৃত্যু আপনার ইচ্ছায়ত্ত, অতএব আর কিছুদিন দেহত্যাগ না করিলে হয় না?

সন্ন্যাসী। মৃত্যু আমার ইচ্ছায়ত্ত নহে, অরিষ্ট * দর্শনে অদ্য মৃত্যু হইবে স্থির করিতে পারিয়াছি।

আমি। আপনার নিকট দীক্ষিত হইয়া মাতৃ-চরণ সেবা করি, কিন্তু প্রভু, আপনার ন্যায় আমার কোন ঐশ্বর্য্য নাই;—এই জনহীন ভীষণ জঙ্গলে আমি থাকি কি প্রকারে?

সন্ন্যাসী। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই দেখিতেছি যে তাঁহার মূর্ত্তি লোকালয়ে যায়। তুমি এ মূর্ত্তি তোমার বাড়ী লইয়া গিয়া স্থাপন করিও। আইস, শচীকে আমি যে অর্থ দিব; ও দেবতার যে অর্থ আছে, তাহা তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।

* মরণের পূর্ব্বে মনুষ্যের অল্পে অল্পে স্বভাবের বৈপরীত্য হইতে থাকে। তৎসঙ্গে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার বা পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সে সকল বিকার বা সে সকল মরণ-লক্ষণ সকলে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সাধক—যাঁহারা যোগী তাঁহারা সমস্তই বুঝিতে পারেন। সেই সকল মরণসূচক বিকার বা মরণের লক্ষণ তন্ত্রের ভাষায় "অরিষ্ট" নামে অভিহিত হয়।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আরও অধিকতর জঙ্গলমধ্যে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া একটা অতি পুরাতন বৃক্ষমূল খনন করিয়া, সাতটা পিতলের কলসী দেখাইয়া বলিলেন—"উহার পাঁচটা দেবতার ও দুইটা আমার নিজের। আমার নিজের দুইটী শচীকে দিও, আর পাঁচটা দেবকার্য্যে লাগাইও।"

তারপরে সেগুলা আবার সেরূপ করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। মন্দির-সন্নিধানে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী আমাকে স্নান করিতে আদেশ করিলেন। আমি স্নান করিয়া আসিলাম—মাতৃ-চরণ-সন্নিধানে বসিয়া, তিনি আমাকে পূর্ণাভিষিক্ত দীক্ষাদান করিলেন,—আমি নবজীবন পাইলাম। তারপর মায়ের পূজা সমাপ্ত করিয়া আমার নামধাম, পিতার নাম, প্রভৃতি জানিয়া, সন্ন্যাসী কোথায় চলিয়া গেলেন এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া, আমাকে একখানা রেজেষ্টারী করা দানপত্র প্রদান করিলেন। সেই দলিলে দেবতা ও দেবধন আমাকে দান করিয়া গেলেন, তাহাই লিখিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর মায়ের আরতি সমাপ্ত করিয়া, সন্ধ্যা ভোগ নিজ হস্তে নিবেদন করিয়া, আমার গুরু—মায়ের সেবক এই সন্ন্যাসী—পদ্মাসন করিয়া বসিলেন! রাত্রি দুই প্রহরের সময় দেখা গেল, তাঁহার পূত-আত্মা দেহত্যাগ করিয়া মাতৃধামে চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে উঠিয়া তাঁহার পবিত্র দেহের সৎকার করিলাম। অবশেষে আমার দানপত্র দেখাইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যের কয়েক দিনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুলিসের উপরে দিয়া, শচীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম—উদ্দেশ্য, আপনাকে সেখানে লইয়া গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিব। অধিকন্তু সেখানে নৌকাও মিলে না। কলিকাতায় আসিবার অন্যতম উদ্দেশ্য—তথা হইতে নৌকা লইয়া গিয়া তাহাতে সমস্ত তুলিয়া দেশে লইয়া যাইব।

কলিকাতার বাসায় গিয়া শুনিলাম, আপনি কামারহাটীর বাবুদের বাড়ী আছেন। যূথিকা সে বাড়ী ছাড়িয়া তাহার মাতার বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। রাজাসাহেবকে লইয়া পুলিসে বড় টানাটানি করিতেছে। ভদ্রলোকের কষ্ট দেখিয়া আমি পুলিসে গিয়া দেখা দিয়া আসিলাম। আমি যখন মরি নাই, তখন আর তাঁহার দায় কি ?

সমস্ত কথা আপনাদিগকে বলিলাম, এখন যাহা ভাল হয় করুন। সেজদাদা, এখানে কবে আসিলেন ?

ক্ষিতীশ। আজ আমি সকালে আসিয়াছি ;—সন্ন্যাসীর গুপ্তধন কি পুলিসের লোককে দেখাইয়া আসিয়াছিস্ ?

পাঁচ। না।

ক্ষিতীশ। কেবল আমি নই—এখানে মা, মেজ-দাদা, বড়-বৌ মেজ-বৌ, সেজ-বৌ, ন-বৌ সকলে আসিয়াছেন।

পাঁচ। কেন ?

ক্ষিতীশচন্দ্র যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁহাদের পারিবারিক যাবতীয় দুর্ঘটনার কথা হইতে, তাঁহার বিংশতিসহস্র মুদ্রাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল—"মা আমার জগতের জীবকে যে কি প্রকার ভাবে নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ভাবিয়া কূল পাওয়া যায় না। বাহিরে জ্যোৎস্না প্রকাশ পাইয়াছে, বৃষ্টিও থামিয়া গিয়াছে। তবে চলুন, পুত্রহারা জনক-জননীর ক্রোড়ে তাঁহাদের স্নেহের শচীকে দিই গে।"

পাঁচকড়ি, শচীকে কোলে করিয়া লইল। তখন তিন ভ্রাতায় রাম-প্রাণবাবুর বাটী অভিমুখে গমন করিলেন।

শচীকে পাইয়া, সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, সেই পরিবারের মধ্যে সেদিন যে কি আনন্দ উচ্ছ্বাস ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

রামপ্রাণবাবু সেই রাত্রেই দুইখানি নৌকা করিয়া দিলেন। যতীশচন্দ্র

ও ক্ষিতীশচন্দ্র, পাঁচকড়িকে লইয়া কালীমূর্ত্তি ও ধনরত্ন, বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বাগানে গমন করিলেন।

শচী, পাঁচকড়ির সঙ্গে যাইবার জন্য বায়না লইয়াছিল, শচীর মা বলিলেন—"ঠাকুরপো,তুমি লইয়া যাও,শচী আমার নয়, তোমার! একবার আমার বলিয়া হারাইয়াছিলাম—তুমি মরা ছেলে ফিরাইয়া আনিয়াছ; আর আমার বলিয়া অনর্থ ঘটাইব না। ও সকলের ধন। আমি একা আর দাবি করিব না।" যাহা হউক, শচী কষ্ট পাইবে বলিয়া পাঁচকড়ি আর তাহাকে লইয়া গেল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রামপ্রাণবাবু অসীম পুলকিত হইলেন। দুইদিন সেই বাড়ীতে মিলন-মহোৎসব চলিল। বিষ্ণু সরকার সে উৎসবের প্রধান ঋত্বিক্।

চারি-পাঁচ দিন পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—"তবে আমরা এখন বাড়ী যাই। গঙ্গাস্নান এবং একটী বিচ্ছিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুখ-সম্মিলন হইল। ওদিকে তাহাদের নৌকা বোধ হয় এতদিন বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমাদের এখানে আর আপাততঃ বিলম্ব করা উচিত নহে।"

রামপ্রাণবাবু সাশ্রুলোচনে বলিলেন—"জগদীশ্বরের কৃপায় এমনভাবে যে সকলের সম্মিলন হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এমন অসম্ভাবিত ঘটনা মানুষ কল্পনাতেও আনিতে পারে না। সকলই মায়ের ইচ্ছা;—সকলেরই সংসার আছে, অতএব তোমাদের গমনে বাধা দিতে পারি না, কিন্তু এরূপ আনন্দ বুঝি জীবনে কখনও উপভোগ করি নাই।"

তৎপরদিন দুখানি নৌকা প্রস্তুত হইল।

যাইবার সময় পরস্পর বিদায়ের সম্ভাষণ করিলেন; যতীশের মাতা, রামপ্রাণবাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—"শুনিলাম, পাঁচকড়ি কালীমূর্ত্তি আনিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিবে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা, যাঁহাদের পবিত্র ও পুণ্যময় প্রভাবে আমাদের

শুভমিলন ঘটিল, সেই বৈবাহিক ও বৈবাহিকা এতদুপক্ষে যেন সে বাড়ীতে পদার্পণ করেন।"

রামপ্রাণবাবু স্বীকৃত হইলেন। শান্তি তাহার মাসীমাতার চরণে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাসী তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দানীশ রামপ্রাণবাবুকে প্রণাম করিলেন। রামপ্রাণবাবু একখানি রেজেষ্টারী করা দলীল দানীশের হাতে দিলেন। দানীশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি ?"

রামপ্রাণবাবু বলিলেন—কন্যা জামাতার যৌতুকপত্র। তোমাদের দেশে তরফ মহিষবাথান, পনরখানা গ্রামে আমার জমিদারী ছিল, কালেক্টরীর খাজনা দিয়া উহার বার্ষিক উপস্বত্ব পাঁচহাজার টাকারও কিছু উপরে ; ঐ সম্পত্তি আমি তোমাকে যৌতুক দিলাম, ওখানা সেই যৌতুক দানপত্র।"

দানীশ, বিস্ময় চকিত ও কৃতজ্ঞনেত্রে রামপ্রাণবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিষ্ণু সরকার নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন— "আপনার মত মহাপ্রাণের কার্য্যকলাপও অনুপম !"

রামপ্রাণবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমি মহৎ কিসে ? পথের লোককে যদি এ সম্পত্তি দিতাম, তাহা হইলে যাহা হয় বলিতে পারিতেন। আমার পুত্র কৃতী, সে মাসিক তিন-চার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমার বার্ষিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা—পঁচিশ হাজার পুত্রের জন্য রাখিলাম। দুই মেয়েকে পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার, আর শান্তিকে পাঁচ হাজার এই পনের হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়াছি।"

তারপর তাঁহারা নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনুকূল বায়ুভরে নৌকা চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শোণপুরের সেই অসংস্কৃত অবসন্ন রায়বাড়ী আজ আনন্দ কোলাহলে মুখরিত। সমস্ত বাড়ীর সংস্কার হইয়াছে, সমস্ত বাড়ী শুভ্রোজ্জ্বলকান্তি ধারণ করিয়াছে। চারি ভ্রাতা এক প্রাণ হইয়া সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছেন। চারিটি বধূ একই স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া, সাংসারিক সমস্ত খাটুনি খাটিতেছে।

এইবার পাঁচকড়ির বিবাহের জন্য সকলে জিদ্ করিতেছিলেন। পাঁচকড়ি কিন্তু কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। সে বলিল—"মা যখন কামিনী-মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অর্থাৎ মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন তখন আর নয় দাদা; আর বাঁধিও না। আমি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছি, মায়ের চরণসেবা করিয়া আমাকে কৃতার্থ হইতে দাও। শচী আমার বংশধর।"

সন্ন্যাসীর সেই সপ্তকলসী স্বর্ণ-মুদ্রার দুই কলসী শচীকে দেওয়া হইয়াছে, শচীর পিতা তদ্দ্বারা জমিদারী কিনিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চকলস স্বর্ণমুদ্রা মায়ের। পাঁচকড়ি তাহা হইতে প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করাইল; মন্দির সংলগ্ন অতিথিশালা, দরিদ্রাবাস, দাতব্যচিকিৎসালয় ও একটী বেদান্তের চতুষ্পাঠী খুলিয়া যথোপযুক্ত লোকজন রাখিয়া দিল। নিজে গৈরিকবসন পরিধান করিল, রুদ্রাক্ষমালা গলদেশে ধারণ করিল, অঙ্গে বিভূতি মাখিল, মাথায় জটা ধরিল। মায়ের স্থায়ী সেবা চলিবার জন্য, সেই অর্থ হইতে কিছু জমিদারী কিনিয়া, দেবোত্তর সম্পত্তি করিল। আর নিজে দরিদ্র-সেবাব্রত গ্রহণ করিল।

তাহাদের বিচ্ছিন্ন পরিবারের—বিশেষ শচীর—মিলন-স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সেই মন্দিরের পাদদেশে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত করিয়া দিল—

"মিলন-মন্দির"

এক বৎসর পরে মিলন-মন্দিরের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সে মহোৎসবে রামপ্রাণবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আগমন করিলেন। যেখানে যে আত্মীয়কুটুম্ব ছিলেন, সকলকেই আনা হইয়াছিল। হরিচরণ, হরিচরণের স্ত্রী, হরিচরণের মাতাও আসিয়াছিলেন।

রামপ্রাণবাবু কালীভক্ত, তিনি সে দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। মিলন-মন্দিরে মহামেঘপ্রভা দিগম্বরী মুক্তকেশী করালবদনা লোলরসনা চতুর্হস্তা কালী। মায়ের সম্মুখে পদ্মাসন করিয়া নবীন-সাধক পাঁচকড়ি ;—পাঁচকড়ির দক্ষিণে পুষ্পপাত্রে রক্ত শ্বেত পীত বিবিধ বর্ণের পুষ্পস্তূপ। বামভাগে পূজাদ্রব্য, দক্ষিণে সুবাসিতাপূর্ণ কুম্ভ। চতুর্দ্দিকে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। যজ্ঞধূপ ও ধূনার সুগন্ধি ধূমে মন্দির আমোদিত। বাহিরে নাটমন্দিরে—ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মাতৃযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন ;—কেহ হোম করিতেছেন, কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ জপ করিতেছেন, কেহ প্রাণায়াম ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ সুর-লয়-সংযোগে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে কুল-নারীগণ হুলু ও শঙ্খধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। সিংহদ্বারে বাদকগণ বাদ্য করিতেছে, গায়কে মল্লারে মাতৃগাথা গাহিতেছে। রামপ্রাণবাবু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সকল দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন ; দীন দরিদ্রে সে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র-সেবা-ঘরে স্তূপাকার অন্ন-ব্যঞ্জন রক্ষিত। বড়-বৌ, মেজ-বৌ, সেজ-বৌ, ন-বৌ গাছকোমর বাঁধিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ; যতীশ, ক্ষিতীশ ও দানীশ সে অন্নব্যঞ্জন বিতরণ করিতেছেন।

এরূপ মহোৎসবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিলেন। আজ রামপ্রাণ-বাবু যাইবেন। তিনি তাঁহাদিগের কয় ভ্রাতা ও বধূদিগকে ডাকিয়া বলি-লেন—"আমি বাড়ী চলিলাম। তোমাদিগকে লইয়া বড়ই সুখে ছিলাম, কিন্তু সেখানেও না গেলে নয়!"

অতঃপর সকলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। তখন তিনি সস্ত্রীক ভৃত্যাদি লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বড়-বৌ, স্থায়িভাবে ঠাকুরবাড়ীর কার্য্যভার গ্রহণ করিল। যদিও দেবী-মন্দিরের অনেকগুলি দাসদাসী ছিল, তথাপি বড়-বৌ সর্ব্বত্র। মন্দির-মার্জ্জনা, নাটমন্দির পরিষ্কার করা, নির্ম্মাল্য ফেলা, রোগীদের পথ্য রাঁধা, সকল কার্য্যই বড়-বৌ স্বহস্তে করিত। পাঁচকড়ি, মায়ের নিত্য উপাসনা করিত—তদ্ব্যতীত একজন পূজক-ব্রাহ্মণও নিযুক্ত হইয়াছিল।

পাঁচকড়ি দানীশকে বলিল—"ন-দাদা, আর চাকরী-বাকরী করিয়া কি হইবে? মায়ের টাকা কিছু লইয়া কলিকাতায় যান—কিছু ঔষধপত্র আর যন্ত্রপাতি লইয়া, মন্দিরে সমাগত মায়ের পীড়িত সন্তানগণের সেবা করুন।"

দানীশ স্বীকৃত হইলেন এবং কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে দানীশকে গৃহমধ্যে পাইয়া, মৃদু হাসিয়া ন-বৌ বলিল—"রাত্রের গাড়ীতে নাকি কলিকাতায় যাওয়া হইবে?"

দানীশ মৃদু হাসিলেন—"হাঁ, আপত্তি আছে নাকি?"

ন-বৌ। আপত্তি নাই, ভয় আছে। কবে আসিবে?

দানীশ। কাল রাত্রের গাড়ীতে আসিব।

ন-বৌ। তোমার সেই ডাক্তারখানায় যাইবে নাকি?

দানীশ। অবস্থাটা একবার দেখিয়া আসিব, আর পারি যদি একটা ব্যবস্থা করিয়া আসিব।

দানীশ বিদায় হইলেন। ন-বৌএর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ঠিক্ প্রভাতকালে, দানীশ কলিকাতায় গিয়া পৌছিলেন। দানীশ

গাড়ী হইতে নামিয়া বহুবাজারে গমন করিলেন। তাঁর ডাক্তারখানার দরজা খোলা হইতেছিল তখন।

ভৃত্য সেলাম করিল। একজন কম্পাউণ্ডার অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দানীশ তাহাকে তাঁহার অনুপস্থিতে ঔষধালয়ের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল—"আপনি আসিলেন না, দুই-তিন খানা পত্র লিখিয়াও উত্তর পাইলাম না, তখন অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে বিদায় দিয়া কেবল ঐ ভৃত্যটিকে রাখিয়া আমি একরূপ করিয়া ঔষধালয়টি চালাইয়া আসিতেছি। আমাদের খরচা ও বেতন বাদে টাকা আষ্টেক লাভ হইয়াছে। আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, যূথিকা-বিবি সেই সময়েই তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছেন।"

দানীশ ঔষধালয়ে সন্ধান করিয়া দেখিলেন, যে সকল ঔষধ ও যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মিলন-মন্দিরের চিকিৎসালয়ের কার্য্য চলিতে পারিবে। তিনি সেই কম্পাউণ্ডারকে ও ভৃত্যকে ঔষধগুলির সহিত বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন, তাহারা স্বীকৃত হইল এবং আদিষ্ট হইয়া ঔষধাদি প্যাক করিয়া ষ্টেশনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এই সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া দিয়া, একখানি গাড়ী করিয়া দানীশ-চন্দ্র গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন। স্নানান্তে যখন গাড়ীতে উঠিবেন, সেই সময়ে দেখিলেন, নিকটস্থ বাঁধাঘাটের একপার্শ্বে এক উন্মাদিনী বসিয়া আছে, অনেকগুলি বালকবালিকা তাহার চতুঃপার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে। দানীশ তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন। সে—যূথিকা। যূথিকা উন্মাদিনী। তাহার চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং অনলবর্ষী। সেই সুবর্ণ সদৃশ বর্ণ এখন বিমলিন হইয়া গিয়াছে। যূথিকার বাহ্যজ্ঞান আদৌ ছিল না। সে আপন মনে কত কথা বলিতেছিল। কখনও হাসিতেছিল, কখনও কাঁদিতেছিল, কখনও বা নিস্তব্ধ থাকিতেছিল। দানীশ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। সে বসিয়া

ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার উন্মাদ নয়নদ্বয় হইতে জলধারা বহিল। সে উন্মাদস্বরে বলিয়া উঠিল—"পাঁচকড়ি, প্রাণের পাঁচকড়ি—আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছি। আমি তোমাকে ভালবাসি—ফুলের মত ভালবাসি, পাখীর মত ভালবাসি—ক্ষুদ্র শিশুর মত ভালবাসি—তবু খুব ভালবাসি বোধ হয়, এত ভালবাসা আর কাকেও বাসি নাই—আর তোমার কি প্রেতমুখ কেবল আমারই কাছে? আবার দোষও চাপাইয়া গেলে আমার ঘাড়ে? হাঃ হাঃ, যাচ্চি, যাচ্চি—ধচ্চি তোমায়, দাঁড়াও—পালাবে কোথায়?" থিকা তন্ময় হইয়া ছুটিয়া চলিল। অশান্ত বালকেরা "ঐ যে পাগলি পালাল" বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কেহ বা কাদা তুলিয়া ছুড়িল।

দানীশ তাহার অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। ক্ষুণ্ণ-কাতর প্রাণে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

সেইদিন রাত্রেই তাঁহার ডাক্তারখানার ঔষধাদি লইয়া শোণপুরে যাত্রা করিলেন। অতঃপর দানীশ, পাঁচকড়ির "মিলন-মন্দিরে" রোগীর চিকিৎসা করিবার জন্য জীবনের সমস্ত শক্তি সমর্পণ করিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬